কৃষ্ণ ও শ্রীমতী

অন্নদাশঙ্কর রায়

দ্বিতীয় ভাগ

ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৪

সাড়ে তিন টাকা

প্রকাশক

শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

মুদ্রাকর

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৯

মাতৃস্মৃতি
পিতৃস্মৃতি

রত্ন ও শ্রীমতী

দ্বিতীয় ভাগ

এক

রত্ন বলে একটি ছেলে কোনো দিন কল্পনাও করেনি যে শ্রীমতী বলে একটি মেয়ে এ জগতে আছে, যে মেয়ে তাকে চোখে না দেখতেই তার প্রেমে পড়বে। এমন অঘটন যেদিন ঘটল রত্ন সেদিন প্রাণভরে উৎফুল্ল হতে পারেনি, তার হৃদয় তখন জোড়া। এর পরে এলো আর একটি দিন, যেদিন সেও প্রেমে পড়ল শ্রীমতীর, ওকে চোখে না দেখেই। সেদিন তার উল্লাস অবিমিশ্র উল্লাস।

সেই দিনটি থেকে রত্ন হলো শ্রীমতীরত্ন। আর শ্রীমতী তো হয়ে রয়েছিল রত্নশ্রীমতী। রত্নগোরী। গোরী আর রত্ন মিলে যুগল। যমজের মতো তাদের দু'জনের যোড় একান্ত অলক্ষ্য ও নিগূঢ়। তাই তাদের একজন গোরীরত্ন। অপর জন রত্নগোরী। রত্নকে রত্ন বলে যারা জানল তারা তার কতটুকুই বা জানল! তেমনি গোরীকে গোরী বলে যারা জানল!

রত্ন যেখানেই যায় গোরী যেন তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। তার হাতে হাত রাখে। মুখোমুখি দাঁড়ায়। গোরী, তুমি! রত্ন, তুমি! কী করে যে চিনলে! ওমা, তোমাকে চিনব না তো কাকে চিনব। আমাকে ভালোবাস? তোমাকেই ভালোবাসি। তুমি! ওগো তুমি! আমি! ওগো আমি!

গোলাপ! গোলাপ! সারা পথ গোলাপ! অভ্র! আবীর! আকাশ থেকে অভ্র! আসমান থেকে আবীর! স্বর্গ থেকে পারিজাত! হে প্রভু, এত করুণা! হে প্রিয়, এত আনন্দ! প্রিয়ে, ধন্য আমি। পূর্ণ আমি।

কাকে যে বলা হলো ও কথা—দেবতাকে না মানুষকে—রত্ন প্রকাশ করতে অক্ষম। তার কাছে দুই এক হয়ে গেছে। দেবতাই এসেছেন নারীদেহ ধরে। নারীই নিয়ে যাবে দেবতার সকাশে। প্রেম দিয়ে উভয়ের পূজা করতে হয়।

এরূপ অনুভূতি যে পূর্বে কখনো হয়নি তা নয়। কিন্তু সে ছিল ভালোবাসা। এ হলো ভালোবাসাবাসি। সে ছিল একা একা খেলা। এ হলো

দু'জনায় লীলা। তখন মনে হতো আমি নিঃসঙ্গ। এখন মনে হয় আমরা দূরে দূরে থাকলেও একজোড়া কোকিল।

মালাদিকে কখনো এত কাছে মনে হয়নি। যখন তিনি কাছে তখনো তিনি দূরে। সব সময়েই তিনি সুদূর। গোরী কিন্তু তা নয়। প্রথম থেকেই সে নিকট। এখন সে নিকটতর। কে জানে কবে নিকটতম হবে! কোকিল কোকিলা কত কাল ধরে কুহু কুহু ডাকে। সাড়া দেয়। ডাকতে ডাকতে সাড়া দিতে দিতে কাছাকাছি হয়। এত কাছাকাছি যে নির্বাক।

এর নাম ভালোবাসাবাসি। তরুণতরুণীর ভালোবাসাবাসির মতো সুন্দর কী আছে! মধুর কী আছে! দেহধারণ তো এর জন্যেই। দু'জনে দু'জনের মাধুর্য আস্বাদন করবে, মধুর রসেব স্বাদ পাবে। দু'জনে দু'জনের সৌন্দর্যে তন্ময় হবে। লীন হবে। একজনের পেয়ালা খালি দেখলে অপর জন সে পেয়ালা ভরে দেবে। রত্ন যদি সুরূপ না হয়ে থাকে গোরী তাকে রূপবান করবে আপনার রূপ দিয়ে। গোরী যদি শীতল না হয়ে থাকে রত্ন তাকে স্নিগ্ধ করবে নিজের সুধা দিয়ে।

স্বর্গসুধা এর কাছে কী! সে সুধা হয়তো অজর করে, অমর করে, কিন্তু প্রেমের জন্যে দেবতারাও ব্যাকুল। মানুষ তাদের চেয়ে ভাগ্যবান। মানুষের অন্তর যে প্রেমের ভাণ্ডার। প্রেম দিয়ে মানুষ মৃত্যুকে পবিহার করতে পারে না। সে হিসাবে মৃত্যুই অধিকতর শক্তিমান। কিন্তু মৃত্যুর পরেও প্রেম থাকে, প্রেমের ক্রিয়া চলতে থাকে। সেদিক থেকে প্রেমই অধিকতর শক্তিধব। ভালোবাসাবাসির কোথাও কোনো ছেদ নেই। মরণেও না, জীবনেও না। একমাত্র ছেদ প্রেম যদি আপনা থেকে ক্ষীণ হয়, দুর্বল হয়, নিঃশেষিত হয়। যেমন হলো মালাদির বেলা। সে ছিল ভালোবাসা। ভালোবাসাবাসি নয়। এবং তার প্রায় সবটাই ভক্তি।

নারীর প্রতি রত্নর অহেতুক শ্রদ্ধা ছিল। নারী কখনো দোষ করতে পারে না। তার কখনো স্খলন পতন হতে পারে না। এই শ্রদ্ধা থেকে এলো বিশেষ একটি নারীর প্রতি ভক্তি। মালাদি যে দেবী! গোরীও কি দেবী? না, গোরী দেবী নয়। গোরী হচ্ছে দেবতা। দেবতা তার কাছে প্রিয়া রূপে এসেছেন। প্রিয়াই

দ্বিতীয় ভাগ

দেবতা। এসেছেন তাকে প্রেম শেখাতে। প্রেমের আস্বাদন দিতে। এই মর্ত্যভূমি হচ্ছে প্রেমভূমি। প্রেমের শিক্ষা পাব বলেই আস্বাদন পাব বলেই এখানে আসা ও থাকা। সেইজন্যেই জন্মমরণের দ্বার দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান। যে ভালোবাসল না, ভালোবাসা পেলো না, অমনি এলো আর গেল তার মতো দীনহীন আর কে! হলোই বা সে ধনকুবের। হলোই বা রাজচক্রবর্তী। কোনো মতে যার দিন চলে সেও তার চেয়ে ভাগ্যবান হতে পারে। হয়ও। ভগবান তাকে ভালোবাসেন। তাকে ভালোবাসান। তার ভালোবাসা নেন।

ভালো কেমন করে বাসতে হয় রত্নর তা অজানা ছিল না। কিন্তু ভালোবাসা কেমন করে নিতে হয় তা কি সে জানত! নারীর প্রেমের কথা হচ্ছে। সে প্রেম তার জীবনে এই প্রথম এলো। তার উত্তরে সে এই প্রথম সাড়া দিল। সাড়া দিলে ও পেলে কোকিল কোকিলার কুহুরব অবিরাম ধ্বনিত হয়। পঞ্চমে ওঠে। সারাক্ষণ প্রলাপ চলে।

রত্নর প্রেমস্বীকৃতি পেয়ে গোবী যে চিঠি লিখল তা বিশুদ্ধ প্রলাপ। এমন উত্তেজিত যে একটা বাক্য সারা না হতেই আর একটা শুরু করেছে। যেন এক রাশ কথা ঠেলাঠেলি করছে কোনটা আগে যাবে তার জন্যে। এমন উল্লসিত যে কয়েক লাইন কেবল প্রিয়সম্বোধনই করেছে। ডেকেছে রকমারি নামে। রত্ন, রতন, রতু, রতি, মণি, মাণিক, ধন, সোনা, মধু, মধুর, মিষ্টি, মিঠু, নিঠুর, কপট। এমনি কত কী! না আছে তাব মাথা, না আছে মুণ্ডু। ফেনা বাদ দিলে রস যা থাকে তা এইরূপ .

> ওগো আমার প্রাণ, তুমি যদি না থাক আমি কি বাঁচব! প্রাণ বিনা কেউ কখনো বাঁচতে পাবে!
>
> প্রিয়তম, তুমি কি জাদু জানো? জাদু দিয়ে আমাকে হরণ করেছ? আমি কি এখানে রয়েছি? না আমি ওখানে তোমার কোলে?
>
> কান্ত, তোমাব ওইটুকু লিপিব জন্যে আমি যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করেছি। বিশ বছর কেটে গেল ওরই প্রতীক্ষায়। আহা! কী অমৃত আছে তোমার ওই ক'টি কথায়। আমার দাহ জুড়িয়ে গেল।

রত্ন ও শ্রীমতী

ওগো, দিনরাত আমি এই প্রশ্ন করেছি আমার অদৃষ্টকে। কে আমাকে একটু ভালোবাসবে। এক ফোঁটা ভালোবাসা দেবে। আমি যে দগ্ধ সাহারা মরু। এক বিন্দু বর্ষণের জন্যে কাঙাল। কেউ কেন আমাকে ভালোবাসে না? শুধু অভিনয় করে। অথবা দেয় ভালোবাসার নামে কী জানি কী বিষ! ওগো, আমি যে জ্বলে যাচ্ছিলুম গো। এত দিনে আমি পেলুম আমার তৃষ্ণার জল। তুমি আমাকে বাঁচালে গো বাঁচালে।

মোহন, বার বার আমার চোখে জলের মোহ জাগায় অসার মরীচিকা। মোহভঙ্গ হয়। সে যে কী কষ্ট। প্রেম এত দিন আমাকে প্রতারণা করেছে। এবারেও কি তাই হবে? না, না, তুমি তেমন নও! তোমার প্রেম আস্বাদন করে জেনেছি এ সুধা খাঁটি। এই তো আমি চেয়েছি গো মাধবের কাছে। তুমি যে কে তা আমি জানতুম না। কবে আসবে তাও কি জানতুম! তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি, মানৎ করেছি। বলেছি, হে ঠাকুর, ও যেন আসে, এ জীবনে আসে, জীবন থাকতে আসে। যে আমার, আমি যার, তাকে যেন এই জন্মে পাই। তার জন্যে আবার যেন জন্মাতে না হয়। প্রিয়তম, আমার জন্ম সার্থক হয়েছে।

কিন্তু, প্রেমদাতা, তোমাকে দিতে পারি এমন কী আছে আমার! আমার কি হৃদয় আছে! হৃদয় যে পুড়তে পুড়তে পোড়াকাঠ হয়ে গেছে। ভিতরে শুধু ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে। ওগো রতনমণি, সোনামণি, কেন তুমি ভালোবাসবে এই দুঃখিনীকে! পারবে কি এর বুকের আগুনেব আঁচ সইতে!

মণি, এত কাল আমার জীবনে একটিমাত্র প্রধান অনুভূতি ছিল। জ্বলন। আমি জানতুম আমি জ্বলছি। অবিরাম জ্বলছি। জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। জীবনে আমার দ্বিতীয় প্রধান অনুভূতি এলো এই প্রথম। জুড়ন। তুমি যেন শীতল সরোবব আর আমি যেন জ্বররোগী। তোমার কোলে ঝাঁপ দিয়ে আমার অঙ্গ জুড়ালো। কিন্তু তাপ যে আমার ভিতরে। তার থেকে মুক্ত হই কী করে! প্রেম, তুমি কি আমার মুক্তি রূপে আসবে না?

দ্বিতীয় ভাগ

পড়তে, পড়তে রত্নর বুক ব্যথা করে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। মনটা উদাস হয়ে যায়। সত্যি এ মেয়েটি দুঃখিনী। যদিও এর অনেক খ্যাতি, অনেক রূপ। অনেক বান্ধব ও ভক্ত। অনেক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য।

গোরীর জীবনে প্রেম এই প্রথম নয়। প্রেমিক আরো এসেছে। রত্নর কাছে সে তা গোপন করেনি। কিন্তু তাদের কাছে সে যা পেয়েছে তা উচ্চস্তরের ভালোবাসা নয়। তার প্রাণ জুড়ায়নি। সেইজন্যে রত্নর দিকে সে চেয়ে আছে তাতল সৈকতের মতো। বারিবিন্দুর আশায়। সাধারণ ভালোবাসায় সে তৃপ্তি পাবে না। সে চায় অসাধারণ প্রেম। রত্নকে উঠতে হবে অনেক উঁচুতে। ও কি পারবে অত দূর উঠতে!

এক এক সময় ওর মনে হয় বেশ তো ছিল ওরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হয়ে। যমজ ভাইবোন। যমজের চেয়ে যুগল ভালো কিসে! ভাইবোনের ভালোবাসার কি তুলনা আছে! আমার রত্ন ভাই! আমার শ্রীমতী বোন! আমার গোরী বোন! এ কি কম মিষ্টি! চমৎকার! চমৎকার সম্বন্ধ! আমরা দুটি যমজ। আমরা একসঙ্গে পৃথিবীতে এসেছি। একসঙ্গে বড় হয়েছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার হয়নি। নইলে একসঙ্গেই থাকা যেত। তুমি যদি বাঁধন কাটাতে পার একসঙ্গে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু ভাইবোনের মতো।

গোরী সে সম্বন্ধ রদবদল করেছে। রত্ন রদবদল মেনে নিয়েছে। পিছন ফিরে তাকানো বৃথা। আর সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। এখন তারা যুগল। কান্ত আর কান্তা। তারাই জগতের প্রেমকেন্দ্র। সেই কেন্দ্র একও হতে পারে, একাধিকও হতে পারে। যেখানে যত যুগল আছে সকলেই রত্ন ও শ্রীমতী। কান্তা ও কান্ত। এই বিশ্ববাসলীলামঞ্চে একটিমাত্র যুগল আছে, আর আছে সংখ্যাতীত দর্পণ। এরাই বিম্বিত হয় সংখ্যাতীত রূপে, সংখ্যাতীত নামে। এরা নৃত্যপর হলে ওরাও নৃত্যপর। এদের ভালোবাসাবাসি ওদেরও ভালোবাসাবাসি।

কিন্তু এতেই কি দুঃখিনী সুখী হবে! যেখানে আছে সেখানে থেকেও! যার কাছে আসতে চায় তার কাছে আসতে না পেলেও। রাখীবন্ধ বহিনের মতো

দূরত্ব রক্ষা করেও। না বোধ হয়। কান্তাবিরহ কারই বা কাম্য হতে পারে। মিলনবাসনা দুর্বার হবেই। প্রেম সেই ভাবেই পূর্ণতা খোঁজে।

রত্নর মনে হয় তার হৃদয়ে সুপ্ত ছিল ভালোবাসবার ও ভালোবাসাবার অফুরন্ত শক্তি। সেই কুলকুণ্ডলিনীকে গোরী এসে জাগাল। সে যদি সারা জীবন গোরীকে ভালোবাসে ও গোরীর ভালোবাসা পায় তা হলেও তার তৃপ্তি হবে না কোনো দিন। কান্তকান্তার প্রেমে তৃপ্তি কোথায়! তৃপ্তি হলে তো পরিসমাপ্তি। পরিসমাপ্তির পরে কী? বৈষ্ণব কবিরা বলতে পারতেন বিচ্ছেদ। বলতে চাননি। যুগল যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে তবে ভাবসম্মিলনেই প্রেমের পরম পরিণতি। সেটা পরিসমাপ্তি নয়। তাই তার পরতর নেই। রত্ন আর গোরী চিরদিন ভাবসম্মিলনে সম্মিলিত থাকবে। পরস্পরের মধুপানে বিভোর।

ভাবসম্মিলন। রূপসম্মিলন নয়। কেউ কারো কাছে থাকবে না। কাছে আসবে না। চোখের দেখা যদি দেয় তবে ক্ষণিকের জন্যে। অমনি করে একটা রহস্যবোধ জাগিয়ে রাখতে হবে। নইলে অতিপরিচয় থেকে অবজ্ঞা জন্মাবে। প্রেম পারবে না অবজ্ঞা অতিক্রম করতে। না, রূপসম্মিলন নয়। ভাবসম্মিলন। যদিও সে ভাব কান্তকান্তা ভাব। সবই তার মধ্যে পড়ে। দেহ মন হৃদয় আত্মা। কোনোখানেই তার ছেদ নেই। নয়তো পূর্ণতা কিসের! সবই তার অন্তর্গত। যদিও কার্যত নয়।

সার কথা হলো মাধুর্য আস্বাদন। তার কমতি কোথায়! রত্ন কোনো একজনকে ধন্যতা জানাতে চায়। কাকে? গোরীকে? গোরী জানাবে কাকে? রত্ন তাই ধন্যতা জানায় জীবনদেবতাকে। তিনি পরম দাতা। তাঁর দানের সীমা পরিসীমা নেই। কোন দানটির চেয়ে কোনটি বা কম! সব ক'টিই মাথায় তুলে রাখবার মতো। সব স্নেহ, সব বন্ধুতা, সব দয়া, সব মায়া, সব মমতা। কিন্তু তাঁর সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান এই প্রেম। তরুণতরুণীর এই মাধুর্য আস্বাদন। এরই জন্যে নরজন্ম ও নারীজন্ম। নরনারীর অন্তরে যে প্রেমের গঙ্গোত্রী। তনুতেও রসের যমুনোত্রী। কিন্তু সে অনেক দূরের কথা।

তার পর রত্নর জিজ্ঞাসা হলো এই। জীবনদেবতার কাছে।

দ্বিতীয় ভাগ

গোরী যে জগতে আছে, প্রেম যে জগতে আছে, সে জগতে মন্দ কেমন করে থাকবে! ভালোমন্দের দ্বৈত, সুন্দর অসুন্দরের দ্বৈত চিরকাল রত্নকে কাঁদিয়েছে রাগিয়েছে বিদ্রোহী করেছে সংঘাতের মুখে ঠেলেছে। কিন্তু ইদানীং তার মনে হচ্ছে জগৎ জুড়ে শুধু ভালোই আছে। শুধু সুন্দরই। নয়তো গোরীর থাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে কেন? আলো থাকলে কি অন্ধকার থাকে? পূর্ণিমা থাকলে কি অমাবস্যা?

তবে কি মন্দ বলে কিছু নেই? অসুন্দর বলে কিছু নেই? আছে। আছে। প্রত্যহ চোখে খোঁচা দিচ্ছে। কোনো মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না তাদের অস্তিত্ব। তাদের কৃত অনর্থ। তা হলেও মানতে হবে যে তাদের অভ্যন্তরে সত্য নেই। তারা অসত্য দিয়ে ফাঁপা। ভিতরে ভিতরে ফাঁকা। তলে তলে নাস্তিত্ব।

তাই যদি হলো তবে কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? সংগ্রাম কার সঙ্গে? তলপর্যন্ত গেলে অসুন্দরও অসুন্দর নয়। মন্দও মন্দ নয়। রত্ন আর পূর্বের মতো প্রেরণা পায় না বিদ্রোহের বা সংঘাতের। আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তার পা সরে গেছে বা পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এখন যেখানে তার পদযুগ প্রোথিত সেখানে মন্দ নেই, সুতরাং মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নেই। অসুন্দর নেই, সুতরাং অসুন্দরের সঙ্গে বিরোধ নেই।

একেবারেই নেই তাই বা কেমন করে বলবে? নারী যেখানে লাঞ্ছিতা সেখানে কুরুক্ষেত্রের হেতু বিদ্যমান। পাঞ্চালীর লজ্জা তো পান্ডবদেরও লজ্জা। তার যত দিন মুক্ত কেশ তাদেরও তত দিন মুক্ত অসি। তা বলে এই নিয়ে জীবন ভোর করে দেওয়াও কিছু নয়। আরো গভীরে নামতে হবে। যেখানে মাধুর্যের শতদল ফুটে আছে। যেখান থেকে আসছে এই সূর্যের আলো, বসন্তের পরশ, মুকুলের বাস, কোকিলের কুহু, পলাশের রং। যে উৎস হতে প্রকৃতির রমণীয়তা, রমণীর প্রেম, প্রেমের উল্লাস। গোরী এসে খুলে দিল সেই রূপলোকের দ্বার। আর উপরে উপরে ভেসে থাকা নয়। এবার ডুব দেওয়া। তলিয়ে যাওয়া। দেখতে হবে এই অতলের তল কোথায়। মূল কত দূর। রত্নর দিন কেটে যায় আবিষ্ট ভাবে।

রত্ন ও শ্রীমতী

সে যেন কোন আরব্য উপন্যাসের রাজ্যে উপনীত হয়েছে। তার সম্মুখে বহু যুগের নিষিদ্ধ দ্বার। রুদ্ধ দ্বার। হঠাৎ সে দ্বার খুলে গেছে। মরি মরি কী অপূর্ব সৌন্দর্য! সৌন্দর্যের একখানি চিত্র। দ্বার খুলে গেছে, না দৃষ্টি খুলে গেছে? সৌন্দর্যবাদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যা হলো না গোরীর সঙ্গে ভাবসম্মিলনে যুক্ত হয়ে তাই হলো। রত্ন যেদিকেই তাকায় সেদিকেই সৌন্দর্যের সায়র। অথই। অপার। সায়রের ঢেউ গুনে শেষ করা যায় না। প্রত্যেকটি বিশিষ্ট। কিন্তু বিশ্লিষ্ট নয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি অভেদ অবিচ্ছিন্ন। কার নাম পাখী কার নাম পশু কার নাম গাছ কার নাম পাথর অত বেছে কী হবে! সুন্দর! সুন্দর! সব সুন্দর! সবাই সুন্দর! ল্যাংড়া লালজী, মহাদেও বাবাজী, ইয়াসিন পোস্টম্যান এরাও সৌন্দর্যের শরিক।

আলো! আলো! কোন রঙীন নক্ষত্রের আলো এসে রাঙিয়ে দিয়েছে ধরণীর জলস্থল অন্তরীক্ষ! সে যে কী রং তা নাম দিয়ে বোঝানো যায় না। সে রং ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। তাকে নামের বন্ধনে বাঁধা যায় না। তাকে চিনতে গেলে সে চির অচেনা। আলোকনির্ঝর থেকে ঝরঝরিয়ে পড়ছে আলো, আরো আলো। প্রাণ পুলকিত হচ্ছে। পল্লবিত হচ্ছে। পুষ্পিত হচ্ছে। আমরা কি মাটির ছেলে, না আলোর দুলাল! দুই। আমাদের জন্ম মাটির কোলে, আলোর অংশে। আমরা মর ও অমর।

রত্ন যখন বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ভিতর পানে তাকায় তখন আরো বিস্ময় লাগে তার। এত সৌন্দর্য ছিল তার নিজের অন্তঃপুরে! জানত না, দেখত না। এ যে একটা সৌরজগৎ। তারালোক। এর গায়ে রত্ন বলে কোনো নাম লেখা নেই। এ যেন সকলের অন্তর্বিশ্ব। যার দৃষ্টি খুলে গেছে সে-ই আবিষ্কার করে। অপরের কাছে অনাবিষ্কৃত অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রেম এসে খুলে দিল দ্বার।

দৃষ্টি খুলে গেল শুধু সৌন্দর্যের অভিমুখে নয়। নারীত্বের অভিমুখেও। তার সম্মুখে প্রসারিত নারীত্বের একখানি চিত্র। গোরী তার কেন্দ্র অধিকার করেছে। বস্তু-গোরী নয়, ভাব-গোরী। শ্রীরাধার মতো মহাভাবস্বরূপিণী।

দ্বিতীয় ভাগ

কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত তার আভামণ্ডল। সব নারীই গোরী। তাই গোরীই সব নারী। তার গায়ে গোরী বলে কোনো নাম লেখা নেই। সে নারীসত্ত্ব। নারীসত্ত্বের মূলতত্ত্ব। আদি বহ্নি। আদি বিদ্যুৎ। আদি জ্যোতি। আদি বাক্। তার কালগণনা হারিয়ে গেছে। সে এই পৃথিবীর চেয়েও প্রাচীন। এই আকাশের সমবয়সী। তার সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ। যেমন নীলিমার সঙ্গে নভস্তলের। সুবিধার জন্যে সম্বন্ধ পাতিয়ে তার উপর ধর্মের মুখোশ আঁটা বা নীতির পলস্তরা চড়ানো নারী বা পুরুষ কারো পক্ষে গৌরবের নয়।

নারীত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে রত্ন। দেখতে পায় বিদ্যুৎকে ধরে এনে মানুষ তাকে দিয়ে দীপ জ্বালাচ্ছে, পাখা চালাচ্ছে। সেই বন্দী বিদ্যুৎকে মানুষ চেনে। সে যে কাজে লাগে। কিন্তু যে বিদ্যুৎ বন্দী নয়, কাজে লাগে না, সে-ই তো চোখ ধাঁধায়, তমসার যবনিকা সরায়, দিগ্ দিগন্ত উদ্ঘাটন করে। যে নারী গৃহদীপখানি জ্বালে, রান্নাঘরে পরমান্ন রাঁধে, আঁতুড়ঘরে উত্তরাধিকারীকে জন্ম দেয় তাকে নিয়ে কবিত্ব করতে হয় আর কেউ করবেন, কিন্তু রত্ন সে নারীর বন্দনা গান করবে না। সে যে বন্দিনী। সে যে কাজের জন্যেই মূল্যবান। রত্নর হৃদয়ের আরাধনা পাবে সেই নারী যে মুক্ত বিজলী। যাকে ব্যবহার করা যায় না, ব্যবহার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা, ব্যবহার করতে চাইলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। যার জন্যে প্রার্থনা করতে হয়, তপস্যা করতে হয়, বিপদে পড়তে হয়, সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। বীরত্বের পরীক্ষা দিতে হয়।

রত্ন চিঠি লেখে রাত জেগে। এবার লিখল—

ওগো বিদ্যুদ্বর্ণা, বিজলী কন্যা, তোমাকে বন্দী করে রাখবে কে! তুমি মুক্ত, সহজমুক্ত। তোমার মুক্তির জন্যে আমার দরকার করে না। তবু যদি তোমার এই ইচ্ছা যে আমি তোমার মুক্তির কাজে লাগি তা হলে এসো আবার আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হই। তা হলেই আমি জোর পাব। কেননা তা হলেই আমার কাজ হবে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ। লোকে হয়তো ঠাওরাবে আমার মতলব ভালো নয়, আমাব নিশ্চয় কোনো মন্দ অভিপ্রায় আছে। কিন্তু আমি তো জানব আমাব জন্যে আমি কিছু চাইনে। চাই শুধু

বিজলীর মুক্তি, যে বিজলী কারো সেবাদাসী নয়, যে স্বতঃস্বাধীনা। তুমিও জানবে আমার নিজের বলতে কোনো সাধ নেই।

এই যে আমাদের কান্তকান্তা সম্বন্ধ এর জন্যে আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কেমন করে অপরকে আমি বোঝাব যে তোমার মুক্তি আমার নিজের জন্যে নয়, এতটুকুও নয়, শুধু তোমার জন্যেই, সম্পূর্ণ তোমার জন্যে! তুমিও কি পারবে বোঝাতে! আপনি বুঝলে তো বোঝাবে! গোরী, তুমিই হয়তো একদিন ভুল বুঝবে। বলবে, যে আমাকে মুক্ত করেছে সে তার নিজের জন্যেই করেছে। এ কথা ভাবতেই আমার মনটা দমে যায়। আমি তোমার মুক্তির জন্যে জোর পাইনে। যদিও পাওয়া আমার উচিত। ওগো বিদ্যুৎ কন্যা, তুমি বন্দী থাকলে জগতের নারীত্ব বন্দী থাকবে। তুমিই সর্ব নারী। তোমাকেই সর্বত্র আমি দেখি। আমার চোখে তুমিই একমাত্র নারী। যদিও চোখে তোমাকে দেখিনি।

নারীর কাছে আমার অনন্ত প্রত্যাশা। নারী যেদিন মুক্ত হয়ে দেশের ও বিশ্বের ভার নেবে সেদিন নতুন যুগ আসবে। নারী আনবে মানুষে মানুষে শান্তি। যুদ্ধবিগ্রহ অতীতের বস্তু হবে। নারী তুলে দেবে প্রাণদন্ড। নারী উঠিয়ে দেবে কারাগার। কেউ বন্দী হবে না। অপরাধ করলেও না। শাস্তি বলে যদি কিছু থাকে তবে তা হবে মা যেমন করে ছেলেকে সাজা দেয়। ভালোবাসার সাজা। নারীশাসিত সমাজ হবে প্রেমশাসিত সমাজ। ভয়শাসিত সমাজ নয়। বৈকুণ্ঠ নেমে আসবে মর্ত্যে। নারী হবে সেই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ঠাকুরানী। ওগো নারী, তুমি সেই লক্ষ্মী ঠাকুরানী। মানুষকে তুমি মানুষের ভয় থেকে ত্রাণ করবে। পুরুষকে বাঁচাবে পুরুষের হাত থেকে।

গোরী, আমি স্বপনবিলাসী। স্বপ্ন দেখি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। নিজের নয়, সর্বজনের। জীবনকে কত রকম ভাবে বাঁচা যায়। কত উন্নত ভাবে, শ্রীমন্ত ভাবে। কোটি মহান সম্ভাবনায় পূর্ণ এই জীবন। সম্ভাবনা কি সম্ভাবনাই থেকে যাবে যুগের পর যুগ! আমাদের যুগটা কি গতানু-গতিক ভাবে কেটে যাবে! আমার মন তাতে সায় দেয় না। আমি বিশ্বাস

করি যে আমার কতক স্বপ্ন সফল হবেই। হবে এই যুগে। তাকে সফল করবে তোমরা এ যুগের নারী। তোমার মুক্তির প্রশ্ন তোমার একার নয়। যা প্রত্যক্ষরূপে একজনের তা পরোক্ষে সব জনের। মুক্তা, তুমি মুক্ত হও তোমার শুক্তি থেকে। আমার জন্যে নয়। আমি অনাসক্ত।

দুই

ওদিকে গোরীর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চায় না। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে রত্ন তাকে ভালোবেসেছে। তার ভালোবাসার মর্যাদা রেখেছে। চিঠি লিখে চিঠির জবাবের জন্যে সে সবুর করবে না। চিঠির পর চিঠি লিখবে। তার উচ্ছ্বসিত পল্লবিত রচনাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করলে এইরকম দাঁড়ায় :

ওগো বিস্ময়! ওগো পুনঃপুনঃ বিস্ময়! ওগো রাজপুত্র! ওগো কুমার! ওগো নবযৌবন! ওগো সুন্দর! ওগো ওগো! তুমি আমায় ভালোবাস! এ কি সত্য! তুমি আমার! এ কি সত্য! আমি তোমার! এ কি সত্য!

প্রতিদিন ভোরে আমার ঘুম ভেঙে যায়। রাত্রেও কত বার ভাঙে। মনে হয় একটু আগেই তুমি ছিলে। হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলে। মিলিয়ে গেলে, না লুকিয়ে রইলে। চোখ দিয়ে তোমাকে সব ঠাঁই খুঁজি। উঠে বসি। পাগলের মতো পালঙ্কের তলায় চেয়ে দেখি। না, কোথাও সিঁদ কাটার চিহ্ন নেই। সুন্দর, তুমি বিদ্যাসুন্দরের সুন্দর নও। সিঁদ কাটতে জানো না।

দিনমান কান্না পায়! কেন তুমি ধরাছোঁয়া দিলে না! কেন হারিয়ে গেলে! কোথায় তোমাকে এখন খুঁজে বেড়াই! একমাত্র সান্ত্বনা তোমার চিঠি। কী যে ভালো লাগে তোমার দুটি কথা! অমৃত। অমৃত। আমি প্রাণ পাই। আমার বাঁচতে ইচ্ছা যায়। প্রিয়, বেঁচে থেকে কোন সুখ যদি প্রিয়সঙ্গ

না মেলে! যদি প্রিয়পরশ না ঘটে! তোমার চিঠির মধ্যে গোঁজা করবী ফুল আমার খোঁপার মধ্যে গুঁজি। ওই তিলপরিমাণ প্রিয়সংস্পর্শ আমাকে তালপরিমাণ অপ্রিয়সংসর্গ সইতে শেখায়। ওই যেন আমার রক্ষাকবচ। আমার কবচ কুণ্ডল। যেমন কর্ণের।

সইতে শেখায়। আবার অসহিষ্ণু করেও। আগের চেয়ে আমি ঢের বেশী অসহিষ্ণু হয়েছি। এত দিন যা বরদাস্ত করে এসেছি এখন আর তা বরদাস্ত হয় না। আমার মধ্যে একটা নতুন অবাধ্যতার উদয় হয়েছে। এরাও সেটা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কেন তা জানে না। জানবে, জানবে। ক্রমে জানাজানি হবে। আমি গোপন করব না। আমার ভয় কিসের? আমার ভয় কাকে?

তুমি আমার জীবনে এসেছ। দুঃখিনীকে দয়া করে ভালোবেসেছ। ওগো আমার সাত রাজার ধন মাণিক। এখন হতে তুমিই থাকবে আমার হৃদয় জুড়ে। আমার হৃদয় সে তো তোমারই হৃদয়। তোমারই জন্যে পাতা শয্যা। সেখানে আর কেউ শোবে না। আর কারো উত্তাপ কামনা করব না। পেলেও নেব না। তুমি আর আমি মিলে যুগল। তুমি গোরীরত্ন। আমি রত্নগোরী। ওগো মধুরতম, যে স্বাদ তুমি আমাকে দিয়েছ তার পর আর সব বিস্বাদ। আকাশে যখন সূর্য ওঠে তখন তারা সব মিলিয়ে যায়। চাঁদ আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু তারও বরণ মলিন হয়ে যায়। সেই জ্যোতির্ময়েরও জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়। তোমাকে যে আসনে বসিয়েছি সে আসনে কেবল তুমি আর আমি। ধন, তুমি আর আমি। ধন, আমিও যে তুমি।

রত্ন স্তব্ধ হয়ে দু'হাত যোড় করে। কপালে ঠেকায়। সে কি এ প্রেমের যোগ্য! তার চোখে জল ভরে আসে। এমন ভালোবাসা কেউ তাকে বাসেনি। এমন ভালোবাসার উত্তর এমনি ভালোবাসা। সেও কি না ভালোবেসে পারে! গোরীর প্রতি স্বতঃ অনুরাগের সঞ্চার হয়। অনুরাগ আপনি উৎসারিত হয়ে ছোটে।

দ্বিতীয় ভাগ

এ তার বিনা প্রয়োজনের ভালোবাসা। একে লিখে জানানো যায় না। বলে বোঝানো যায় না। প্রকাশ করতে হয় বিনাবাক্যে। একটু চাউনি দিয়ে। একটুখানি কাছে এসে। কিন্তু তার কি বিশেষ কোনো আশা আছে! কোথায় রত্ন আর কোথায় শ্রীমতী! মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। আকাশের চাঁদের সঙ্গেও তত নয়। চাঁদকে তো চোখে দেখা যায়। তার আলো তো জানালার ভিতর দিয়ে বিছানায় এসে পড়ে। রাত কাটে তার সঙ্গে।

গোরী তার প্রত্যেকটি চিঠিতে ফুলের পাপড়ি গুঁজে দেয়। রত্ন তা নিয়ে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখে। রাত্রে শুতে গেলে বুকে তুলে নেয়। মুখে ছোঁয়ায়, নাকের সামনে ধরে। সে অত রকম ফুলের নামও জানে না। বন্ধুদের দেখিয়ে নাম জেনে নিতেও সাহস হয় না। যদি ওরা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় পেলে! একমাত্র প্রভাত তার রহস্য জানে। সেও তার পরীক্ষার পড়া নিয়ে তন্ময়। দুই বন্ধুতে দেখাশোনা বন্ধ।

গোরীর চিঠিতে আদরের ছড়াছড়ি থাকে। যেন সে কোনো দিন কাউকে আদর করেনি, এই প্রথম সুযোগ পাচ্ছে। পরিবর্তে সেও চায় আদর। যেটুকু পায় সেটুকুর জন্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত হয়ে থাকে। বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তার আদরের আতিশয্য দেখে অবাক হয় রত্ন। আতিশয্য? উঁহু। উচ্ছলতা, উদ্বেলতা। পূর্ণিমার রাত্রে সমুদ্র তো দেখেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে ফুলছে ফাঁপছে দুলছে কাঁপছে ফেনিয়ে শ্বসিয়ে ছুটে এসে ভেঙে পড়ছে লুটিয়ে পড়ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে গড়িয়ে যাচ্ছে। চাঁদ থাকে কোন আকাশে। বাহু তুলে তার নাগাল পাওয়া যায় না। তাই মুখমদের ছিটা ছুঁড়ে মারে। চোখের জলের জোয়ারে ভাসায়।

কাছাকাছি থাকলে কি এমনটি হতো! বলা শক্ত। রত্নর ধারণা সে সুদূরে বলেই তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সে অদর্শন বলেই সে সুদর্শন। কাছে গিয়ে দেখা দিলেই মোহভঙ্গ নিশ্চিত। কাজ কী দেখা দিয়ে! থাক না, সম্বন্ধটা আরো পাকা হোক। গভীরতর চেনাশোনা তো চিঠিপত্রেই হয়। মন জানাজানি

কি সাক্ষাতে হবার! তখন যে রসনা মৌন হতে চায়। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কথা বলতে যায় তো ভুল বকা হয়। পেটের কথা পেটেই থেকে যায়।

দেখা কি তবে দেবে না? দেখা না দিলে দেখা পাবে কী করে? দেখা চাই সঙ্গসুখের জন্যে। আর লেখা চাই মন ছোঁয়াছুঁয়ির জন্যে। মন দেওয়ানেওয়ার জন্যে। আগে মনের সঙ্গে মনের শুভদৃষ্টি হোক। তার পরে হবে নয়নের সঙ্গে নয়নের শুভদৃষ্টি। কবে? কে জানে কবে! রত্ন জানে না, জানতে চায় না। কিন্তু বিশ্বাস করে যে হবে একদিন। হবেই। এমন অপূর্ব প্রেম মাঝ পথে থেমে যাবে না।

রত্নর সেই চিঠি পেয়ে গোরী লিখল—

রাখীবন্ধ? হাঁ, রাখীবন্ধ। ভাইবোন? না, ভাইবোন না। যমজ ভাই-বোন ভাবতে আমার কত ভালো লাগে। কিন্তু তাও আমার পছন্দ নয়। পছন্দ, কিন্তু তোমার সঙ্গে সেটা নয়। সেটা আমি জ্যোতির জন্যে তুলে রেখেছি। সে বেচারা মর্মাহত হয়েছে তোমার দ্বারা নিষ্প্রভ হয়ে। কিছু দিন তো দেওয়ানার মতো ঘুরে বেড়ালো। এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছে। ওর তো বিয়ে দিতে পারিনে ললিতের যেমন দিলুম। ও কোনো দিন বিয়ে করবে না। ললিতকে পরখ করে দেখা গেল তার মধ্যে তেমন দৃঢ়তা নেই। আমার ধারণা ছিল সে কিছুতেই রাজী হবে না। কিন্তু সে রীতিমতো পিতৃভক্ত। জ্যোতি? না, জ্যোতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ঠিক যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি।

তোমার হাতে যেদিন রাখী বেঁধেছিলুম, ওগো, সেদিন ভাই মনে করে বাঁধিনি। যা মনে করে বেঁধেছিলুম তাই অবশেষে সত্য হলো। মাধবের ইচ্ছা। মাধবের কাছে বরভিক্ষা করেছিলুম, তিনি বর দিয়েছেন তোমাকে। তোমার সাধ্য কী যে তুমি এড়িয়ে যাবে! আমি জানি তুমি ঠাকুরদেবতা মানো না। মাধবকেও তুমি পুতুল বলে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু যিনি নিরাকার তিনিই সাকার, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। যার যেমন সাধনা তার কাছে তেমন। শিখরা বলে অলখ নিরঞ্জন। ওরা কি ভুল

বলে? না, ঠিকই বলে। তা বলে কাশীর বিশ্বেশ্বর, বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, পুরীর জগন্নাথ, কালীঘাটের কালী ভুল হয়ে যান না। এ বাড়ীর রাধামাধব জাগ্রত দেবতা। মাধবকে আমি ছাড়ব না।

কিন্তু এদের সংসার আমি ছাড়বই। বশ্যতা স্বীকার করব না। সমাজ আমাকে এক কণ্ঠে বলছে, মেনে নাও। মেনে নাও। মেনে নিলেই মঙ্গল। না মানলে অমঙ্গল। কিন্তু হৃদয় বলছে অস্ফুট স্বরে, কখনো নয়। কিছুতেই নয়। সংগ্রাম করে চলেছি আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কবে যে এর অবসান হবে কে আমাকে বলবে! মাধব তো নিরুত্তর। তাঁর উত্তর বোধ হয় সাকার হয়েছে তোমাতে। তুমিই তাঁর জীবন্ত উত্তর। তুমি যখন এসেছ তখন আমার ভাবনা কিসের? মুক্তি আমি পাবই। ওগো, তুমি যেদিন প্রস্তুত হবে আমিও সেদিন প্রস্তুত। ওগো, তোমার হাতেই ছেড়ে দিলুম দিন ক্ষণ সন তারিখ। তুমিই আমার মুক্তিদাতা, প্রেমদাতা, দুই।

আর আমি? আমি তোমার কী তা তুমিই সত্যি করে বল। আমাকে কি বোনের মতো লাগে? আমি যদি তোমার বোন হই তা হলে তুমি সত্যি সুখী হও? যদি বল তাতেই তোমার সুখ তা হলে আমার আর উপায় কী! তোমাকে সেই ভাবেই সুখী করতে শিখব। কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার স্থান কে নেবে? কোথায় পাব তাকে যে দেবে আমাকে অমৃত! প্রিয়তম, তুমি আমাকে বোন ভাবতে পার, তা বলে আমি কি তোমাকে ভাই ভাবতে পারি! ও যে ঘোর অসত্য হবে। আমাকে তুমি আমার মতো করে ভাবতে দাও। এই তো সেদিন লিখেছিলে আমরা যুগল। সেই সম্পর্কে স্থির থাকতে পার না কেন? আমি তোমার রত্নগোরী। তুমি আমার গোরীরত্ন। এই সম্পর্কই ঠিক। এর পর আর যত রকম সম্পর্ক সব বেসুরো বাজবে। না গো, আমি তোমার বোন হতে পারব না। তোমার মালাদিকেই তোমার বোন কর। যমজ বোন। আর আমাকে দাও সেই মালা যা তুমি তাঁর জন্যে গেঁথেছিলে।

একটু আগে বলেছি, মাধবকে আমি ছাড়ব না। এখন বলছি,

তোমাকেও আমি ছাড়ব না। তোমরা দু'জনেই আমার সমান আপন। মাধব আর তুমি। মাধবকে যখন সাজাই—ওটা আমার প্রতিদিনের কাজ—তখন মনে মনে তোমাকেও সাজাই। কখনো রাজবেশে, কখনো রাখাল-বেশে। তাঁকে যখন আরতির সময় চামর করি তখন তোমাকেও। তাঁর জন্যে মালা গাঁথা তোমার জন্যেও গাঁথা। তাঁর সঙ্গে তুমি আমার কাছে অভিন্ন হয়ে গেছ। তবে কেন দু'জন বলি? একজন। তবে ঠাকুরকে তো কামনা করা যায় না। পাপ হবে যে! কামনা করতে হয় মানুষকে। তেমনি সুজনকে। স্বজনকে। তুমি আমার তেমনি সুজন ও স্বজন। পাপ? না, তোমার বেলা আমার পাপবোধ নেই।

এ রকম একখানা চিঠি পেলে কার না মাথা ঘুরে যায়। চিঠিখানা মুখে ছুঁইয়ে বুকে চেপে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে রত্ন। কথা বলতে পারে না। আবেগে কণ্ঠরোধ হয়। কেউ এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে বোবার মতো অসহায় বোধ করে। মাথা নেড়ে বা হাত নেড়ে জবাব দেয়। ভাগ্যিস পরীক্ষা আসন্ন। তাই ওরা ধরে নেয় সে স্বেচ্ছায় মৌন অবলম্বন করেছে। বিদ্যাপতি অঞ্জনরা তো অত সহজে ভুলবে না। তাকে কথা বলাবেই। কিন্তু কথা বলতে গেলে হয় স্বরভঙ্গ।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে রত্নর মনে পড়ে যায় সাত আট মাস আগে শ্রীমতীর প্রথম কি দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে প্রভাতের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে যা বলেছিল।

বলেছিল, "প্রেম অসাধ্যসাধনের সংকল্প নেয়। চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। জীবন যদি আমাকে দিত তেমন একটা সুযোগ যেমন দিয়েছে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতুম প্রেম কত বড় শক্তিমান।"

জীবন তাকে সত্যি সত্যি দিল তেমন একটা সুযোগ। এবার তাকে প্রমাণ দিতে হবে তার উক্তির। এখন যদি সে পিছিয়ে যায় তবে জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ হবে। যে মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারে না তাকে দ্বিতীয় সুযোগ

দ্বিতীয় ভাগ

দেয় কি কেউ? "না, এ সুযোগ হেলায় হারালে দ্বিতীয় সুযোগ মিলবে না। জীবনেরও কতকগুলো অলিখিত নিয়ম রয়েছে।

"একে তুমি সুযোগ বল, রতন!" বিস্মিত হয়েছিল প্রভাত। বিলাপ করেছিল, "আমার মতো অভাগাকে ঈর্ষা কর তুমি! এমন দুর্ভাগ্য যেন শত্রুরও না হয়।"

"ভাই প্রভাত," রত্ন বলেছিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি নারীর প্রেম পেয়েছ। আমি পাইনি। তুমি ধন্য। আমি নই। তোমার কপালে রাজটীকা। আমার কপালে ভাইফোঁটা। মালাদি আমাকে তার বেশী দেননি, দেবেন না।"

এখন তো রত্নর কপালেও রাজটীকা পড়ল। ক'টা মাস যেতে না যেতেই। এখন তো তার ধন্য হওয়া উচিত। সে কি ধন্য হয়েছে, না হয়নি? রত্ন একবার তার বন্ধু প্রভাতকে আড়ালে পেতে চায়। কিন্তু ভরসা হয় না তার কাছে সব ভাঙতে।

প্রভাত জিজ্ঞাসা করেছিল, "জীবনে নারীর প্রেমই কি সব চেয়ে মূল্যবান? তার উপরে আর কিছু নেই?"

রত্ন উত্তর দিয়েছিল উদ্দীপ্ত হয়ে, "বাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। তার উপরে যদি কিছু থাকে তবে সে-ই দেখতে পায় যে তত দূর উঠেছে।"

প্রভাত তা বিশ্বাস করেনি। তাকে অনুনয় করেছিল, "রত্ন, ভাই, কখনো কোনো বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পোড়ো না।"

সুতরাং প্রভাতের কাছে যাওয়া নিরর্থক। সেদিন রাত্রেও তো সে ওই ধবনের কথা শুনিয়ে দিয়েছে। রত্ন তার সঙ্গে একমত হতে পারেনি। প্রেম যদি এমনিতেই ভালো জিনিস হয়ে থাকে তবে বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে হলেই খারাপ জিনিস হয়ে যেতে পারে না। তা ছাড়া গোরী কিসের বিবাহিতা! বিবাহ তাকে জোর করে দেওয়া হয়েছে। তাব আপত্তি তখনো ছিল, এখনো রয়েছে। একদিনের জন্যেও সে সায় দেয়নি। ঐ ভদ্রলোককে স্বামী বলে স্বীকার করেনি। ভালোবাসেনি। ভালোবাসা পায়নি। ভালোবাসার পাত্রী আরেকজন। তখনো ছিল। এখনো রয়েছে। বলতে গেলে ওরাই বিবাহিত। গোরী নয়।

দিন কয়েক বাদে প্রভাত নিজেই হাজির হলো তার ঘরে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে। বলল, "এ কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছিনে। বুঝিয়ে দিতে পার?"

রত্ন বই খোলা রেখে চিঠি লিখছিল। চিঠিখানা কোথায় যে অন্তর্ধান করে দিল প্রভাত তা দেখে স্তম্ভিত। ম্যাজিক না ভোজবাজি!

"হুঁ। খুব লেখাপড়া হচ্ছে। ব্যাঘাত করলুম বলে দুঃখিত।" প্রভাত জমিয়ে বসল। তার চোখে হাসি। মুখে কপট গাম্ভীর্য।

"কী হয়েছে? হঠাৎ কী মনে করে?" রত্ন ভয়ে ভয়ে সুধাল।

"হবে আর কী! তোমার তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। চম্পা ভাই বলে সম্বোধন। নিচে স্বাক্ষর পারুল বোন। তিন পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠি। জীবনে কখনো এত বড় চিঠি পাইনি। এসব পড়ে যদি সময় নষ্ট করি তো ডিফারেন-শিয়াল ক্যালকুলাস কষব কখন? প্রথম পৃষ্ঠায় দেখি রাজনীতি। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সমাজনীতি। শেষের দিকে কাজের কথা। ও কী বলতে চায় শুনবে?"

রত্ন শুষ্ক মুখে বলল, "শুনি?"

"আমরা নাকি মহাভারতের যুগে বাস করছি। কুরুক্ষেত্র বাধবেই। একালের কুরু পাণ্ডব হচ্ছে ইংরেজ ভারতীয়। তা মহাভারতের যুগে বাস করছি যখন, তখন মহাভারতের সমাজ ফিরিয়ে আনব না কেন? সে সমাজে নারীর ছিল স্বয়ংবরের অধিকার। নারীকে তার সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। নারী স্বয়ংবরা হবে। যাদের বিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে তাদের বিবাহ অসিদ্ধ। তারা ইচ্ছা করলে সে বিবাহ অস্বীকার করবে ও তার পরে স্বয়ংবৃতা হবে। তেমন ইচ্ছা পারুলেরও আছে। সোনালীর জন্যে আমি এত কিছু করেছি, পারুলের জন্যে কেন করব না? সে কি আমার বোন নয়? আমি নাকি সর্বশক্তিমান। আমি সচেষ্ট হলেই সে মুক্ত বিহঙ্গীর মতো সাথী মনোনয়ন করতে পারে। সাথী নাকি আমার সুপরিচিত। তাই তার নাম করেনি।"

রত্ন তত ক্ষণে পদ্মরাগমণির মতো রক্তিম। ভাবের আবেগে ভাষাহীন।

প্রভাত বলল, "দেখলে তো আমি কেমন ঝানু ডিটেকটিভ। ঠিক ধরে

ফেলেছি বিহঙ্গটি কে। কিন্তু আমার কথা শোন। ওর স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়, হিন্দুরা সেদিকে হুঁশিয়ার। মহাভারতের যুগ ফিরে আসুক এটা ওদের মনোবাঞ্ছা। কিন্তু স্বামীত্যাগ করে স্বয়ংবর? অসম্ভব! অবাস্তব!"

"তা হলে বলি সব কথা।" রত্ন প্রাণ খুলে বলতে চেয়েছিল, সুযোগ পায়নি, আজ পেলো। "সোনালীই এর মূলে। তার জন্যে বরাবর আমার মনে একটা ব্যথা ছিল। নিজের অক্ষমতায় আমি একান্ত লজ্জিত ছিলুম। শ্রীমতী যখন আমাকে সোনালীর সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করল তখন আর একবার আমি হাত লাগিয়ে দেখলুম। এবার এই শিখলুম যে পাঁক থেকে টেনে তুলতে বল লাগে। সে বল কেবল প্রেমের আছে। প্রবল প্রেম ব্যতীত আর কেউ পারবে না ওকে উদ্ধার করতে। গোরীর সমস্যা অবশ্য একজাতের নয়। তা হলেও বেশ কিছু মিল আছে। ওখানে নগ্ন বাহুবল। এখানে মন্ত্রপূত বাহুবল। নারীর অন্তরাত্মা যাকে চায় তাকে সে পাবে না। যাকে চায় না তাকেই মেনে নিতে হবে। মেনে না নিলে তার দেহমনের উপর অত্যাচার করা হবে। যত দিন না মেনে নিচ্ছে তত দিন অত্যাচার লেগে থাকবে। দিনে দিনে তার প্রতিরোধক্ষমতা ক্ষয়ে আসবে। এমনি করে একদিন তার স্পিরিট ভেঙে যাবে। কায়িক আত্মসমর্পণ এখানে স্পিরিচুয়াল ডিফিট। তা হলে সোনালীর সঙ্গে শ্রীমতীর সত্যিকার তফাৎটা কোথায়? সমাজ অন্ধ, তা বলে তুমিও কি তাই?"

প্রভাত হয়তো প্রতিবাদ করত, কিন্তু রত্ন তাকে মুখ খুলতে দিল না। বলে চলল, "ভাই প্রভাত, চক্ষুষ্মান হলে তুমিও দেখতে পেতে সেই একই সমাধান এখানেও। প্রবল প্রেম ভিন্ন আর কারো সাধ্য নেই যে ওকে উদ্ধার করে। ও যে আপনাকে আপনি উদ্ধার করবে তার জন্যেও চাই প্রবল প্রেম। প্রতি রাত্রেই ওকে প্রতিরোধের জন্যে সশস্ত্র হতে হয়। শস্ত্রটা সম্পূর্ণ নৈতিক। কিন্তু আত্মা বিমুখ হলেও দেহ উন্মুখ হতে পারে। প্রবৃত্তি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সেইজন্যে ওকে বিশ্বাস করতে হয় যে, ও প্রেমসূত্রে অপরের নারী। অপরের সঙ্গেই ওর সর্বপ্রকার সম্পর্ক। ওর যত কিছু চাহিদা সব মেটাতে পারে ওর সেই অ-পর পুরুষ। ওর স্বকীয় পুরুষ। প্রেমসূত্রে আপন। বরণসূত্রে বর।

তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে প্রতিরোধ করতে হবে পরিপূর্ণ প্রেমের নামে। নয়তো জাগবে না পরিপূর্ণ প্রতিরোধশক্তি। সে শক্তি অসীম, কেননা সে শক্তি অসীম প্রেমের। আমার দিকে তাকালেই ও আশ্বাস পায় যে অসীম প্রেম ওর নাগালের মধ্যে। আমি ওর ভাই হতে চেয়েছিলুম। রাখীবন্ধ ভাই। কিন্তু ও বলে ও আমাকে রাখী পরিয়েছে কান্ত ভেবে। এখন তো মালাদির প্রতি আমার আনুগত্য নেই। আমি তবে কার মুখ চেয়ে প্রত্যাখ্যান করব গোরীকে? প্রেমকে? রাখীকে?"

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক যে জিনিসটি করতে বারণ করেছিলুম সেই জিনিসটি তুমি করলে। একেই বলে নিয়তি। শ্রীমতীর কি বন্ধুর অভাব, না প্রেমিকের! এক পাল পুরুষকে ও ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু তোমার মতো মেড়া কেউ নয়। চোখে না দেখেই জান কবুল করা! যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ও আমাকে ভাই বলে ডেকেছে, আমার শরণ নিয়েছে। বোন যদি শরণাগত হয় ভাই কি তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারে! তার জন্যে কী করা যায় তাই ভাবছি। হিন্দুর ঘরের বৌ তো আদালতে গিয়ে ছাড়পত্র দাবী করলে পাবে না। তা হলে তার মুক্তি বলতে কী বোঝাবে? বিবাহ থেকে মুক্তি নয়, অন্তঃপুর থেকে মুক্তি। অবরোধ থেকে মুক্তি। পৃথক বসবাস। স্বতন্ত্র জীবিকা। স্বাধীন মেলামেশা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার গোরী তোমার কাছে পরকীয়াই রয়ে যাবে। বিবাহিতা নারী, অবিবাহিত পুরুষ। বড় কষ্ট, রতন! বড় দুঃখ! চিরটা কাল টেনসন। সে টেনসন তুমি পারবে না সইতে। সেও কি পারবে!"

ও যেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলা। অশ্রু ধোওয়া। বুকভাঙা। রত্ন কতটুকু ভুগেছে কতটুকু জেনেছে যে বন্ধুর উক্তির প্রতিবাদ করবে, বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করবে! তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস জোরে জোরে পড়ছিল। বুক উঠছিল নামছিল। বেশ মালুম হচ্ছিল সে ঘোরতর অশান্ত।

"গোড়াতেই তোমার ভুল হচ্ছে, ভাই।" সে উত্তেজনা দমন করে বলল, "গোরী পরকীয়া নয়। কোনো কালেই ছিল না। ও স্বীকারই করে না যে ওর বিয়ে হয়েছে। বিয়ে তো একটা অনুষ্ঠানমাত্র নয়। আর বিয়ে যদি হয় বলপূর্বক

তবে তা বিয়েই নয়। তা আইনে টিকতে পারে, ন্যায়ে টিকবে না। ন্যায়ত গোরী অবিবাহিতা। কৌমার্য যাওয়া ও কুমারীত্ব যাওয়া একই কথা নয়। সে কুমারী। আমি কুমার। সে তার স্বকীয়া। আমি আমার স্বকীয়। প্রেমের নিয়মে আমরা পরস্পরের স্বকীয় স্বকীয়া। প্রেমের নিয়মের সঙ্গে বিবাহের নিয়ম যদি না মেলে তবে বিবাহের নিয়ম বদলাতে হবে। সে নিয়ম শাশ্বত নয়।"

প্রভাত আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল, "বুঝি সব। কিন্তু তার অনেক দেরি। সমাজ চলে শত লক্ষ পায়ে। ব্যক্তি চলে দুটি মাত্র পায়ে। সমাজ কি ব্যক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারে! দশ বিশ বছর সবুর করলে হয়তো সমাজ তোমাদের সঙ্গে পা মেলাবে। কিন্তু প্রেম কি তত দিন পায়চারি করবে! প্রেমেরও একটা ঋতু আছে। এই বসন্ত ঋতু যেমন। তার পর দেখবে প্রেমের বদলে আছে গভীরতম স্নেহ, অকপট প্রীতি। প্রেম নয়। প্রেম চলে গেছে। প্রেম পাত্রান্তরিত হয়েছে। বিবাহের নিয়ম শাশ্বত নয়। কিন্তু প্রেমের অধিষ্ঠান কি শাশ্বত! তাই যদি হতো তবে আবার আমি প্রেমে পড়তুম কেন?"

প্রভাত যেন এই খবরটুকু জানাতে এসেছিল। দমকা হাওয়ার মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। রত্নর মনে পড়ল যে সেদিন রাত্রে ও যেন এই কথাটি বলতে চেয়েছিল। বলেনি।

তিন

এর মধ্যে একদিন একটা স্বপ্ন দেখে মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল রত্নর। সরে যাওয়া লেপটাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে সে ভেবেছিল আয়েস করে শুয়ে থাকলে ভাঙা ঘুম আবার জোড়া লাগবে। হারানো স্বপন ফিরে আসবে। দ্বিতীয় বার দেখা দেবে সেই স্বপ্নের মেয়েটি যে এক অখ্যাত পুরুষের আখ্যান শোনাতে গিয়ে বলেছিল, "সত্যিকার ভালোবাসা যদি জীবনে আসে সব কিছু রূপান্তরিত হয়।"

রত্ন অনেক ক্ষণ বানানো স্বপ্ন দিয়ে মিলিয়ে যাওয়া স্বপ্নের জের টানল। কিন্তু তার স্বপনচারিণীর মুখ স্মরণে আনতে পারল না। পাছে কথাগুলিও

ভুলে যায় সেই ভয়ে সে শীতের রাতে শয্যা ছেড়ে উঠল। ছেঁড়া কাগজের টুকরোর গায়ে পেনসিল দিয়ে টুকল, "সত্যিকার ভালোবাসা যদি জীবনে আসে সব কিছু রূপান্তরিত হয়।"

ওটা যেন ব্যক্তিগত একটা বাণী। রত্নর প্রতি কোনো অপরিচিতার। না, সে গোরী নয়। গোরীর মুখ তো ফোটো থেকে চেনা। অপর কোনো শুভাধ্যায়িনী তার প্রয়োজনের সময় তাকে এই বাণী দিয়ে গেল স্বপ্নযোগে। আরো কয়েক জনের সাক্ষাতে। তাদের উপস্থিতি ভেদ করে। গল্পচ্ছলে। তারা পেলো গল্প। সে পেলো মর্ম।

অত রাত্রেও কোকিল ডাকছিল। কোকিলা সাড়া দিচ্ছিল। ডাকাডাকি করতে করতে ওরা একটু একটু করে কাছাকাছি হচ্ছিল। কেউ কাউকে চোখে দেখেনি। দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু না দেখলেও চিনতে পারছিল। ওরাই যেন রত্ন ও শ্রীমতী। পাখী হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। যে যার বন্ধন ছেদ করেছে। দুজনেই মুক্ত।

শুয়ে শুয়ে গোরীর রূপ ধ্যান করতে করতে কখন এক সময় রত্ন আবার ঘুমিয়ে পড়ল। জাগল যখন, তখন শীতকালের রোদ উঠেছে। তার বন্ধু বিদ্যাপতি তার ঘরে ঢুকতে না পেরে ডাকাডাকি করছে। ওটা ঠিক কোকিলের ডাক নয়।

সতীর্থের সঙ্গে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বসে রত্নর চোখে পড়ল, "সত্যিকার ভালোবাসা যদি জীবনে আসে সব কিছু রূপান্তরিত হয়।" কখন এ কথা লিখল? রাত্রে বিছানা থেকে উঠে? এ কি তার লেখা? না এ তাকে দিয়ে লেখানো? তার নয়, আর কারো উক্তি। কে সে? ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে স্বপ্নের সেই দৃশ্য। স্বপ্নের মেয়েটিও আবছায়া মতন। যেমন প্রাচীন গুহাচিত্রের অবশেষ। তার উপর রং চড়িয়ে তাকে তার স্বরূপ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

"আচ্ছা, ভাই," রত্ন সুধাল তার বন্ধুকে, "আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়? আমি কি তেমনি আছি? না আমার কোথাও কোনো রূপান্তর ঘটেছে?"

অদ্ভুত প্রশ্ন। বিদ্যাপতি এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ফ্যাল ফ্যাল করে

তাকিয়ে রইল। রত্ন সেই শীতের প্রত্যুষেও ঘেমে উঠল, কিন্তু ভেঙে বলল না কী বৃত্তান্ত।

তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বিদ্যাপতি কিছু ক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করল। বলল, "হাঁ, তোমার ললাটে সূর্যোদয়ের আভা। বাইরের সূর্যোদয়ের নয়। ভিতরের। তুমি কি তাকে ধ্যানে অবলোকন করেছ? সেই পরম সৌন্দর্যকে? যার জন্যে হিমালয়ে যেতে হয় না। টাইগার হিলেও উঠতে হয় না। সেই একান্ত সূর্যোদয়কে?"

তখন খুলে বলতে হলো গত রাত্রের স্বপ্নপ্রসঙ্গ। তা শুনে বিদ্যাপতির দুই চোখ তার কচ্ছপের খোলার চশমার দুই কাঁচের সঙ্গে সমান হলো।

"আমিও মাঝে মাঝে ওকে স্বপ্ন দেখি। ওর নাম স্বপ্নাবতী। ও আমাদের শুভকারিণী শক্তি। জীবনের এক একটি সন্ধিক্ষণে ওর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভাই রত্ন, তোমার জীবনের এটি একটি সন্ধিক্ষণ। তোমার জীবনে ভালোবাসা এসেছে, কিন্তু এ ভালোবাসা সত্যিকার কি না তুমি কেমন করে জানবে, যদি না সত্যিকার ভালোবাসার লক্ষণ কী তা জেনে রাখ? স্বপ্নাবতী তোমাকে তা জানিয়ে রাখল।"

রত্ন অবশ্য বিশ্বাস করল না যে স্বপ্নাবতী বলে কেউ আছে। বিদ্যাপতির মতো সে অকাল্ট ব্যাপারের ধার ধারে না। মিস্টিক আর অকাল্ট দুই এক নয়। কিন্তু স্বপ্নাবতী বলে কেউ না থাকলেও স্বপ্নলব্ধ বাণীটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো সে বাণী জাগ্রত অবস্থায় আর কারো কাছে পাওয়া। কবে তা স্মরণ নেই।

"ভাই বিদ্যা, সব ভালোবাসাই সত্য। তা যদি হয় তবে সত্যিকার ভালোবাসা বলে ইতরবিশেষ করবে কী করে?" জানতে চাইল রত্ন।

"সব ভালোবাসাই সত্য। কিন্তু সত্যিকার ভালোবাসা সত্যি দুর্লভ। সবাইকে সে সৌভাগ্য দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় হাজারে একজনকে। না, হাজারে একজনকেও না। লাখে একজনকে। না, লাখেও না। আমার সমনামা কবি বলে গেছেন, লাখে না মিলল এক। ভাই রত্ন, সত্যিকার ভালোবাসা আমি একটিই দেখেছি, যদিও ভালোবাসা দেখেছি অনেক। সত্যিকার ভালোবাসার

দাবী এমন সর্বগ্রাসী যে তাকে আমি দূর থেকে প্রণাম করি। আমার ওই সাধারণ ভালোবাসাই নিরাপদ।"

"তা হলে সৌভাগ্য কেন বললে? দুর্ভাগ্য বল।" রত্ন ভুল ধরল।

"যা বলেছ। কিন্তু সে দুর্ভাগ্য সবাইকে দেওয়া হয় না। যাদের দেওয়া হয় তারা যদি শেষপর্যন্ত ঠিক থাকে তবে তারাই সংসারের সার।"

রত্নর মুখে ছায়া নেমে এলো। এত যে আনন্দ এ কি নিরানন্দের পূর্বাভাষ!

বিদ্যাপতি আনমনে কী ভাবছিল। করুণ কণ্ঠে বলল, "থাক। আজ না। আরেক দিন তোমাকে আমার মেসোমশায় আর মাসিমার কাহিনী শোনাব।"

"তোমার আপন মাসিমা?"

"না। আমাদের প্রতিবেশিনী ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আমার পড়ার খরচ তো আগে তিনিই দিতেন। বৃত্তি পেতে আরম্ভ করি ম্যাট্রিকের পর থেকে। তার পর একদিন তাঁর সঙ্গে আমার মনান্তর হয়ে যায়। বলব, কেন। আজো বোঝাপড়া হয়নি।"

রত্ন কৌতূহলী হয়েছিল। দুঃখিত হলো। যেখানে সত্যিকার প্রেম সেখানেও মনান্তর! পরে এক সময় বিদ্যাপতি ওকে তার মাসিমার কাহিনী শোনাল।

ধনী ও মানী পিতার একমাত্র দুহিতা অলকনন্দা দেশনায়ক বিধুশেখরের প্রেমে পতিগৃহ ত্যাগ করেন। পতি যদিও কৃতী, পুত্র যদিও শিশু। আর বিধুশেখর? তিনি বিসর্জন দেন তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। কালি মাখিয়ে দেন তাঁর উচ্চ কুলে। ঘরে ছিলেন তাঁর পতিব্রতা পত্নী, তাঁর সাধের দুলালী। ঘরেই রইলেন তাঁরা। তিনি চললেন বাইরে। বিদেশে। অপবার সঙ্গে। যে দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই দেশ রইল পিছনে পড়ে। বিজেতার বুটের তলায় অসহায় অসাড়। তখনো গান্ধী আসেননি।

অর্থের অসদ্ভাব ছিল না। ইচ্ছা করলে আজীবন বিদেশেই বসবাস করতে পারতেন। হয়তো ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহিতও হতে পারতেন। কিন্তু তেমন ইচ্ছা শেখরবাবু বা অলকাদেবী দু'জনের কারো ছিল না। বছর কয়েক বাদে

দ্বিতীয় ভাগ

দেশে ফিরে এসে তারা প্রথমে ঘর বাঁধলেন হিমালয়ের কুলু উপত্যকায়। তার পর এক পা এক পা করে পিছু হটতে হটতে পৌঁছে গেলেন শেখরবাবুর নিজের শহরে। কিন্তু নিজের মঞ্জিলে নয়। সেটা দুয়োরানীর দখলে। সুয়োরানীর জন্যে তখন অন্য ভবন গড়া হলো। সেখানে শেখরবাবুরও অবস্থান। দুয়োরানীর সঙ্গে তাঁর সংস্রব রইল না।

শেখরবাবু মনে করেছিলেন তাঁর জন্যে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা করছে। বিদেশে তিনি এক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি। ভারতের জন্যে আন্দোলন চালিয়েছেন। পার্লামেণ্টে বার বার ভারতপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়েছেন। স্বাধীনতা অর্জনের আইরিশ পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন। নতুন একটা প্রোগ্রাম নিয়ে তিনি নামতে চাইলেন রাজনীতিতে, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীরা কেউ দেখা দিলেন না। দেখা করতে চাইলে ধরাছোঁয়া দিলেন না। তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে পাবলিক লাইফ থেকে তাঁর নাম মুছে গেছে। তার পর সামাজিক জীবনে যোগ দিতে গিয়ে তাঁর শিক্ষা হলো যে বহুগামী দুশ্চরিত্রদেরও সেখানে মান আছে, অথচ স্থান নেই শুধু তাঁর। তাঁর অপরাধ তিনি সমাজের মর্মস্থলে আঘাত হেনেছেন। বেশ্যা হলে কথা ছিল না। সে তো কারো সম্পত্তি নয়। নিম্ন শ্রেণীর রক্ষিতা হলেও কথা উঠত না। নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টি তো উচ্চ শ্রেণীর সেবার জন্যে। কিন্তু এ যে অভিজাত বংশের কুলবধূ! স্বামীর সম্পত্তি। সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা করলে কারো সম্পত্তি নিরাপদ নয়। তাঁর কাছে তবু দু'চার জন পুরাতন বন্ধু কালেভদ্রে আসেন। মাসিমার কাছে কেউ কোনো দিন আসে না। তিনি যে কলঙ্কিনী কুলটা! মহিলারা তাঁর কাছে এলে মহিলামহলে মুখ দেখাবেন কী করে!

পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে তাঁদের তো কেউ ভুলেও ডাকে না। অথচ টাকার জন্যে পায়ে ধরতেও বাধে না। প্রাপ্যের অধিক পায়। তবু ক্ষমা নেই। কী করলে যে আপনার লোকের মন পাওয়া যাবে এ হলো তাঁদের দৈনন্দিন ভাবনা। বারো বছরেও তাঁরা তপস্যার ফল পেলেন না। অযোধ্যার লোকের মতো এদেরও সেই একই দাবী। অলকাদেবীকে ত্যাগ করতে হবে। শেখরবাবুই অজস্র ব্যয় করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। যদিও পছন্দটা তাঁর নয়, মেয়েব মায়ের। তবু

কারো মন ভিজল না। মেয়ে আপনার হলো না। আরো পর হলো। মেয়ের মা তো পরের চেয়েও পর। যদিও পরকীয়া নন। ওদিকে অলকাদেবীর স্বামী আবার বিয়ে করেছিলেন। ছেলে নতুন মাকে পেয়ে পুরোনো মাকে ভুলেছিল। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে তার মা নেই, মারা যান তার শিশুবয়সে। একটু একটু করে শেখরবাবু ও অলকাদেবীর মনে দাগ কাটল যে এ সংসারে তাঁরা ভিন্ন তাঁদের আর কেউ নেই। আর যারা আছে তারা টাকা আছে বলেই আছে। টাকা যদি পরে না থাকে তারাও কেউ থাকবে না। থাকবে হয়তো গুটি কয়েক বাল্য বন্ধু। আর কর্তার আমলের ভৃত্য।

অনায়াসেই কলকাতায় বাস তুলে নেওয়া যায়। সেখানেও তাঁদের বাড়ী আছে। কিন্তু সেটা হতো পরাজয়। তেমনি অতি সহজেই মুসলমান হয়ে তালাক নিয়ে নিকা করা যায়। কিন্তু সেটা হতো আরো বড় পরাজয়। প্রেমের নিয়ম মেনে তাঁরা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন তবে সেটা সত্যাগ্রহীদের মতো আইন লঙ্ঘন। তার জন্যে দণ্ডবিধি যদি সাজা দেয় তবে সাজা ভোগ করাই কর্তব্য। দীর্ঘকাল পরে সমাজ একদিন উপলব্ধি করবে যে সত্যাগ্রহীর কাছে যেমন বিবেকের দাবী প্রেমিকপ্রেমিকার কাছে তেমনি প্রেমের দাবী। সে দাবী এমন দাবী যে তাকে উপেক্ষা করে রাজার দাবী বা সমাজের দাবী মেনে নেওয়া ভালো নয়। প্রেমে না পড়লে তাঁরাও আর দশ জনের মতো সমাজের অনুগত প্রজা হতেন। প্রেম যখন এসেছে তখন প্রেমের জন্যে সমাজের হাতে মার খেতে হবে। লাগবেই তো। না লাগলে প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হয় না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তাঁদের কিছু অর্থসামর্থ্য আছে। নইলে মারটা আরো বেশী লাগত। কিন্তু এই বা ক'দিন! লক্ষ্মী চিরদিন চঞ্চলা।

এ অবস্থায় আর কেউ হলে প্রাণপণে ধনসঞ্চয় করত। তাঁদের কিন্তু উলটো বিচার। গরিবের ছেলে গরিবের মেয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করছে দেখলেই তাঁরা জলপানি দেন। বহু ছাত্রছাত্রী তাঁদের সাহায্যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। তার পরে যারা কলেজে পড়তে চেয়েছে তাদের বেলা কিন্তু একটা অলিখিত শর্ত। মুখ ফুটে কাউকে কোনো দিন বলেন না, কিন্তু কথায় বার্তায় কৌশলে জেনে নেন কার চোখে প্রেমের দাবী বড়, কার চোখে সমাজের দাবী। ষোলো বছর

দ্বিতীয় ভাগ

বয়সেও যাদের চোখ ফুটল না তাদের উচ্চাভিলাষ থাকে তো তারা নিজেরাই খেটেখুটে খরচার টাকা তুলবে। আর যাদের জ্ঞানোদয় হয়েছে তাদের কলেজে পড়ার ভার তাঁরা বইবেন। তাঁদের মানসপুত্র মানসী কন্যা তারা কয়েক জন। হলোই বা তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ছেলেমেয়ে কি মানুষের রাশি রাশি হয়!

বিদ্যাপতি তাঁদের ঘরের ছেলের মতো। ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের সঙ্গে ভাব। তার গুরুজন তাকে বারণ করেছিলেন ও বাড়ীতে যেতে। গেলে লোকে কী মনে কববে! কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তরে লোকনিন্দার কারণটা বলেননি। সেইজন্যে সে মানা মানেনি। বড় হয়ে সে নিজেই আবিষ্কার করল। মাসিমা আরেক জনের স্ত্রী। মেসোমশায় আরেক জনের স্বামী। তখন সে লজ্জায় মরে যায়। তাঁদের বাড়ী আর পা দেয় না। তার পর সে এই বলে আপনাকে বুঝ দেয় যে তাঁরা যখন স্বামীস্ত্রী নন তখন স্বামীস্ত্রীর মতো বাস করেন না নিশ্চয়। তার ধারণা তাঁরা অসিধার ব্রত পালন করেন। লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলা যেমন। আরো বড় হয়ে সে তার সহপাঠীদের হাসি মশকবা সইতে পারল না। বাজি রাখল। মাসিমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে ও কথা জানাল। তিনি ভীষণ গম্ভীব হয়ে গেলেন। অনেক ক্ষণ নিরুত্তর থেকে তার পব বললেন, "বাচ্চু, তুমি হেবে গেলে।" এই বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। বিদ্যাপতিও কেঁদে আকুল। তার বুক ভেঙে গেল।

মাসিমা সেদিন তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। বললেন, "চুম্বক আব লোহা। দুই পরিবারের লোক কত চেষ্টা কবল ছাড়াতে। আমরাও কিছু কম চেষ্টা কবিনি। কেন দুঃখ দেওযা নিবীহ শিশুকে, নিবপবাধ স্বামীকে! পতিব্রতা সহধর্মিণীকে, পিতৃমুখী কন্যাকে! অগণিত আত্মীয় স্বজনকে! গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে! কিন্তু কী করব, যে শক্তি আমাদেব টানছিল সে যে আমাদেব চেয়ে ঢের বেশী বলবান। তাদের চেয়েও। সে যে আমাদের আলাদা হয়ে থাকতে দেবে না। বাঁচতে দেবে না। যখন নিশ্চিত জানলুম যে বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত একসঙ্গে থাকা তখন বিপবীত চেষ্টা ছেড়ে দিলুম। এ কি কখনো হতে পারে যে তিনি থাকবেন অথচ আমি তাঁর কাছে থাকব না? বা আমি থাকব, অথচ তিনি আমার কাছে থাকবেন না? এই প্রশ্নের একটিমাত্র

উত্তর। এক অক্ষরে। 'না।' আপনাকে স'পে দিলুম তাঁরই হাতে যিনি আমার সব চেয়ে আপন। তিনিও তাই করলেন। জ্ঞানত আমি কাউকে পরিত্যাগ করিনি, তিনিও করেননি পরিত্যাগ। একজনকে বরণ করলে যে আর সবাইকে বর্জন করতে হয় এটা আমাদের কথা নয়। এটা তাঁদেরই কথা। সংসারের রীতি এই, তা কি তখন অত স্পষ্ট করে জানতুম! এত দিনে জেনেছি। কিন্তু মানিনে।"

তার পর তিনি আরো বললেন, "বিদেশে গিয়েও বিবাহের কোনো ভদ্র উপায় পাইনি। কুল্লু উপত্যকায় সংসার পেতেও প্রান্তনের মায়া কাটাতে পারিনি। প্রিয়জনের আকর্ষণে ধীরে ধীরে ফিরে এসেছি এখানে। ধীরে ধীরে সমাজের সহানুভূতি অর্জন করতে চেয়েছি। আমরা জানতুম না যে আমাদের কপালে রয়েছে ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যান। তা বলে এত দূর! আর এত কাল ধরে! এর যেন অন্ত নেই এ জীবনে। ওঁরই দুঃখ বেশী। নিজ বাসভূমে পরবাসী উনি। কত লোকের পূজো পেয়েছিলেন। পূজোর পরেই বিসর্জন আর নদীর জলে নিমজ্জন! কীই বা তাঁর অপরাধ! ভালোবাসা কি পাপ!"

বিদ্যাপতি নিবেদন করল, "না, ভালোবাসা পাপ নয়। কিন্তু অসিধার লঙ্ঘন করা তো ভালোবাসার পর্যায়ে পড়ে না। মহাত্মাজী কি কস্তুরবাকে কম ভালোবাসেন? বরং আরো বেশী ভালোবাসতে পারছেন সেই ব্রত নেবাব পর থেকে।"

তিনি কিছু ক্ষণ মৌন থাকলেন। তার পর নতমুখে বললেন, "অসিধার ব্রত নিলে তার অর্থ এই হতো যে ওঁকে আমি পতিব অধিকাব দিতে কুণ্ঠিত। আত্মসমর্পণে সঙ্কুচিত। আর উনি আমাকে অপরেব প্রতি একনিষ্ঠ ভাবতেন। পরকীয়া ভাবতেন। প্রেমের যেটা চরম পরীক্ষা সেটাতে আমি অনুত্তীর্ণ হতুম। প্রেম যখন দেয় তখন সর্বস্ব দেয়। হাতে রেখে দেয না। কার জন্যে হাতে রাখবে? দ্বিতীয় কেউ থাকলে তো? আমার যদি দ্বিতীয় কেউ থাকে তবে ওঁরও যে দ্বিতীয় কেউ থাকবে। সেটা তো আমার ইচ্ছা নয়। সেটা প্রেমের নিয়মও নয়। এ খেলায় শুধু একজন একজনের পার্টনার। অসিধার অসাধ্য বলে নয়, অসিধার অসংগত বলে ভঙ্গ করেছি। তা বলে আমরা উচ্ছৃংখল নই,

বাচ্ছ। প্রেমের ডিসিপ্লিন বিবাহের ডিসিপ্লিনের চেয়েও কড়া। বিবাহে অসংযত হলে বিবাহ ভেঙে যায় না, কিন্তু প্রেমে অসংযত হলে প্রেম চলে যায়। সেইজন্যে বেশী ধরা দিতে নেই। এর পরেও কি তুমি মনে করবে যে আমরা পাপী আর পাপীয়সী? আমারি তো বিশ্বাস উনিও একজন মহাত্মা। যদিও লোকের বিশ্বাস অন্যরূপ। লোকমতের রায় কি কোনো দিন বদলাবে না? আমরা অপেক্ষা করব।"

বিদ্যাপতির মন মানল না। তিন বছর কেটে গেছে। এখনো সে বিকার বোধ করে এইজন্যে যে, যারা বিবাহিত নয় তারা ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী নয়। যারা ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী নয় তারা জনকজননী নয়। কিন্তু যতবার তাঁদের ওখানে যায় ততবার লক্ষ করে অবাক হয় যে তাঁরা যেন নতুন করে প্রেমে পড়েছেন। যেন নববিবাহিত দম্পতি। গান্ধী-গান্ধীজায়ার সমবয়সী, অথচ তাঁদের তুলনায় যুবকযুবতী। যৌবন যেন তাঁদের ছাড়তে চায় না। দূর থেকে এত যে বিকার ও বিরাগ কাছে গেলে তা এক মুহূর্তে জল হয়ে যায়। দণ্ড দিতে আসে, কিন্তু হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে। ভেবে পায় না কোথায় তাঁদের দোষ। কত মহৎ তাঁরা! কত নম্র! কেমন ভাস্বর! কেমন চরিত্রপূর্ণ! ব্যক্তিত্বময়! মর্যাদাবান! তাঁদের নিন্দুকদের চেয়ে তাঁরা কত উচ্চ! কত উন্নত! বিদ্যাপতি তাঁদের চেয়ে ভালো কাকেই বা দেখেছে তার শহরে! তাঁদের চেয়ে ভালোবাসতে কাকেই বা দেখেছে স্বচক্ষে! মামুলী ভালো আর মামুলী ভালোবাসা দেখে কি তৃপ্তি হয়! তাই তো সে তাঁদের ওখানে যায়। কিন্তু সমর্থন করতে অক্ষম বোধ করে। লোকে যখন তাকে চেপে ধরে সে তাঁদের পক্ষ নেয়, কিন্তু তর্কে হেরে যায়।

এই তিন বছরে সে বিভিন্ন দিক থেকে ভেবেছে, কিন্তু তথ্যের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে তথ্য মেলাতে পারেনি। একবার ভাবে মাসিমা হচ্ছেন মোহিনী নারী, জননী নারী নন। তার পর লক্ষ করে পরের সন্তানের প্রতি কী অপরিমেয় স্নেহ! ছোট ছেলেব অসুখ হয়েছে শুনলে তিনি নিজের ডাক্তার পাঠিয়ে দেন, ফল কিনে দেন, পথ্য কিনে দেন, ওষুধ কিনে দেন। যেখানে তাঁর যেতে বাধা নেই সেখানে নিজে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেন। বিনা বেতনের নার্স হয়ে তাঁর কী তৎপরতা! দুঃখ হয় এ রকম এফিসিয়েণ্ট মহিলা সমাজের কোনো

কাজে লাগলেন না। বিদ্যাপতির দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একাই একটা হাসপাতাল চালাতে পারতেন। তাঁর বাড়ীতেও রুগ্ণ শিশুরা গিয়ে জোটে। কাছে রেখে চিকিৎসা করান। মেসোমশায় বিরক্ত না হলে বাড়ীতেই হাসপাতাল বসত। তিনি বলেন, "তোমার ওটা একটা দুর্বলতা, অলকা। কেউ একবার 'মা' বলে ডাকলে তুমি অমনি গলে জল হয়ে যাও। যতই কর, যতই দাও, ভবী ভুলবে না। সামনে বলবে, 'মা।' পিছনে বলবে, 'মাগী।' তার চেয়ে চল, কলকাতা যাই। সেখানকার লোক এদের মতো অযোধ্যার লোক নয়।" তার উত্তরে মাসিমা বলেন, "এরা যে আমার শ্বশুরবাড়ীর লোক। এদের কি আমি ছেড়ে যেতে পারি!"

রত্ন এ কাহিনী শুনে বিচলিত হয়েছিল। এ যেন তারই উপাখ্যান। তার ও গোরীর। বাদসাদ দিয়ে। জোড়াতালি দিয়ে।

"ভাই বাচ্চু, তোমাকে বাচ্চু বলছি, কিছু মনে কোরো না। কিন্তু তোমার ওই অনমনীয় মনোভাব আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আমাকে বল কোনখানে তোমার বাধছে।"

বিদ্যাপতি চিন্তা করে বলল, "প্রেমহীন বিবাহ বা বিবাহহীন প্রেম কোনোটাই আদর্শ নয়। একটা যদি হয় তপ্ত কটাহ তো আরেকটা হচ্ছে জ্বলন্ত উনুন। দুটোকেই এড়াতে হবে। ওঁদের উচিত ছিল আজীবন অপেক্ষা করা। ইতিমধ্যে অন্যের সঙ্গে সংসার না করা। এমন করে সমাজকে ফাঁকি দেওয়া প্রকৃতিকে ফাঁকি দেওয়া কি ভালো?"

রত্ন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "জীবনকে ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে ভালো।"

বিদ্যাপতি মাথা নাড়ল। বলল, "সত্যিকার ভালোবাসাকেও নীতির আমলে আসতে হবে। ওটা নীতির ঊর্ধ্বে নয়। কিংবা নীতির বাইরে নয়।"

"কেন, নীতি লঙ্ঘিত হলো কোনখানে? প্রেমহীন বিবাহ নাকচ হলে পুনর্বিবাহ করে এঁরাই তো হতেন আদর্শ দম্পতী। তখন হয়তো জনকজননীও হতেন। এখন হলে সন্তানকে হেয় হয়ে থাকতে হয়। সে বেচারাকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় হবে। প্রেমহীন বিবাহ যে নাকচ হবার নয় সেটা কি এঁদের দোষ?

পুনর্বিবাহের যে কোনো ভদ্র উপায় নেই সে দোষটাও কি এ'দের? প্রেমের অস্তিত্ব যদি মানো, প্রেমের মূল্য যদি স্বীকার করো, তা হলে বাকীটুকু বুঝতে কেন তোমার এত সময় লাগছে? একেবারে ধরা না দিলে কি প্রেম থাকে? তা বলে সন্তান!" রত্ন রঙীন হয়ে শিউরে উঠল।

"তা বলে বিবাহিত না হয়েও বিবাহিতের অধিকার ভোগ করা সুনীতি হতে পারে না। আর ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিফল আছে। ক্রিয়া করবে, আর প্রতিফল এড়াবে, এ কেমনতর সুনীতি? ভাই রত্না, বিবাহ যে হয়নি এর জন্যে আমি তাঁদের দোষ ধরিনে। একসঙ্গে থাকেন যে, এটাও আমার সয়ে গেছে। কিন্তু অসিধার লঙ্ঘন আমার বিচারে নীতির সীমা লঙ্ঘন। ক্ষণিক দুর্বলতা উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস ওটা প্রেমের চরম পরীক্ষা। আমি বলি, আরো একটা পরীক্ষা বাকী থেকে যাচ্ছে যে! প্রেমের চিহ্ন বহন করা। তার দায় নেওয়া। হাঁ, সমাজে হেয় হবে সে। দাগী হয়ে থাকবে। সেটা যদি অন্যায় বলে বুঝে থাক তবে প্রেমের চরম পরীক্ষা দিতে যাও কেন? পুরোদস্তুর তপস্যা করে যাও লক্ষ্মণ আর ঊর্মিলার মতো। কাছাকাছি রয়েছ যে, এই পরম ভাগ্য। পাশাপাশি শুয়েছ যে, এই পরম সুখ।" বিদ্যাপতির আপোসের পরিধি এই পর্যন্ত।

রত্নর মুখখানা সিঁদুরে হয়ে উঠল। যেন ধরা পড়ে গেছে সে নিজে। কোনো মতে আত্মসমর্পণ করে সে যেন আত্মপক্ষ সমর্থন শুরু করে দিল। "ভাই বাচ্চু, প্রেমিকপ্রেমিকা যদি বিয়ের মন্ত্র পড়ে তা হলে তো কেউ প্রত্যাশা করে না যে তারা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হবে। অথচ যে প্রেমিকপ্রেমিকা বিবাহিতের মতো একনিষ্ঠ থাকলেও বিয়ের মন্ত্র পড়েনি, পড়ার সুযোগ পায়নি, তাদের কাছে সমাজ দাবী করে সন্ন্যাস। ভাই বিদ্যা, অন্নপ্রাশন উপনয়নেব মতো আর একটা সংস্কারকে কি তুমি এতখানি গুরুত্ব দেবে যে নীতির আকাশে তুলে দেবে? সেই সংস্কারটি যাদের হয়নি তারা আকাশ থেকে পাতালে নামবে? যেহেতু ওটা রীতি সেহেতু ওটা নীতি?"

রত্ন সেইখানেই থামল না। ব্যাকুলভাবে মিনতি করল, "প্রেমিকপ্রেমিকা কেমন করে পরস্পরকে পরিপূর্ণ রূপে জানবে, সম্পূর্ণ রূপে চিনবে, যদি মিলন-মুহূর্তে উপলব্ধি করে যে তারা বিদেহী, তারা অঙ্গহীন? অমন করে হাত পা

বেঁধে রাখার মতো নির্মম কী হতে পারে? তাই বিদ্যা, নীতি বলতে কী বুঝব? পূর্ণতা না অপূর্ণতা?"

বিদ্যাপতি তথাপি অবুঝ। তার রায় হলো, "তাদের পক্ষে দূরত্বই ভালো। ঊর্মিলা থাকবে অযোধ্যায় আর লক্ষ্মণ থাকবে লঙ্কায়।"

রত্ন বলল, "এমনও তো হতে পারে যে লক্ষ্মণ থাকবে অযোধ্যায় আর ঊর্মিলা থাকবে লঙ্কায়। নারীর জীবন রাহুগ্রস্ত করবে রাক্ষসের ক্ষুধা।"

তার পর তার মনে পড়ে গেল বিদ্যাপতির আপত্তির অবশিষ্ট। তার মুখ জবাফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, "মিলন বলতে বুঝি একটা পরিপূর্ণ অখণ্ড অনুভূতি। সাধকরা আকাঙ্ক্ষা করেন পরমাত্মার সঙ্গে যে মিলন সেও তেমনি পরিপূর্ণ অখণ্ড। নরনারীর মিলনের সঙ্গেই তাঁরা তার উপমা দেন। বৈষ্ণব হলে আপনাকে নারী বলে কল্পনা করেন। পরমাত্মাকে পুরুষ বলে। সাযুজ্যের সাধনা হলো নরনারীভাবের সাধনা। এ সাধনা যখন পূর্ণাঙ্গ হয় তখন আর কোনো ধাপ বাকী থাকে না। এর মধ্যে ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত নেই। এ মিলন আপনাতে আপনি অবসিত। এটা মিলিত সৃষ্টির সোপান নয়। এইটেই পরম। এর পরতর নেই। রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলায় সৃষ্টিরক্ষার নীতি অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। তাতে রসভঙ্গ হয়।"

বিদ্যাপতি ঘাড় নাড়ে। তার বক্তব্য হলো, "মাসিমাকে আমি মায়ের মতো ভালোবাসি। মেসোমশায়কে বাপের মতো ভক্তি করি। মা বাপের বিয়ে হয়নি ভাবতেই আমার বুকের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসে। থাক, ওসব কথা মুখে আনতে নেই। আমারি ভুল হয়েছে। চলি।"

বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বলল বটে রত্ন উলটো কথা, কিন্তু তার সহজ বোধ তাকে মন্ত্রণা দিচ্ছিল যে প্রেম যতদিন অশরীরী থাকবে ততদিন অনাসক্ত থাকবে। কায়িক সম্পর্ক একবার যদি পাতানো হয় তবে সে বন্ধন আত্মিক বন্ধনেরই মতো অচ্ছেদ্য। সেও তেমনি মিস্টিক। কায়িক বলে কম মিস্টিক নয়। তখন যে পুরুষ পলাতক হতে চায় তার অনার নেই। সে ম্যান অফ অনার নয়। যার বিন্দুমাত্র অনার আছে সে মানুষের দৃষ্টিতে বিবাহিত না হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহিত। সামাজিক বিবাহের কাটান আছে, গান্ধর্ব বিবাহের

কাটান নেই। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভিত্তি এই সত্যের উপর। তাই সে অমর।

রত্নর প্রেম তাকে বন্দী করেছে, কিন্তু এখনো সে কায়িক সম্পর্ক পাতায়নি, যে বন্ধন আত্মিক বন্ধনেরই মতো অচ্ছেদ্য। শেখরবাবুর দৃষ্টান্ত তাকে পরিহার করতে হবে। সে প্যাটার্ন তার জন্যে নয়। তার প্যাটার্ন তাকেই নির্মাণ করতে হবে। সে হতে চায় সব স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে স্বাধীনতম, সব প্রেমিক পুরুষদের মধ্যে প্রেমিকসত্তম। এ সামঞ্জস্য কেমন করে সম্ভব? এ কি সম্ভব? হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!

শ্রীমতীরত্ন স্বাধীনরত্ন থাকতে পারবে তো? যদি থাকে, পরিপূর্ণ রত্ন হবে তো? যদি না থাকে তবে কী হবে? তবে কী হবে, হে ঈশ্বর! রত্ন তার অন্তর্যামীর কাছে আশ্বাস পেলো যে সে যা চায় তাই হবে। তার ও গোরীর ভালোবাসা যে সত্যিকার ভালোবাসা তার তাতে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাদের জীবনের সব কিছু রূপান্তরিত হবে, রূপান্তরিত হয়ে পরম সুন্দর হবে। কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ন্যূনতা হবে না, খর্বতা হবে না। রত্ন চিরদিন স্বাধীন নায়ক, গোরী চিবকাল স্বাধীনা নায়িকা। যুক্ত অথচ মুক্ত। মুক্ত অথচ যুক্ত। যুক্তমুক্ত।

রত্ন গোরীকে চিঠি লেখার সময় শেখর অলকার উপাখ্যান বর্ণনা করল। লিখল—

> ভেবে দেখছি ওঁদের জীবনের প্যাটার্ন আমাদের নয়। আমাদের প্যাটার্ন আমাদেরই রচনা করতে হবে। কেমন করে তা আজ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমরা হব ওঁদের সমান প্রেমিকপ্রেমিকা, কিন্তু ওঁদের চেয়ে স্বাধীনস্বাধীনা। কোথাও যদি বেরোতে না পারি তবে নিরালা বাড়ীতে চুপচাপ বসে থেকে আমি অকর্মণ্য হয়ে যাব। আর তুমি! তুমি আসবে এক অন্তঃপুর থেকে আরেক অন্তঃপুরে। যে স্বাধীনতার জন্যে তুমি ছটফট করছ সেই স্বাধীনতার জন্যে আবার ছটফট করবে। কিন্তু প্রেমের বাহুপাশ থেকে মুক্তি আরো কঠিন হবে। বন্দী হয়ে বন্দিনীকে নিয়ে কী করব আমি!

তুমিই বা করবে কী আমাকে নিয়ে! বিধিবন্ধ দাম্পত্য জীবন আমাদের জন্যে নয়। আমরা স্বাধীনস্বাধীনা।

আমরা ফ্রী ম্যান, ফ্রী উওম্যান। সেইসঙ্গে প্রেমিকপ্রেমিকা। কান্ত-কান্তা। সামঞ্জস্য এমন ভাবে হওয়া চাই যাতে প্রেমও থাকে, স্বাধীনতাও থাকে। অথচ কোনোটির চেয়ে কোনোটি খাটো না হয়। নিক্তির ওজনে দুই সমান। প্রেমের জন্যে আর সব দেওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতার জন্যে আর সব দেওয়া যায়, কিন্তু প্রেম দেওয়া যায় না। পারবে এই অসাধ্যসাধনের দায় নিতে? তবে এস আমরা স্বাধীন প্রেমিক স্বাধীনা প্রেমিকা হই। না পারলে আবার সেই রাখীবন্ধ ভাইবোন। সেটা অসাধ্য নয়। তাতে মনের জোর কম লাগে। আর এতে মাধুর্য আছে।

আমি তার জন্যেও প্রস্তুত, এর জন্যেও প্রস্তুত। তোমাকেই বেছে নিতে হবে কোনটা তোমার পছন্দ। আরো একবার সুযোগ দিচ্ছি, গোরী।

চার

ওদিকে রত্ন সম্বন্ধে গোরীর জল্পনাকল্পনার বিরাম ছিল না। সে যেন ভেবেই পাচ্ছিল না কী যে করবে রত্নকে নিয়ে। পুতুল নিয়ে যেমন ছোট মেয়েরা হয় দিশাহারা। মা যখন ছিলেন তিনিও তো তার ভবিষ্যৎ নিয়ে পুতুল খেলতেন। মেয়েরা কি সবাই ওইরকম! না রত্ন ওদের হাতের পুতুল হবে বলে জন্মেছে!

গোরী যেন একটা গল্প বলছে এমনি করে লিখেছিল একজনের কথা। তার নাম রত্নসিংহ। সে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের রণনায়ক। সাম্রাজ্যবাদী পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ বর্বর ইংগদ্বীপের পংগপালদের বিরুদ্ধে মুক্তিসৈন্য পরিচালনাই তার জীবনব্রত। সেই জনসেনাপতি গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুদর্শন সুগঠিত ও বলবান যুবাপুরুষ। তার গতিবিধি হাওয়ার মতো অদৃশ্য, হাওয়ার মতো সর্বত্র। তার ছদ্মবেশ অসংখ্য, ছদ্মনাম অগণ্য। ভুটানে সে কাঠুরিয়া, ভোপালে সে ভিস্তি। সিংহলে সে রিক্সা টানে, তিব্বতে সে পুঁথি ঘাঁটে। কোয়েটায় সে

দ্বিতীয় ভাগ

বোরখায় মোড়া বেগম, রাওলপিণ্ডিতে পাগড়িপরা উষ্ট্রচালক। সিপাইদের ছাউনিতে সে জ্যোতিষী, পুলিশের ব্যারাকে শিবপূজার পূজারী। ইংরেজ তাকে হাজার ফাঁদ পেতেও ধরতে পারে না। কেউ ধরিয়ে দিলে তো! ধরা পড়লেও সে পিছলে পালিয়ে যায়। তার মাথার দাম পঁচিশ হাজার রুপেয়া। কিন্তু কারো লোভ নেই ও টাকায়।

জনগণ তাকে ভালোবাসে। জনতার চক্ষে সে সুদর্শনচক্রধারী কৃষ্ণ। দেশের মেয়েরাও তাকে ভালোবাসে। মেয়েদের চোখে সে বংশীধারী কৃষ্ণ। কত মেয়ে যে তাকে মনে মনে কামনা করে। সে কিন্তু তাদের কাউকেই কামনা করে না। এ যুগের কৃষ্ণ বহুবল্লভ নয়। তার একমাত্র কামনা কে, জানো? যার নাম জ্যোৎস্না-গোরী। জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র যার রূপ। পুলকিত যার সঙ্গ। যে তার পথ চেয়ে বাতায়নের ধারে বসে থাকে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। গুপ্ত বার্তাবহ মধ্যে মধ্যে চিরকুট দিয়ে যায়। ঘামে ভেজা। রক্ত মাখা। অদৃশ্য কালি দিয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। প্রিয়ে, ধৈর্য ধর। আমি আসছি। জয় আমাদের অদূরে।

জ্যোৎস্না-গোরী কত কাল ধৈর্য ধরবে! তারও তো সাধ যায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে আহবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার গৌরব অর্জন করতে। ঝাঁসীর রানীর মতো নগ্ন কৃপাণ হাতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে লড়তে। লড়তে লড়তে রত্নসিংহের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। দুজনে দুই ঘোড়ায় চড়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে। কামান ডান দিকে। কামান বাঁ দিকে। কামান সামনের দিকে। বন বন করে ছুটে আসছে গোলা। আওয়াজ করে ফাটছে। রত্ন-গোরীর ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা সম্মোহিতেব মতো টগবগিয়ে চলেছে। কী করে যে বেঁচে আছে! মরে যদি একসঙ্গে মরবে। মুখে মুখ রেখে।

যদি বাঁচে তা হলে তাদের মতো সুখী কে? তারা সারা দেশের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে মালার মতো পরবে। সেই মালা হবে তাদের বরণমালা। সমাজ বলবে, হাঁ, এদের মিলন হওয়া উচিত। এদের মিলনে অযুত সম্ভাবনা। কিন্তু জ্যোৎস্না-গোরী যে অন্যপূর্বা। তাই নাকি? তা হলে তো আইন পালটাতে হয়। নইলে অমন সুন্দর দুটি জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সমাজ তখন

আপনি উদ্যোগী হয়ে আইন বদলে দেবে। না দেয় তো রত্ন-গোরী সমাজবিপ্লব আনবে।

রত্নর হাসিও পায়, ব্যথাও লাগে গোরীর কল্পনার দৌড় দেখে। বেচারি গোরী! যার ঘর থেকে আঙিনা বিদেশ সে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে বেড়াবে। বেচারা রত্ন! তাকে রত্নসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। একটু শক্ত বই-কি। আর ওই যে শিবলিঙ্গের পূজারী হওয়া ওটাও তার মতো কালা-পাহাড়ের পক্ষে বিসদৃশ। গোরী কি ভুলে গেল যে রত্ন একজন প্রতিমা-ভঙ্গকারী? সবপ্রকার প্রতিমাভঙ্গই তার জীবনব্রত। কিন্তু কেবল ভাঙার কাজেই তার জীবন নিঃশেষিত হবে না। সে গড়তে চায় বলেই ভাঙতে চায়। গড়বে সৌন্দর্যলোক। প্রতি দিন সে তার ধ্যান করছে। ধ্যান এখনো রূপ নেয়নি। কবে নেবে তাও তার অজানা। অত সহজ নয় গড়া। কেই বা বুঝবে তার বেদনা!

যে যাকে ভালোবাসে সে তার ভালো করতে চায়। যাতে গোরীর ভালো হয় তাই করতে হবে রত্নকে। সে বার বার চিন্তা করে দেখে শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো প্রোপ্রাইটরের চিত্তপরিবর্তন। যাতে তিনি প্রোপ্রাইটরশিপ ত্যাগ করেন। তাঁর চিত্তপরিবর্তন হলে তিনি ওকে স্বেচ্ছায় নিষ্কৃতি দেবেন। ওর স্বাধীনতার অন্তরায় হবেন না। কিন্তু এ পরিবর্তন সাধন করবে কে? গোরী স্বয়ং, না আর কেউ? এর জন্যে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা চিত্তশুদ্ধি। অত্যাচারীর প্রতি অবৈর। গোরী যে ঘৃণায় জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছে।

রত্ন ওকে বোঝাতে যত্নবান হয় মানুষ যদিও শ্বাপদের মতো হিংস্র হতে পারে তবু তার পক্ষে হিংসা বর্জন করাও স্বাভাবিক। সে যেমন নেমে যেতে পারে তেমনি ঊর্ধ্বে উঠতেও পারে। ওঠানামা সমস্তক্ষণ চলছে। মানুষ সম্বন্ধে শেষ কথা কেউ বলতে পারে না। রত্নাকরও বাল্মীকি হয়ে ওঠে। সুতরাং অন্তঃপরিবর্তন এমন কিছু অসাধ্য নয়। আত্মসমর্পণ না করেও অন্তঃপরিবর্তন সাধন করা যায়। রত্ন লেখে—

জ্যোৎস্না-গোরী, তোমার মুক্তির প্রশ্ন রত্নসিংহের কল্পনায় উত্তর খুঁজছে। কিন্তু যাকে তুমি ভালোবেসেছ সে রত্নসিংহ নয়। হবেও না

কোনো দিন। তার মধ্যে যদি সত্যিকার বীরত্ব থাকে তবে তা রক্তসিংহের ধারা না ধরে অন্য কোনো ধারায় আত্মপ্রকাশ করবে। বীরত্বের কি একটিমাত্র ধারা! সে যে শতধার। মুক্ত স্বাধীন মানবাত্মা কি বীরত্বের উৎসমুখ নয়? সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কি কেউ চিরদিন মুক্ত স্বাধীন মানবাত্মা হতে পারে?

গোরী, আমিও সংগ্রামশীল। আমি হব সব স্বাধীন মানবের মধ্যে স্বাধীনতম মানব। সেই সঙ্গে সব প্রেমিক মানবের মধ্যে প্রেমিকসত্তম। 'মানব' বলেছি। 'পুরুষ'ও বলব। যে পুরুষ মধুর রসের উপাসক। আমি মধুরের মাধুর্যের আস্বাদন পাব। আপন মাধুর্যের আস্বাদন দেব। মধুর যিনি তিনি নারী রূপে এসেছেন। গোরী রূপে। গোরী, তুমি হবে স্বাধীনা নারী। ইতিহাসে স্বাধীনা নারীর নজীর বেশী নেই। স্বাধীনা প্রেমিকা তো ইতিহাসে অপূর্ব। এত দিন আমি তার ধ্যান করে এসেছি। ধ্যান আমার মূর্তি নেয়নি। এইবার নেবে। তুমি হবে সেই মূর্তি। প্রেমবতী স্বাধীনা নায়িকা।

একসঙ্গে আমরা থাকব না। দুজনের দুই স্বতন্ত্র কক্ষ। যেমন পৃথিবীর আর সূর্যের। মাঝে মাঝে আমরা মিলিত হব। যেমন চুম্বক আর লোহা। পরস্পরকে আকর্ষণ করা সর্বক্ষণ চলবে। কিন্তু মিলনকে সুলভ বা সুদীর্ঘ করা চলবে না। যেই মনে হবে আমরা পুরোনো হয়ে যাচ্ছি অমনি বিরহের ঋতু আসবে। কোনো মতেই আমরা বাসি হতে দেব না আমাদের ভালোবাসার মালাকে। শুকিয়ে যেতে দেব না। সেইজন্যে দূরে দূরে থাকব। সরে সরে যাব। যখন মিলব তখনো প্রাণভরে মিলব না। অতৃপ্ত রেখে দেব পরের বারের জন্যে। অপূর্ণতার জ্বালা নিববে না। নিবলে তো সব ফুরিয়ে গেল।

দিনে দিনে আমরা বিকশিত হতে থাকব। আমাদের সব কিছু রূপান্তরিত হতে থাকবে। একটা বিকাশের ভাব, রূপান্তরের ভাব, তোমার মধ্যে পাব আমি, আমার মধ্যে পাবে তুমি। একটা অদৃশ্য প্রভাব পড়বে তোমার উপর আমার, আমার উপর তোমার। শেষপর্যন্ত তুমি তুমিই

থাকবে, আমি আমিই থাকব, কিন্তু তুমি হয়ে যাবে রত্নশ্রীমতী আর আমি হয়ে যাব শ্রীমতীরত্ন। হয়ে যাব কেন বলছি? হয়ে রয়েছি। আরো হব। তুমি আমি। আমি তুমি।

কিন্তু, জ্যোৎস্না-গোরী, আমার মনে ছোট একটি অভিমান আছে। তুমি কি আমাকে ভালোবাস, না তোমার কল্পনার রত্নসিংহকে? যে আমি নয় তাকে? শেষকালে এই থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়। পড়েছ তো, অর্জুন যাকে ভালোবেসেছিল সে প্রকৃত চিত্রাঙ্গদা নয়, সে চিত্রাঙ্গদার চিত্রপ্রতিমা। সে চিত্রাঙ্গদার সাময়িক ছদ্মবেশিনী। তাই বছর ঘুরতে না ঘুরতে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। চিরকালের মতো। প্রকৃতি তোমাকে রূপবতী করেছে। তোমাকে চিত্রাঙ্গদার অনুসরণ করতে হবে না। কিন্তু আমি যদি রত্নসিংহ সাজি তা হলে আমিই হব চিত্রাঙ্গদার অনুসারক। বর্ষসুখের বিনিময়ে চিরকালের মতো প্রিয়সঙ্গ হারাব। না, আমি কখনো চিত্রাঙ্গদার মতো ধার করা রূপ ধারণ করব না।

যে রূপ আমার আপনার তা হয়তো সুরূপ নয়, তবু তাই নিয়ে আমি তোমার সুমুখে দাঁড়াব। তোমার হয়তো মনে ধরবে না। তুমি ভাববে, এই কি আমার স্বপ্নের রাজপুত্র! নয়, নয়। স্বপ্নের সঙ্গে মিলছে না বলে নিরাশ হবে। যদিও মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে তুমি দুঃখিত। পাছে আমার মনে দুঃখ হয়। যা অনুক্ত থাকবে তাই একদিন অনর্থ ঘটাবে। রত্নসিংহ যার কামনা রত্নকান্ত তার কামনাপূরণ নয়। কোনো দিন কি হবে!

গোরী এর উত্তরে লিখল, "এমন পাগল* ছেলে আমি দেখিনি। তুমি রত্নসিংহ নও বলে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হযে যাবে এ কথা ভাবতে পারলে তুমি! ওগো তুমি কি আমাকে আজো চিনলে না! চিনলে না তোমার প্রেমাধীনা প্রেমভিখারিণীকে! দেখছি তুমি রত্নসিংহকে হিংসা কর। ও যেন তোমার সতীন। ভালো রে ভালো! এখন থেকেই এত অভিমান! তোমাকে যে আমি এক শো নামে ডাকি, এক শো রূপে ধ্যান করি এর মানে কি তোমার এক শো সতীন! ওগো তোমার কানে কানে নিলাজের মতো স্বীকার করছি

যে রত্নকান্তই আমার কামনা। আর কেউ আমার কামনাপূরণ নয়। তোমার রূপ নেই, বললেই বিশ্বাস করব! তোমার রূপ আছে গো আছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে। ওখানে ওরা তোমাকে খেতে না দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে বলে তোমার অমন ছিরি হয়েছে। ওটা সাময়িক। ওটাও এক রকম ছদ্মরূপ।”

গোরীর চিঠিতে আরো অনেক কথা ছিল। রত্ন পড়তে লাগল—

না, অলকা দেবীর মতো আমি এক অন্তঃপুর থেকে আরেক অন্তঃপুরে যাব না। ওঁরা বিগত যুগের নায়কনায়িকা। আমরা আগত যুগের। তোমার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনা বেশ খাপ খায়। আমি একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেলে সহজে বাঁধা পড়ছিনে। তুমি বরাবরই স্বাধীন। তাই বাঁধা পড়তে ভয় পাও। আর আমি বরাবরই বাঁধা। তাই একবার ছাড়া পেলে আর বাঁধা পড়ার কাছ দিয়েও যাচ্ছিনে। তোমার যা ইচ্ছা আমারও সেই ইচ্ছা। আমরা যে যার স্বতন্ত্র পথে চলব। আর মাঝে মাঝে মিলব। হঠাৎ একদিন আমি গিয়ে তোমার ওখানে হাজির হব। রাতটা থাকব। তার পর সাত আট মাস দেখা নেই। তেমনি তুমিও বিনা খবরে আমার আস্তানায় এসে উপস্থিত হবে। দু'তিন দিন থাকবে। তোমাকে আমি পুলিশের নেকনজর থেকে বাঁচাব। কোথাও এক জায়গায় লুকিয়ে রাখব। হয়তো সত্যি সত্যি মাটির নিচে।

আন্দাজ করতে পেরেছ নিশ্চয় যে আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্যেই আমার নিজের স্বাধীনতা নিয়োগ করব। দেশ স্বাধীন না হলে আমি কেশ বাঁধব না। পাঞ্চালীর মতো আমার মুক্ত বেণী। বেণীসংহার হবে না যতদিন ভারত স্বাধীন না হয়। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম চলবে আর আমি তাতে অংশ নেব না, এ কি কখনো সম্ভব! আমাকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম চলবে আব আমি শুধু সাক্ষীগোপালেব মতো দেখব, এ কি কখনো হতে পাবে! ইতিহাস রচিত হবে আর আমার নাম থাকবে না, এ কি কখনো সইতে পারি! মনে মনে চেয়েছিলুম যে তুমিও আমার সঙ্গে ঝাঁপ দাও, পাশাপাশি সাঁতার কাট, একসঙ্গে জল থেকে ওঠ, হাতে হাত রাখ, কিন্তু

রত্ন ও শ্রীমতী

স্বদেশের সংগ্রামে তোমার রুচি নেই দেখে তোমাকে আমি ইতিহাসের ভূমিকা থেকে অব্যাহতি দিলুম। তুমি স্বতন্ত্র সৈনিক। তুমি আমার একার সৈনিক। আমার প্রাইভেট।

আমার জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে তোমার আবির্ভাব। প্রথমটা মনে হয়েছিল আকস্মিক। এত দিনে প্রতীতি হয়েছে, তা নয়। তুমি যদি না আসতে আমি কোন অতলে তলিয়ে যেতুম। কুমীরে আমার পা ধরে টানতে টানতে আমাকে গহীন জলে নামাত। তুমি আমার হাত ধরে আমাকে ডাঙার উপর টেনে রাখছ। কুমীরের টান প্রতিহত করছে তোমার টান। তাই তো আমি এখনো ডুবিনি। বাবলু, তোমার জন্যেই এখনো আমি মাথা তুলে রয়েছি। আমার মাথার উপরে এখনো ভগবানের আকাশ। আমার হাত ছেড়ে দিয়ো না, বাবুল। চেপে ধর। জোরে চেপে ধর। আরো জোরে চেপে ধর। হাঁ, তোমার গায়ে জোর আছে। সে জোর তোমার প্রেমের জোর। ওগো, তুমি না থাকলে আমার অবতরণ হতো। তুমি আছো বলেই উত্তরণ। তুমি এত ভালো। তুমি কী করে জানবে জগতে কত মন্দ আছে! আমিও কি জানতুম! ওঃ! এই পাঁচ বছরে আমি কী না দেখলুম! আমি যে দেখতে দেখতে বুড়ী হয়ে গেলুম! কুড়িতে বুড়ী! আমার বন্ধুরা আমাকে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তাই তো এখনো বেঁচে আছি। নইলে কবে আত্মঘাতী হয়ে পুড়ে জুড়িয়ে যেতুম। তা হলেই এ জ্বালা জুড়োত।

কোথায় কোন বেগমপুরে বসে চিঠি লিখছে গোরী। তার জ্বালার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে তিন শো মাইল দূরে থেকেও। প্রেমের জল পড়ে আগুনের তেজ না হয় কমেছে, কিন্তু ইন্ধন তো অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে সমানে। আর সেই অঙ্গার থেকে ঝাঁজ উঠছে। জল তত দূরে পৌঁছয় না। আর প্রেম কি কেবলি জল! প্রেম যে আগুনও। আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায় কি? গোরীর চিঠিতে তার কোনো লক্ষণ নেই। সে জ্বলছে। সমানে জ্বলছে।

রত্ন পড়তে লাগল। গোরী আরো লিখেছে—

এটা তো জ্বলন্ত সত্য যে ইংরেজ আমাদের বুকে হাঁটিয়েছে। দেশসুদ্ধ মানুষের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। সে মাথা যত বড় মাথা হোক না কেন মানুষের মাথা নয়। পোষা কুকুরের মাথা। পরাধীনতা মানুষকে চরিত্রভ্রষ্ট করে। তাকে দেয় কুকুরের স্বভাব। দেশসুদ্ধ লোক যেমন নীচ স্বার্থপর কুঁদুলে খোসামুদে ভন্ড হয়ে গেছে ইংরেজের শাসনে, তেমনি অন্তঃপুরের নারীও হয়েছে পুরুষের শাসনে। স্বামী নামক ইংরেজটিকে সুখী করা ভিন্ন নারী জীবনের আর কোনো সার্থকতা নেই। অবিকল পোষা কুকুরের মনোবৃত্তি। একটি পোষা কুকুরের জায়গায় দুটি হলে প্রভুকে কে কত বেশী সুখী করবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা বেধে যায়। সে-ই তত বেশী সফল যে যত বেশী নীচ। সুধা ঠিক পোষা কুকুর নয়, সেইজন্যে আমি তার প্রতিযোগী নই। কিন্তু আর একটি বৌ এলে আমাকেও ধাপে ধাপে নেমে যেতে হবে। যে কোনো দিন এরা এদের ছেলের আবার বিয়ে দেবে। তার আগে আমার যেন মরণ হয়।

বাবু, তোমার উপরেও আমার একটা অভিমান আছে। বড় একটা অভিমান। রাখীবন্ধ ভাইবোন যখন ছিলুম তখন ছিলুম। এখন তো তা নই। না তোমার মতে এখনো আমরা তাই? জানিনে তোমার মনে কী আছে। কই, তোমার চিঠিতে একটি বারও তো আদরের ডাক ডাকনি। শেষে একবার গোরী বলে ডেকেছ। ঠিক যেমন রাখীবন্ধ ভাইয়ের ডাক। কেন ডাকলে না রত্নগোরী বলে? তোমার নাম কি আমার অঙ্গে অদৃশ্য অক্ষরে ছাপা হয়ে যায়নি? লোকে কী মনে করবে, সেই ভয়ে উঁকি ফোটাইনি। যদি কোনো দিন মুক্তি পাই—বেঁচে থাকতে পাব বলে তো মনে হয় না—আমার প্রথম কাজ হবে তোমার নাম আমার অঙ্গে ফোটানো। তখন আর তুমি আমাকে তোমার কান্তা বলে অস্বীকার করতে পারবে না। মণি, আর আমাকে জ্বালিয়ো না। আমি এমনিতেই জ্বলছি। জ্বলছি তোমার জন্যেও। জ্বলছি যৌবনজ্বালায়। তুমি ছাড়া আমার আপন বলতে আর কে আছে, ধন!

রত্নর মন কেমন করে। এই যে মেয়েটি একে সে চক্ষেও দেখেনি। এও দেখেনি তাকে। কিন্তু অদেখা বলে তো কেউ কারো অনাত্মীয় নয়। সন্তান যখন গর্ভে থাকে তখন সে ও তার জননী পরস্পরের অদেখা। তবু তারা নিকটতম আত্মীয়। চোখের দেখা না দেখায় কিছু আসে যায় না, যদি সম্বন্ধটা পাকা হয়।

রত্নর মনের কোণে একজোড়া জিজ্ঞাসা ছিল। গোরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা গোরীর নির্বন্ধ অনুসারে কী প্রকার সম্বন্ধ? গোরীর সঙ্গে তার জীবনের প্যাটার্নটা গোরীর সিদ্ধান্ত অনুসারে কেমনতর প্যাটার্ন?

এই চিঠিতে সে তার দুই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। তারা কান্ত কান্তা। তাদের সম্বন্ধ কান্তকান্তা সম্বন্ধ। আর তারা যে যার জীবন নিজের মতো করে বাঁচবে, কেবল মাঝে মাঝে মিলিত হবে। সে মিলন কান্তকান্তা মিলন।

এটা স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ নয়। এ জীবন দাম্পত্য জীবন নয়। বিবাহ করলেও তারা স্বামীস্ত্রী হবে না। তাদের জীবন দাম্পত্য জীবন হবে না। বিবাহ না করলেও তারা কান্ত কান্তা থাকবে। তাদের জীবন কান্তকান্তার মিলনে বিরহে মধুররসাত্মক হবে। বিরহেও মধু আছে। মিলনে তো আছেই। দীর্ঘ বিরহের পর ক্ষণিক মিলন, তার পর আবার দীর্ঘ বিরহ। প্রিয়া হয়তো জেলে কিংবা আন্দামানে যাবে। কিংবা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আজ এখানে কাল ওখানে লুকিয়ে বেড়াবে।

গোরীর নাম অঙ্গে ধারণের সাধ রত্নরও হলো। পুরুষমানুষেও উলকি ফোটায়, বিশেষত যারা সৈনিক। কিন্তু সাধ থাকলে হবে কী, সাহস ছিল না। কে কী মনে করবে! তবে একটি কাজ সে লজ্জার মাথা খেয়ে করল। তার ধুতি চাদর পাঞ্জাবী পায়জামা গেঞ্জি রুমাল প্রভৃতির কোণায় সে গোরীর নাম চেন্না করে রাখল। এমন ভাবে, যাতে কারো নজরে না পড়ে।

ইতিমধ্যে আর কোনো ফোটো আসেনি। চিঠিও তো এক হিসাবে ফোটো। সে ফোটো সকলের চোখে ফোটে না। যে ভালোবেসেছে তার দৃষ্টি খুলে গেছে। সে-ই প্রত্যক্ষ করে। গোরী দিন দিন ক্ষীণ হচ্ছে। বিরহে। আভাময় হচ্ছে। বিরহদহনে। কিন্তু তার জ্বলন তো শুধু বিরহ থেকে নয়। নিত্যবর্তমান

অপ্রিয় সংসর্গ থেকেও। রঙ্গর বাহুতে এত বল নেই যে সে বাহুবলে তার কান্তাকে উদ্ধার করবে।

রঙ্গও দিন দিন ক্ষীণ হয়। ক্ষীণ তো সে বরাবর ছিলই। হলো ক্ষীণতর। ক্ষীণতর, কিন্তু উজ্জ্বলতর। দীপ উজ্জ্বলতর হয় তৈলদানে। মুখ উজ্জ্বলতর হয় রসাস্বাদনে। সে ভোলে না, তাকে ভুলতে দেওয়া হয় না যে সে গোরীরঙ্গ, গোরীকান্ত।

"মিষ্টি," রঙ্গ লিখল তার কান্তাকে, "তুমি আমাকে বাঁচালে। আমার মনে মহা ভাবনা ছিল। প্রেমের জন্যে কি আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে! দিলে যদি তুমি সুখী হও তবে দিতে রাজী আছি এখনো। কিন্তু সে দান অন্তর থেকে নয়, আনন্দের সঙ্গে নয়। তুমিও কি চাইবে প্রেমের জন্যে স্বাধীনতা দিতে? দিলে কি আমি সুখী হব? না, মিষ্টি, আমি তোমার স্বাধীনতা নিয়ে সুখী হব না। আমাদের আদর্শ হবে প্রেমের সঙ্গে স্বাধীনতার সামঞ্জস্য। সব চেয়ে বড় প্রেমের সঙ্গে সব চেয়ে বেশী স্বাধীনতার। সেটা শুধু সম্ভব কান্তকান্তা সম্বন্ধ পাতালে। তুমি এই সম্বন্ধ স্বয়ং বরণ করেছ। এটা তোমার নিজের নির্বন্ধ। এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।"

এর পরে সে আরো অন্তরঙ্গ স্বরে লিখল—"আমাদের এই সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য কোনখানে, জান তো? আমাদের বিয়েতে যদি কোনো বাধা থাকে তবে সেটা নৈতিক বাধা নয়, সামাজিক বাধা। সে বাধা একদিন দূর হতে পারে। তখন আমরা বিয়ে করতে পারি। কিন্তু বিয়ে করলেও আমরা স্বামীস্ত্রী হব না। কান্তকান্তাই থেকে যাব। কারণ এতেই সব চেয়ে বেশী স্বাধীনতা আর সব চেয়ে বড় প্রেম। ওতে নয়। আর যদি বিয়ে না হয় আমাদের তবে শেখরবাবু ও অলকা দেবীব মতো একসঙ্গে থাকব না আমরা। যে যাব আপন কর্মক্ষেত্রে থাকব। মাঝে মাঝে মিলিত হব। যেমন চুম্বক আর লোহা। কিন্তু সেই প্রচণ্ড আকর্ষণ দৈনন্দিন হলে তার তীব্রতা হারাবে। তাই বিরহের ব্যবধান সুদীর্ঘ হবে।"

তার পর আরো ভেবে যোগ কবল,—"মিণ্টু, তুমি হয়তো অভিমান করলে। কিন্তু জীবনে যদি কিছু করে যেতে চাও তবে এই হবে জীবনের প্যাটার্ন। তোমার সঙ্গে আমারও। ব্যবধান তো বাইরে। ভিতরে আমরা এক হয়ে রয়েছি,

দুই হয়ে যাব না। রত্ন কি রত্ন! সে গোরীরত্ন। গোরী কি গোরী! সে রত্নগোরী। আমি অর্ধনারীশ্বর। তুমিও তাই। আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমার সঙ্গে এক হয়েই থাকব। আর তুমি যেখানেই থাক না কেন আমার সঙ্গে এক হয়েই থাকবে। এক মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছেদ বোধ করব না আমি, করবে না তুমি। আমরা যা করব তা স্বতন্ত্র ভাবে করলেও তার মধ্যে থাকবে এক অদৃশ্য সামঞ্জস্য। সেটা যেন একই মানুষ করছে দুই নামে, দুই রূপে, দুই অবস্থায়। তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দায়িত্ববোধ থাকবে তোমার কাছে আমার, আমার কাছে তোমার। আমরা যেমন পরস্পরের কাছে দায়ী তেমনি পরস্পরের জন্যে দায়ী। ঈশ্বরের কাছে।"

শেষে লিখল, "লক্ষ্মীটি, আত্মঘাতী হবার কথা কখনো মনে উদয় হতে দিয়ো না। তুমি তো আর বিচ্ছিন্ন নও। তুমি আপনাকে হত্যা করলে আমাকেও হত্যা করবে। তুমি কি প্রিয়ঘাতিনী হবে ? ধৈর্য ধর। তোমার মুক্তি অনিবার্য। আকাশের বিদ্যুৎকে কি কেউ ঘরে ধরে রাখতে পারে!"

পাঁচ

রত্ন যাই বলুক না কেন এই কয় মাসে তার জীবনে একটা কেন্দ্রান্তর ঘটে গেছে। কেন্দ্র যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে গেছে। স্বাধীনতা ছিল তার জীবনের কেন্দ্র। এখন আর স্বাধীনতা নয়, প্রেমই হয়েছে কেন্দ্র। তা বলে সে স্বাধীনতা সমর্পণ করেনি। সে স্বাধীন পুরুষ। কিন্তু তার চেয়ে আরো সত্য সে প্রেমিক পুরুষ। এ প্রেম তাকে নতুন না করে ছাড়বে না। তাকে তো নতুন করবেই, তার চার দিকের জগৎকেও নতুন করবে। সে একটু ফাঁক পেলেই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে নতুন জগতের। যে জগতে প্রেমের রাজত্ব। মানুষমাত্রেই প্রেমিক। মানবপ্রেমিক। মানুষে মানুষে স্বন্দ্ববিরোধ নেই। যা ছিল তা প্রেমের মোহন স্পর্শে সুমীমাংসিত হয়েছে। তাই দ্বন্দ্ব বাধে না। চির শান্তি।

সেই নতুন জগতে মানুষমাত্রেই কাজ করে খেলার মতো আনন্দে। কাজটাই আনন্দময়। খাটুনির অন্ত নেই, তবু কেউ ছুটি চায় না। যেমন কেউ ছুটি

চায় না খেলা থেকে। সব কাজই ভালোবাসার কাজ। সে ভালোবাসা কাজের প্রতি। আবার যার জন্যে কাজ তারও প্রতি। প্রিয়জনের প্রতি। প্রিয় দেশের প্রতি। প্রিয় সমাজের প্রতি। প্রিয় জনতার প্রতি। প্রিয় বিশ্বের প্রতি। প্রিয় বিশ্ববিধাতার প্রতি। কাজ করতে ভালো লাগে এমনি। আবার যার জন্যে কাজ তার জন্যে কাজ করতেও ভালো লাগে। কিন্তু তাকে কাজ বলে পরিচিত করা কেন? তা সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্টির মতো মানুষের সৃষ্টি। সৃষ্টি করার ক্ষমতা ঈশ্বরেরই। মানুষ তা বহু ভাগ্যে পায়। এর জন্যে কেউ তার উপর চাপ দেয় না। তার সৃষ্টিপ্রেরণা আপনার ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে। উপর-ওয়ালার হুকুম বলে কিছু নেই। উপরওয়ালাই নেই। আছে ভিতরওয়ালা।

মানুষের জীবন এত কাল যে ভাবে চলে এসেছে তাতে প্রেমের অংশ অতি সামান্য। মানুষ বেঁচে এসেছে প্রাণের দায়ে। প্রেমের উল্লাসে নয়। ভবিষ্যতের শত সহস্র বর্ষ অতীতের অনুবর্তন হবে না। মানুষ বাঁচবে প্রেমের আনন্দে। তার জীবনযাত্রা রূপান্তরিত হবে প্রেমের জাদুদণ্ডে। দণ্ডভয় উঠে যাবে। কেউ কাউকে দণ্ড দেবে না। রাষ্ট্রও না। সমাজও না। গুরুজনও না। সব অপরাধের সংশোধন হবে স্নেহপ্রীতি দিয়ে। ক্ষমা দিয়ে। শিক্ষা দিয়ে। শাসন ও শোষণ উঠে যাবে। সকলে মিলে হবে একটি সুখী পরিবার। পরস্পরের সুখে সুখী। আত্মসুখে সুখী নয়। যেখানে পর সুখী নয় সেখানে আত্মা সুখী হবে কী করে?

যৌবন হচ্ছে স্বপ্নদর্শনের ঋতু। মহান কোনো স্বপ্ন। নবীন কোনো স্বপ্ন। রত্নর যৌবনস্বপ্ন নবীন নয় হয়তো। কিন্তু মহান। প্রেম আর স্বাধীনতা দুই তার কাম্য। কেবল তার একার নয়, সর্বমানবের। কেবল গৌরীর নয়, সর্বমানবীর। অতীতে যা ছিল অসাধারণদের ভবিষ্যতে তাই হবে সাধারণের। চাই অন্ন, চাই লক্ষ্মী, এ কথা এ যুগে সকলের মুখে। চাই প্রেম, চাই স্বাধীনতা, এ কথাও ফুটবে সকলের মুখে। বিশেষ করে মেয়েদের মুখে। যারা অবোলা। যারা চিরবঞ্চিতা।

আজকের এই গৌরী যেন বসন্তের একটিমাত্র কোকিল। একটি কোকিলকে দিয়ে বসন্ত হয় না। দিকে দিকে দেখা দেবে লক্ষ লক্ষ গৌরী। আকাশ ছেয়ে

যাবে তাদের নীড়ছাড়া ডানায়। বাতাস মুখর হবে তাদের কুহরনে। তারা হবে স্বাধীনা নায়িকা। তারা হবে পরম প্রেমিকা। তারা যখন সমাজের ভার নেবে তখন সমাজের আবর্তন ঘটবে। সেসব নারীর সঙ্গে নৃত্যের তাল রাখতে পারা কি এসব পুরুষের সাধ্য! তাই এদের স্থান নেবে লক্ষ লক্ষ রত্ন। যারা স্বাধীন নায়ক তথা পরম প্রেমিক। সেই সব গোরীদের রত্নদের নিয়ে কালকের বসন্ত।

আজকের বসন্তের দিনমান স্বপ্ন দিয়ে ভরা। দুপুর বেলা গাছতলায় বই সামনে খোলা রেখে গা এলিয়ে দেয় রত্ন। তার অদূরে অঞ্জন। তারও সেই ধারা। কিন্তু প্রেম থেকে নয়। সে যেন কোন সৌন্দর্যের হাতছানি দেখেছে। উড়ে যাওয়া সৌন্দর্যের। নিজে উড়তে পারছে না। চোখ দুটি উড়ে যেতে চায়। নীল পরীর পিছনে।

রত্ন ওকে ভালোবাসত ছোট ভাইটির মতো। বয়সে যত ছোট তার চেয়েও ছোট দেখায় ওকে। কিন্তু ছোটর মতো ব্যবহার পেতে ওর ঘোর আপত্তি। ও চায় সমান হতে। দাদা বলে ডাকবে না। কথায় কথায় শ্লেষ। শ্লেষ, কিন্তু হুল নেই তাতে।

একদিন অঞ্জন এসে তার পাশে আসন পেতেছিল। রত্ন লক্ষ করেনি। পরে আবিষ্কার করল। বলল, "কে? অঞ্জন? কখন এলে?"

"অনেক ক্ষণ।"

"দেখতে পাইনি তো?"

"দেখবার মতো হলে দেখতে। আজকাল কাকেই বা তুমি দেখ!"

কথাটা সত্যি। গোরী ভিন্ন আর কাকেই বা সে দেখে! দেখলেও ভাসা ভাসা ভাবে দেখে। অঞ্জনের মতো যারা স্পর্শকাতর তারা মনে আঘাত পায়। ভাবে রত্নর ওটা উন্নাসিকতা। কিন্তু বিদায় বেলা যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই আবেগ উথলে উঠছিল। কে জানে কবে আবার দেখা হবে! যদি আদৌ হয়।

"পরীক্ষার পর কোথায় যাচ্ছ?" জানতে চাইল অঞ্জন।

"সাত ভাই চম্পা যেখানে বৈঠক করবে। এই বোধ হয় শেষ বৈঠক।"

"ওঃ! তোমার সেই সাত ভাই চম্পা! আমরা জানি তোমার মনের পক্ষপাতটা ওদেরি উপর। আমাদের উপর নয়। সেইজন্যেই তো এত অভিমান করি।"

দ্বিতীয় ভাগ

"দূর পাগলা! আমিও তোমাদেরি মতো সৌন্দর্যবাদী। তবে তোমার মতো গন্ধর্ব নই। এই পৃথিবীর মতো আমিও বাইরে শ্যামল ভিতরে রাঙা। সে আগুন কেউ দেখতে পায় না। আমিও দেখাতে যাইনে। যক্ষের ধনের মতো রক্ষা করি।"

যে আগুনের কথা বলা হলো সে যে কিসের আগুন রত্ন তা খুলে বলল না। বলতে চাইলেও পারত না। জানা থাকলে তো বলবে। কখনো মনে হয় তা প্রেমের আগুন, কখনো অভিনব সৃষ্টির। কখনো বা ধ্বংসের। বিদ্রোহের। বিপ্লবের।

নানা কথার পর অঞ্জন সুধাল, "বৈশাখ মাসে কোথায় থাকবে?"

"খুব সম্ভব পদ্মার চরে।"

"পদ্মার চর তো এই গঙ্গার চরেরই মতো হবে। সেখানে জনমানব থাকলে তো?"

"আমি যে চরের কথা ভাবছি সেখানে হাজার হাজার গোরু চরে। মাসের পর মাস থাকে। তাদের সঙ্গে তাদের রাখাল। ছোট ছোট কুঁড়েঘরে। তারই একখানা কুঁড়ে যদি আমাকে ছেড়ে দেয় আমি আর কিছু চাইনে। ওরা যা খায় আমিও তাই খাব। সকালে পান্তা বিকেলে ভাত। রাত্রে চিড়ে মুড়ি। আর দিনান্তে এক বাটি দুধ।"

ঐ খাদ্য অঞ্জনের পক্ষে উপাদেয় নয়। সে বড়লোকের ছেলে। অন্য ভাবে মানুষ হয়েছে। মেসে খেতে বসে অর্ধেক ভাত ছিটায়, সিকিভাগ ফেলে রাখে। তার ঘরে রোজ হালুইকর আসে। মিষ্টান্নর বাক্স মাথায়। তার জন্যে খোঁড়া লালজী বাইরে থেকে চপ কাটলেট বয়ে আনে। আর বাবাজীও তার জন্যে বিশেষ পদ রাঁধে।

"ভাই অঞ্জন," রত্ন বলল তার ছোট ভাইটিকে, "মানুষের জীবনে এমন কোনো অন্বিষ্ট থাকবে যার জন্যে সে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাবে। বরং সেইটেই হবে তার ক্ষুধা আর তৃষ্ণা। তারই জন্যে সে ক্ষুধিত ও তৃষিত হয়ে দিন কাটাবে। তা হলে ভেবে দেখা যাক তোমার আমার অন্বিষ্ট কী। কিসের জন্যে আমরা সারাক্ষণ ক্ষুধিত ও তৃষিত।"

রত্ন ও শ্রীমতী

"সৌন্দর্য। যে সৌন্দর্য প্রকৃতির ঘরে ফেলাছড়া যাচ্ছে। মানুষের ঘরে অকুলান। কতক লোককে তাই সৌন্দর্য নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। এইপর্যন্ত বেশ বুঝতে পারি। এর পরেই মাথা ধরা। সৌন্দর্য নিয়ে যারা পড়ে থাকবে তাদের পেট ভরবে কী দিয়ে? কেবল রুটি খেয়ে মানুষ বাঁচে না। কিন্তু রুটিও তো চাই। বাবা চিরদিন থাকবেন না।"

এ ভাবনা রত্নরও যে না ছিল তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যয় ছিল প্রথমটা আগে ঠিক হয়ে গেলে দ্বিতীয়টা পরে ঠিক হয়ে যাবে। জীবন আগে। জীবিকা পরে। তোমার জীবন নিয়ে তুমি কী করতে চাও তা স্থির কর তো আগে। তখন জীবিকা আপনি আপনার তত্ত্ব নেবে।

"না। বাবা চিরদিন থাকবেন না। তুমিও চিরদিন থাকবে না। কী চিরদিন থাকবে তা এই বয়সেই জেনে নিতে হবে। উপনিষদের যুগে আমাদের বয়সী ছেলেরাই গুরুগৃহে যেত এই জিজ্ঞাসা নিয়ে। আমরা কি শুধু পড়াশুনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি? আমরা কি আমাদের জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর পেতে আসিনি? ভাই অঞ্জন, বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই মনে হানা দিচ্ছে এখান থেকে আমরা কী উত্তর নিয়ে যাচ্ছি।"

"ওঃ! তুমি বুঝি আজকাল এইসব ভাব! তাই তোমাকে এমন ভাবুকের মতো দেখায়!" পরিহাস করল অঞ্জন।

রত্নর ভাবনার বারো আনা জুড়েছিল গৌরী। সে কথা কি ছোট ভাইকে বলা যায়! কতই বা তার বয়স! কতটুকু বোধগম্য হবে তার!

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "কী খাব, কী পরব, কোথায় শোব, এসব গণনা আমাদের জন্যে নয়। যেদিন যা জুটবে সেদিন তাই খাব। না জুটলে উপোস দেব। সিদ্ধার্থ কি জানতেন যে সুজাতা বলে একজন কেউ আছে যে দিনে এক বাটি পায়েস এনে দেবে সেই গভীর অরণ্যে বোধিদ্রুম তলে? তাও একদিন নয়, দু'দিন নয়, পাঁচ বছর কাল। ওসব গণনা ভাগ্যের উপর বা ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। লেগে থাকতে হয় সত্য বা সৌন্দর্য নিয়ে। যা চিরদিন থাকবে।"

দ্বিতীয় ভাগ

অঞ্জন ফুর্তি করে বলল, "ঠিক জান চিরদিন থাকবে? কী করে জানলে? তুমি তো চিরজীবী নও। আমি নিজে চিরদিন থাকব না, তাই বলতে পারব না কী চিরদিন থাকবে।" বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে বলল, "সৌন্দর্য চিরদিন থাকে না বলেই তার পিছনে পাগলের মতো ছোটা। চিরদিন থাকবে জানলে কি এই দুপুরে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বসি?"

তার পর কাতর স্বরে বলল, "চিরদিন কী থাকবে? কিছুই থাকবে না। ফুল শুকিয়ে যাবে। মুকুল ঝরে যাবে। মেঘ মিলিয়ে যাবে। মলয় পালিয়ে যাবে। কোকিলের ডাক কর্কশ হয়ে যাবে। আমরাও কি থাকব? বৃথা চিন্তা।"

রত্ন বলল, "কবি ইয়েটসের সেই লাইন দুটি মনে আছে তো?

'In all foolish things that live a day
Eternal beauty wandering on her way.'

এই যে ছায়াছবি এ যেন সুন্দরী নারী পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে অন্য কোনোখানে। এখানে যা ফুরোল অন্য কোনোখানে তা শুরু হলো। সারা বিশ্বের কোথাও না কোথাও আজকের এই দিনটি তার সমস্ত শোভা নিয়ে নিত্য বর্তমান থাকবে। এই যে বসন্ত এ যাবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। সারা বছর ভরে সারা জগৎ ঘুরবে। সুন্দরীর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারলে আমরাও চির সৌন্দর্যের সহচারী।"

আসলে কলেজটা একটা ভাঙা হাটের মতো লাগছিল।

পরীক্ষা সারা হতে না হতে যে যার বাড়ী চলে যাবে, বিদায় নেবার জন্যে একটা দিনও সবুর করবে না। সতীর্থরা এখন থেকেই কোনো মতে সময় করে বিদায় পর্ব সমাপন করে রাখছে। এ জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না। কে কোনখানে ছিটকে পড়বে। বড় দুর্লভ এই ক'টি দিন। যাদের সঙ্গে নামমাত্র আলাপ বা মুখ চেনা তারাও রত্নর ঘরে এসে বিদায় নমস্কার বিনিময় করে যাচ্ছে। তাদেরও নয়নকোণ সজল। এ ধরণী সত্যই প্রেমভূমি। এখান থেকে পা ওঠে না যেতে।

রমেনদার কাছে বিদায় নিতে যেতেই তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু-বর্ষণ করলেন। ওসব স্তোকবাক্য শুনবেন না তিনি। দেখা এ জীবনে এই শেষ বলে ধরে নিতে হবে।

বর্ষণের ভিতর দিয়ে রোদ ফুটল। অনেক দিন পরে রত্নকে পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। তার জন্যে জিলিপি আনতে দিলেন। মেসের কাছেই জিলিপির দোকান। মেসে থাকতে সে প্রায়ই জিলিপি আনিয়ে খেত ও খাওয়াত। কত কাল মুখে দেয়নি। তার মজা লাগছিল জিলিপি আসছে শুনে।

"কী সুন্দর হয়ে উঠেছ তুমি এই ক'মাসে। কিন্তু শরীরের প্রতি এত অযত্ন কেন?" রমেনদা তাকে একসঙ্গে তারিফ ও তিরস্কার জানালেন।

"রমেনদা, এই ক'মাস আমি সুন্দর ছাড়া অসুন্দর কিছু ভাবিনি।" রত্ন বলল আবেগভরে। তার মন যাচ্ছিল সব কথা খুলে বলতে। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। নিষিদ্ধ প্রেম যে! দাদার কাছে কি বলতে আছে!

"যার যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি।" রমেনদা মন্তব্য করলেন।

এই মিষ্টভাষী মধুরস্বভাব সদাশয় বন্ধুবৎসল যুবক কেবল রত্নর নয় সকলের আত্মীয়তুল্য ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তাঁর আত্মীয়রাই তাঁকে অনাত্মীয়ের মতো দেখতেন। তার কারণ তিনি তাঁর মোটা মাইনের চাকরিটা অসহযোগের হুজুগে মেতে ছেড়ে দেন। চাকরি যতদিন ছিল ততদিন আত্মীয়দের প্রত্যাশার অবধি ছিল না। চাকরি গেছে, তাই কেউ তাঁকে পোছে না। ওকালতী করে সফল হলে তখন আবার পুছবে।

"তার পর তোমাদের সেই সোনালী বোনটির খবর কী?" রমেনদা জানতে চাইলেন কথাপ্রসঙ্গে।

সোনালীকে রত্ন একেবারে ভুলে গেছল। মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল। এত দিন সে ভেবে এসেছে, যে জগতে গোরী আছে সে জগতে মন্দ কেমন করে থাকবে, অসুন্দর কেমন করে থাকবে? এখন মনে হতে থাকল, যে জগতে সোনালী আছে সে জগতে ভালো কেমন করে থাকবে, সুন্দর কেমন করে থাকবে? দেখতে দেখতে তার মুখ আঁধার হয়ে উঠল।

তা লক্ষ করে রমেনদারও গলার সুর কাঁপতে লাগল। "বুঝেছি। খারাপ

খবর। বোষ্টম কি অত সহজে বোঝা ঘাড়ে নিতে রাজী হয়? সোনালী তো বোষ্টমী নয় যে আপনার ভার আপনি বইতে পারবে।"

"ওঃ! রমেনদা! এ জগতে এত অসুন্দরও আছে! আমি যে মেলাতে পারছিনে। মেলাতে পারছিনে সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরকে। সেইজন্যে ভুলে থাকছি।" রত্ন বলল কাঁদো কাঁদো সুরে। তার জিলিপির সাধ মিটে গেল।

"কী করবে, বল। অসুন্দরও যে সত্য। সত্যের দিকে চোখ বুজে থাকাও তো ঠিক নয়। মেনে নিতে হবে যে পশুও আছে, পাশবিকতাও আছে, সুন্দরীও আছে, সৌন্দর্যও আছে। এটা মিশ্র জগৎ।" রমেনদা আশ্বাস দিতে গেলেন।

"বিউটি য়্যান্ড দি বীস্ট!" রত্ন বার বার ঘাড় নেড়ে বলল, "না। না। না। জগৎ সম্বন্ধে এই দ্বৈত দৃষ্টি আমি মেনে নেব না। আমি নতুন রূপকথা লিখব, রমেনদা। পশু এবং সুন্দরী নয়। সুন্দর এবং সুন্দরী।"

রমেনদা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ওটা হবে তোমার নিজের গল্প। আগে তো জীবনে লেখা হোক। তার পর কাগজে।"

রত্ন রাঙা হয়ে উঠল। রমেনদা কি টের পেয়েছেন? প্রভাত জানায়নি তো? এর পর সে কী মনে করে শেখরবাবু ও অলকাদেবীর কাহিনী পেড়ে বসল। দেখা যাক রমেনদা অনুমোদন করেন কি না। কিন্তু তাঁদের আসল নাম গোপন রাখল।

তিনি বললেন, "ওঁদের দু'জনকেই আমি চিনি। শেখরবাবুর আমি ভক্ত। অলকাদেবীকেও শ্রদ্ধা করি। ওঁদের লৌকিক অর্থে বিবাহ হয়নি বলে আমি বিকার বোধ করিনে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ওটা বিবাহই। আরো কিছু কাল অপেক্ষা করলে ওঁদের জিৎ হবে। হিন্দুসমাজে এ রকম কত হয়েছে। হিন্দুরা প্রেমের মহিমা বোঝে। নইলে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করত না। জান তো, বৈষ্ণবরা আহত হন যদি কেউ বলে রাধা পত্নী, কৃষ্ণ পতি। তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে সত্যিকার ভালোবাসা পতিপত্নীর মাঝখানে সম্ভব। প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি বাইরে বিরূপ ভাব দেখাতে হয়, নইলে সমাজ থাকে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কার না পক্ষপাত!"

"তাই নাকি!" রত্ন অবাক হলো। কিন্তু ধরা দিল না।

"নিশ্চয়। প্রেমিক প্রেমিকাকে সবাই মনে মনে ভালোবাসে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় ওরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। শেখরবাবু ও অলকাদেবীর মতো ক'জন খাঁটি সোনা! বেশীর ভাগই পোড় খেলে মেকী প্রমাণ হয়। তুমিও এটা স্বীকার করবে যে একটা অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাওয়া ভালো। সব প্রেম প্রেম নয়। সেইজন্যে সমাজকে খুব বেশী দোষ দিতে পারিনে। প্রেমিক প্রেমিকা যদি ঠিক থাকে তবে সমাজও চোখ বুজতে জানে।"

রত্নর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কিন্তু আমরা চাই স্বীকৃতি।"

রমেনদা হেসে বললেন, "সাহস থাকলে তাও পাবে।"

রমেনদা কি টের পেয়েছেন? রত্ন আর একটু হলেই ফাঁস করে দিচ্ছিল আর কী! কিন্তু দু'চার কথার পর বুঝতে পারল যে "আমরা" বলতে তিনি সমঝেছেন একালের তরুণতরুণীরা। রত্ন ও শ্রীমতী নয়।

সে রাত্রে রত্নর কেবলি মনে পড়তে থাকল সোনালীকে। গোরীর মতো সোনালীকেও সে চোখে দেখেনি। তবু তার জীবনের সঙ্গে সোনালীও জড়িয়ে গেছে। ও মেয়ে হয়তো তার নামটাও কোনো দিন শোনেনি। তার অস্তিত্বের সংবাদ রাখে না। তথাপি তার জীবনে ও মেয়ের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব।

সোনালী একই ভাবে রয়েছে। রত্ন যত দূর জানে। হয়তো আমরণ সেই ভাবেই থাকবে। বহু শ্বাপদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে বহু দূষিত রোগে সংক্রামিত হয়ে দিকে দিকে পচন ছড়িয়ে ওই নিষ্পাপ মেয়েটি শাপমুক্ত হবে। রত্ন তা হলে কী করবে? এ জীবনে কোনো দিন হাসবে না? খেলবে না? সুখী হবে না? সুখী করবে না? যৌবনের স্বাদ নেবে না? দেবে না? সোনালীকে বাঁচাতে পারছে না বলে নিজে বাঁচবে না?

তার জীবনদর্শনেও দোলা লাগছিল। যে জগতে গোরী আছে সে জগতে অসুন্দর কী করে থাকবে? মন্দ কী করে থাকবে? আবার যে জগতে সোনালী রয়েছে সে জগতে সুন্দর কী করে থাকবে? ভালো কী করে থাকবে? এ জগৎটা তবে কোন জগৎ? গোরীময় জগৎ না সোনালীময় জগৎ? না গোরীতে সোনালীতে বিভক্ত শাদায় কালোয় ছক কাটা ভালোয় মন্দে ভাগ করা সুন্দরে কুৎসিতে নক্সী কাঁথা জগৎ?

দ্বিতীয় ভাগ

রত্নর মন অবুঝ। সে গৌরীময় জগৎকেই নজরানা দিয়েছে। সোনালীময় জগৎকে নজরানা দেয়নি। গৌরীতে সোনালীতে আলোতে আঁধারে অমৃতে গরলে বিমিশ্র জগৎকেও নজরানা দেবে না। সে দ্বৈতবাদী নয়। যদিও যুগল উপাসক। তার মন বলে, ওগো প্রেম, তুমিই একমাত্র রিয়্যালিটি। তুমি যদি সকলের অন্তরে না থাক তবে আমার হৃদয়ে ও গৌরীর হৃদয়ে তো রয়েছ। এই থাকাটুকুই যথেষ্ট। এক বিন্দু অমৃতে থাকলে সারা সংসারটাই অমৃতময় হয়। এক রশ্মি আলো থাকলে সারা ঘরটাই আলোময়। এখানে পরিমাণের প্রশ্ন ওঠে না। একটুখানিই অপরিমেয়। সেইটুকুই রিয়াল। আর সব আনরিয়াল।

প্রেম যেখানে আছে সেখানে প্রেমই আছে শুধু। সেখানকার কেন্দ্র দুটি নরনারীর যুগল চিত্ত। পরিধি নিখিল বিশ্ব। রত্ন তা হলে হাসবে খেলবে খুশি হবে খুশি করবে। যৌবনের পেয়ালা তুলে ধরবে। তুলে ধরলে মুখে ছোঁয়াবে। জীবন্মৃতের মতো বাঁচবে না। পূর্ণ প্রাণে বাঁচবে। গৌরীকে বাঁচাবে। সবাইকে বাঁচাবে। সোনালীকেও বাঁচাতে চেষ্টা করবে। যত ক্ষণ শ্বাস তত ক্ষণ আশ। এখনো খুব দেরি হয়ে যায়নি। কখনো খুব দেরি হয়ে যাবে না। তবে সোনালীর জন্যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তার নয়। যে ভালোবাসে তারই। কেউ ভালো না বাসলে সোনালীকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরই। তিনি যে ভালোবাসেন এটা ধ্রুব। দুঃখ দিলেও ভালোবাসেন। সুখ দিলেও ভালোবাসেন। ধ্রুব।

রত্ন সোনালীকে আবার ভুলে গেল। তার মন জুড়ে থাকল কেবল গৌরী। যখন জেগে থাকে তখন তার চেতনা ছেয়ে থাকে গৌরী। যখন ঘুম পায় তখন ঘুমকে সে ঠেকিয়ে রাখে পেছিয়ে দেয়। পাছে গৌরী চলে যায় চেতনার বাইরে। স্বপ্ন দেখতে চায় গৌরীকে। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কদাচ ঘটে।

শেষে এমন হলো যে রত্ন ভাবতে আরম্ভ করল সে আর রত্ন নয়, গৌরীরত্ন নয়। সে গৌরী। সাক্ষাৎ গৌরী।

এই অপরূপ অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। এমন কি কখনো কারো হয়েছে? রূপান্তরিত হতে হতে রত্ন হয়ে গেল গৌরী। বাইরে নয়। ভিতরে।

গৌরীকে এ কথা জানাতেই ও যা লিখল তা আরো অপরূপ। লিখল, "আমি

যখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তুমি এসে আমার সামনে দাঁড়াও। আমি আমার মুখ দেখতে পাইনে। তোমার মুখ দেখি। ওগো এ কী হলো আমার! আমি কি তুমি হয়ে গেছি? না এটা আমার বিভ্রম?"

এর পর যা লিখেছিল তা অতি ভীষণ কথা। আয়নার রত্ন নাকি ওকে চকিতের মতো চুম দিয়েছে। ওর কোনো অপরাধ নেই। অপরাধ রত্নর। এর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পত্রপাঠক রত্নকে।

রত্ন এর উত্তরে লিখল, "পত্রপাঠক রত্ন তো আর রত্ন নয়। সে গোরী হয়ে গেছে। ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত তা হলে করবে কে? কার কাছে? আমার আর্শীখানায় আমি এখনো রত্নকে দেখতে পাই। তাকে যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে বলি সে কী করবে, জান তো?"

রত্ন তার ফোটো পাঠায়নি, তাই গোরীর অন্য উপায় ছিল না। রত্নর অন্য উপায় ছিল। সে গোরীর ছবির মুখে মুখ রেখে প্রায়শ্চিত্ত করল। একবার নয়। বার বার। কিন্তু বোঝা গেল না কোন জন গোরী আর কোন জন রত্ন। রত্ন যদি গোরী হয়ে থাকে তবে গোরী হয় রত্ন। পত্রলেখিকা গোরী কিন্তু সেটা কবুল করল না। সে রত্ন নয়, রত্নগোরী।

ছয়

সলিল ব্রহ্মর সঙ্গে বড়দিনের সময় শান্তিনিকেতন যাবার আগে আরো একবার সেখানে ঘুরে এসেছিল রত্ন একা। সে বার জন গ্রেগরীর সঙ্গে তার দেখা হয়। গেস্ট হাউসে পাশাপাশি দুজনের দুখানা লোহার খাট। খাটের উপর তোশক। রাত্রে মশারি খাটিয়ে দিয়ে যায়। গ্রেগরী কিন্তু মেজের উপর কম্বল পেতে শোবেন, মশারি ব্যবহার করবেন না। অস্বস্তি লাগে রত্নর। সে তো তাঁর খাতিরে মশারি বিনা শুতে পাবে না।

সাহেবের পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। খালি পা। গান্ধীপন্থী বলে ইতিমধ্যেই তাঁর নাম হতে আরম্ভ করেছে। তা বলে একজন মধ্যবয়সী মার্কিন অতিথি যে খাট ছেড়ে মেজেতে শোবেন ও মশারি থাকতে মশার কামড় খাবেন

রত্ন এটা কল্পনাও করেনি। পছন্দও করে না। অহিংসার সঙ্গে এর কী সম্বন্ধ! তিনি কি তবে জৈনদের মতো রক্ত দিয়ে মশা পুষতে চান? ওটা কি অহিংসা না অহিংসার বিকৃতি?

এমনি করে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। ধীরে ধীরে তাঁর জীবনকাহিনী শোনা হয়।

জন গ্রেগরী আইন ব্যবসায়ে প্রভূত উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল যাতে উভয় পক্ষে আপোস নিষ্পত্তি হয়ে যায়। মানুষে মানুষে বিবাদ বাধবে, আর তার থেকে তিনি ধনবান হবেন, এ রূপ ধনবত্তা তাঁকে বিবেকজর্জর করত। অথচ তাঁর জীবনযাত্রা ছিল এমন ব্যয়বহুল যে রুচি না থাকলেও তাঁকে ধনের অন্বেষণে জীবন ব্যয় করতে হতো। ব্যয়বাহুল্য থেকে পরিত্রাণও ছিল না। সেটা না হলে আইনজীবীদের ঠাট বজায় থাকে না। আর পাঁচজন আইনজীবীর সঙ্গে তাল রেখে চলা যায় না। লোকে বলবে কৃপণ অথবা নীচ।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্যে অপ্রয়োজনীয় আয়। তার জন্যে অপ্রয়োজনীয় সময়পাত। আবার বিলাসে ব্যসনে ভূরিভোজনে অপ্রয়োজনীয় কালক্ষয়। তাঁর মোমবাতি দুই দিক থেকে পুড়ছিল। তিনি স্থির করলেন যে সভ্যতা থেকে বিদায় নিয়ে বন্যদের সঙ্গে প্রিমিটিভ বনে যাবেন। তাদের জীবনযাত্রা নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। তারাই বাঁচতে জানে। আমেরিকা ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে ছিল শিকারের রাইফেল। মৃগয়া করে খাবেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছন। বনে জঙ্গলে ডেরা ফেলেন। একদিন দেখতে পান একটা সারস জাতীয় পাখী—সাংখোল তার নাম—গাছের ডালে বাসা বেঁধেছে। একটু অপেক্ষা করতেই পাখীটা কী মুখে করে বাসায় উড়ে এলো। অমনি জন গ্রেগরী রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন। আর এক সেকেণ্ডের মধ্যে গুলী ছুঁড়তেন। কিন্তু সেই খণ্ড-সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর জীবনের ওলটপালট হয়ে গেল। বন্দুক তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, "এই শেষ। আর নয়।" তার পর গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অস্ত্রসমর্পণ করলেন।

আসলে হয়েছিল এই যে মাকে বাসায় ফিরতে দেখে এক ঝাঁক ছানা আনন্দে

কলরোল করে ওঠে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কচি কচি ঠোঁটগুলি ছোট ছোট মাথাগুলি মা'র কাছে আশ্রয় খুঁজছে, আদর খুঁজছে। কে তাদের আশ্রয় দেবে, আদর করবে, মা যদি মারা যায়! তারাও যে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারা যাবে। একটা গুলীতে এতগুলো প্রাণ নিতে জন গ্রেগরীর অন্তরাত্মা বিমুখ হলো। বিশেষত শিশুর প্রাণ। গুলীতে এরা মরবে না বটে, কিন্তু গুলীর পরিণাম এদের অনাহারে মৃত্যু।

রত্ন এ কাহিনী শুনে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল। তার মুখে কথা জোগাল না। তার চোখে জল এসেছিল। কত বড় একটা ট্র্যাজেডী কেমন করে মোড় ঘুরে সার্থক এক কমেডী হয়ে উঠল। পাখীটাও বাঁচল, গ্রেগরীও বাঁচলেন। মিথ্যার জীবন খসে পড়ল। সত্যের জীবন অনাবৃত হলো। অহিংসার দীপ হাতে করে নবজীবনের পথে যাত্রা করলেন জন গ্রেগরী। এক চরম পন্থা থেকে তিনি অপর চরম পন্থায় হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। এক অন্ধকার থেকে অপর অন্ধকারে। এত দিনে পেয়ে গেলেন পরম পন্থা। এ পথ বিত্তময়ী সংকা নয়। অথবা নয় রক্তপিচ্ছিল বর্ত্ম।

"তা বলে কি মশামাছিও মারবেন না?" প্রশ্ন করেছিল রত্ন।

"আরে না, না।" হেসে উত্তর দিয়েছিলেন গ্রেগরী। "তা নয়। আমি পরখ করে দেখছি কত কম বোঝা বইতে পারি। মশারিও তো একটা বোঝা। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়। কোথায় রাত কাটে তার ঠিক নেই। অভ্যাস যদি করি তবে মশারি ঘাড়ে করে ফিরতে হয়। বরং অভ্যাস কাটিয়ে ওঠাই ভালো।"

ভদ্রলোকের আহারে বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিরামিষাশী তো ছিলেনই, তার উপর ছিলেন আধসিদ্ধ বা কাঁচা খাওয়ার পক্ষপাতী। দুধ না, চিনি না, যাতে চিনি বা দুধ আছে তেমন কোনো খাদ্য না। ওজন কমে গেছে, কিন্তু স্বাস্থ্যহানি হয়নি।

অহিংসা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছিলেন, "প্রাণে যদি প্রেম না থাকে তবে অহিংসা অহিংসাই। তার বেশী নয়। তা দিয়ে অন্যায়কারীর অন্তঃ-পরিবর্তন ঘটানো যায় না। প্রেম। প্রেমই অহিংসার ক্রিয়াত্মক গুণ। প্রতিদিন কত মন্দ লোক আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে। বলছে, আমাকে ভালোবাসতে

পার? আমরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব। মন্দ লোককেও ভালোবাসব। কিন্তু মন্দকে নয়। মন্দকে পরিবর্তিত করব ভালোয়।”

জন গ্রেগরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। অনেক দিন মনে ছিল না তাঁর কথা। এখন স্মরণ হলো। গোরীর রক্ষক হওয়া রত্নর সাধ্য নয়। কিন্তু তার ভক্ষকের অন্তঃপরিবর্তন আনা কারো না কারো সাধ্য। গোরীর কিংবা রত্নর কিংবা তাদের কোনো বন্ধুর। যার প্রাণে প্রেম আছে। যশোবাবুর প্রতি প্রেম। রত্ন আত্মপরীক্ষা করে দেখল গোরীর স্বামীকে সে ঘৃণা করে না। তাঁর সম্বন্ধে সে অহিংস। অহিংস, কিন্তু সপ্রেম নয়। গৌরীকে ভালোবাসতে গিয়ে তার স্বামীকেও ভালোবাসতে হবে এত দূর যেতে তার আপত্তি। সে গোরীর জন্যে এমনিতেই যথেষ্ট জড়িয়ে পড়েছে। আরো জড়িয়ে পড়লে নিজের স্বাধীনতা হারাবে। প্রেম আর স্বাধীনতা উভয়ের ভারসাম্য রাখতে চাইলে গোরীকে ভালোবেসেই ক্ষান্ত হতে হবে, তাব স্বামীকে সুদ্ধ ভালোবাসার দায় মাথায় নেওয়া চলবে না।

একটু একটু করে রত্নর মনে উদয় হলো যে যশোবাবুর হৃদয় বদলানোর ভার নিতে পারে রত্ন নয়, গোরী নয়, ললিত নয়, জ্যোতি নয়—সুধা। একমাত্র সুধা। একমাত্র সে-ই ভালোবাসে তাঁকে। যে ভালোবাসে সে-ই হৃদয় বদলানোর ভার নিতে পারে। জাদু দণ্ড তারই হাতে। আর কারো হাতে নয়।

সুধা মেয়েটি কে বা কেমন রত্নর কোনো ধারণাই ছিল না। তার সম্বন্ধে সে যা পড়েছে বা শুনেছে তার থেকে অনুমান হয় সে সাধারণ রক্ষিতা নয়। সে-ই প্রকৃত সহধর্মিণী। কিন্তু এমনি এ দেশের রীতি যে তার সঙ্গে বিবাহ অভাবনীয়। সে যে বিধবা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিদিবসে তাঁর চারিত্র্যেব তাঁর ব্যক্তিত্বের তাঁর অশেষ সদ্‌গুণের প্রশস্তি গান করা হয়, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে উচ্চারণ করবে না যে তিনি বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা নারীকে সমান অধিকার দিয়ে গেছেন। পুনর্বার বিবাহের সমান অধিকার। তিনি নরনাবীর সমানাধিকারবাদী। বিপত্নীক যশোমাধবের পুনরায় বিবাহ হবে, কিন্তু বিধবা সুধার পুনরায় বিবাহ হবে না। এই বৈষম্য যশোবাবুরও সহ্য হয়নি। সেইজন্যে তিনি অনেক বছর বিপত্নীক অবস্থায় কাটিয়েছেন। শেষ-

পর্যন্ত পিতামাতার অনুরোধ বা আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহস হলো না। নিজেরও তো বংশরক্ষার বাসনা ছিল। সুধা সে বাসনা মেটাতে পারবে কেন? আর সব বাসনা তার দ্বারা অপূরণীয় নয়।

সুধার জন্যে দুঃখ হয় রত্নর। তার ন্যায়বোধ তাকে বলে যে সুধাকে বিয়ে করাই উচিত ছিল যশোবাবুর। এখনো করা যায়, কিন্তু তার আগে গোরীকে ছাড়পত্র দিতে হবে। গোরী স্বাধীন হলে যশোবাবুও স্বাধীন। একজন বিয়ে করবে রত্নকে, অপর জন বিয়ে করবেন সুধাকে। দেখতে গেলে রত্ন ও সুধা দু'জনে দু'জনার মিত্র। চার জনে মিলে তাস খেলতে বসেছে। এ এক নতুন ধরনের খেলা। এ খেলায় রত্ন জিতিয়ে দেবে সুধাকে, সুধা জিতিয়ে দেবে রত্নকে। খেলার শেষে রত্নর জয়বিভব গোরী, সুধার জয়বিভব যশোমাধব।

সুধা যে কার কী হয় রত্ন কোনো দিন খোঁজ করেনি। যদি ললিতের কেউ হয়ে থাকে তবে ললিতকে দিয়ে সুধার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। তার পর সুধা যদি রত্নর পরামর্শ শোনে ও যশোবাবুর হৃদয়ের পরিবর্তন আনে তা হলে গোরীও স্বাধীন, যশোবাবুও স্বাধীন, রত্নও সুখী, সুধাও সুখী। কিন্তু রত্নর নিজের মনেই একটু দ্বিধা ছিল। বিয়ে? গোরী কি রত্নকে বিয়ে করবে? তেমন প্রতিশ্রুতি তো সে দেয়নি। মাঝে মাঝে কবিত্ব করে 'বর' বলেছে। ছেলেবেলায় আরো কত মেয়ে খেলাচ্ছলে রত্নকে 'বর' বলেছিল। কোথায় তারা আজ! যে যার স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করছে। আর রত্নও তো বিয়ে করবে বলে কথা দেয়নি। বিবাহ নামক প্রথাটাতে তার আন্তরিক বিশ্বাস নেই। এক দিক থেকে ওটা প্রেমের পরিপন্থী। বিয়ে হয়ে গেলে লোকে ধরে নেয় যে প্রেম আপনি হবে, তার জন্যে সাধনা করতে হবে না। আরেক দিক থেকে ওটা স্বাধীনতার অন্তরায়। বিয়ের পরে মেয়েরা তো পরাধীনই, পুরুষরাও কি স্বাধীন? সংসার করতে হয় যে। ভাত কাপড় জোগাতে হয় যে। চাকরি রাখতে হয় যে। রত্নর বাবা ফী মাসে ভয় দেখান সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। পারেন কই?

তার পর সুধাকে রত্ন যে ভার দিতে চায় সে ভার সুধাই বা বইতে রাজী হবে কেন? সে সংস্কারবদ্ধ হিন্দু বিধবা। হিন্দুর মেয়ের বিয়ে একবারই হয়ে

থাকে। দু'বার হবার জো নেই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধান দিলে কী হবে! বিধবা মহাশয়ারা বিবাহবিমুখ। কারণ সমাজ মহাশয় অগ্নিশর্মা। যে সমাজে কুমারী মেয়েদেরই পাত্র জোটে না সে সমাজে বিধবার প্রতিযোগিতা! তা ছাড়া মামুলি যুক্তি তো আছেই। বিধবারা যদি বিয়ে করে তবে যে কারো সম্পত্তি নিরাপদ নয়। স্থাবর অস্থাবর কোনো রকম সম্পত্তি। যায় নারী নামক সম্পত্তি। সুতরাং সতীত্বের দোহাই পাড়তে হয়। বিধবার বিয়ে হলে সতীত্ব যায়। না হলে থাকে। এই যেমন সুধার আছে।

কিন্তু সুধা কেন? সুধাদি। সেই দূরবর্তিনী অপরিচিতা অন্তঃপুর-চারিণীকে শ্রদ্ধা করতে হয়। তিনি যাঁকে ভালোবাসেন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ। সেই অর্থে সতী। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিদি বলতে হয়। তিনি বলতে হয়। তিনি যদি সদয় হন, সবল হন, তবে তাঁরই মধ্যস্থতায় গোরী স্বাধীন হবে। তিনি স্বয়ং সার্থক হবেন। পরিপূর্ণ হবেন। রত্ন ললিতকে দিয়ে সুধাদিকে বলাবে। দেখা যাক কী হয়। আপাতত গোরীকে জানাবে না। জানাবে যখন সময় পরিপক্ক হবে।

এমনি করে রত্ন দিন দিন জড়িয়ে পড়ছিল একটি অচেনা অজানা পরিবারের ঘরোয়া ব্যাপারের জালে। তার নিয়তি জড়িয়ে যাচ্ছিল তাদের নিয়তির সঙ্গে। ললিতের সঙ্গে তার বন্ধুতার থেকে এলো গোরীর সঙ্গে ভালোবাসা। গোরীর সঙ্গে ভালোবাসার থেকে এলো যশোবাবুর চিত্তপরিবর্তনের পরিকল্পনা। তার থেকে আসছে সুধাদির শরণ নেওয়া। এর পরে কী? কে জানে কী! রত্নর ভালো লাগছিল না ভাবতে যে তার স্বাধীনতা ক্রমেই দায়বন্ধ হচ্ছিল। প্রেমের মূল্য কি এমনি করেই দিতে হয়! তার আরো খারাপ লাগছিল ভাবতে যে পদ্মফুলের চার দিকে পাঁক! ফুলটি তুলে আনতে গেলে পাঁকটি গায়ে মাখতে হয়। পাঁকে তলিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। গোরী যেমন সুন্দর তার পারি-পার্শ্বিক তেমনি অসুন্দর।

রত্নর একটুও স্পৃহা ছিল না যাকে ভালোবাসে তার জন্যে যাদের ভালোবাসে না তাদের সংস্পর্শে আসতে। কিন্তু সে যে প্রেমিক। তাকে যে প্রমাণ করতে হবে প্রেম সর্বশক্তিমান। প্রেম কাউকেই অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না। সবাইকেই

কোল দেয়। শত্রুকেও। কুষ্ঠীকেও। তা যদি সে না পারল তবে তার ওটা প্রেম নয়। যার হৃদয়ে তেমন প্রেম নেই সে প্রেমিক নয়। রত্নর প্রেম কি তেমন প্রেম? না ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য?

রত্নর কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। সে যদি সত্যিকার প্রেমিক হয়ে থাকে তবে তার প্রেম কেবল গৌরীকেই কেন্দ্র করে ঘুরবে না, প্রেমের পরিধির মধ্যে যশোমবুও আসবেন, সুধাদিও আসবেন, আসবেন আরো অনেকে। কী করে যে কেউ ভালোবাসতে পারে একজনের জন্যে একটা পরিবারকে, বিশল্যকরণীর জন্যে গন্ধমাদনকে, তা রত্নর কল্পনাতীত। তবু আশ্চর্যের কথা, তার মনে হতে থাকল সে সবাইকে ভালোবাসতে পারে, তার অন্তঃকরণে সকলের জন্যে ঠাঁই আছে, সে উদারহৃদয়, সে গৌরীর বান্ধবদেরও নিজের বান্ধবদের মতো ভালোবাসবে। কুণ্ঠিত হবে না, সঙ্কুচিত হবে না, বিকার বোধ করবে না। নয়তো সে সত্যিকার প্রেমিক নয়।

কিন্তু একটা জায়গায় তার বাধছিল। সে বহুদিন থেকে সংকল্প করেছে যে বি এ পরীক্ষার পর পথে বেরিয়ে পড়বে। দেশবিদেশ দেখবে। দশ বছর আগে কোথাও থামবে না। কিন্তু গৌরী এসে সব ওলটপালট করে দিয়েছে। গৌরী তাকে ভারতের বাইরে যেতে দেবে না। বাংলার বাইরেও না। এই তো সেদিন আবার লিখেছে, "তোমার আমার মাঝখানকার দূরত্বটাকে কমিয়ে আনতে পার না, মণি? কলকাতায় চলে এলে কেমন হয়? দেখা হয়তো হবে না। কিন্তু তুমি যে আমার আরো কাছে এসেছ এ কথা ভেবে আমি আরো সোয়াস্তি পাব। তুমিও কি পাবে না?"

গৌরী ও রত্নর মাঝখানকার দূরত্বটা এক বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি রয়েছে, অথচ তার চেয়ে বেশী লাগছে। যেন পৃথিবীর এ প্রান্ত ও প্রান্ত। প্রেম যতই বাড়ছে দূরত্ববোধ ততই বাড়ছে। যত প্রেম তত দূরত্ববোধ। আর যত দূরত্ববোধ তত আকর্ষণ। রত্ন অনুভব করে গৌরী তাকে জোরে আরো জোরে টানছে। দুই ভুজ দিয়ে টানছে। মাথার দিকে মাথা। চোখেব দিকে চোখ। মুখের উপর নিঃশ্বাস। গায়ের উপর চুল। রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন মনে হয় বিছানায় আরো একজন শুয়ে। একটু উসখুস করলেই সে

অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার চেয়ে অসাড় হয়ে শুয়ে থাক। শোন তার শ্বাসপতনের শব্দ। নাসায় নাও তার অঙ্গের সুবাস। তাকে ঘুমোতে দাও। তার বালিশে মাথা রেখে আবার নিদ্রা যাও।

রত্নর মনে সংশয় ছিল না যে বিরহপ্রবাহিণীর অপর পারে সেই রাত্রের সেই যামে ঘুম ভেঙে গেছে আর একজনের। তার সুন্দরকে সে অনুভব করছে একাকী শয্যায়। মিলন? হাঁ, এও একপ্রকার মিলন। ধীরে ধীরে মুদিত হয়ে আসছে তার নয়নকলি। চাঁপার কলি। রুপোর কাঠির ছোঁয়ায়। পরে কখন আবার লাগবে সোনার কাঠির পরশ। সে জেগে উঠবে। রত্নকে অনুভব করবে তার শিয়রে। তার পাশে।

গোরীর সঙ্গে দেখা করতে রত্নর ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। যদি ও মেয়ের ভুল ভেঙে যায়! যদি ওর চাউনিতে প্রকাশ পায় ওর মোহভঙ্গ, ওর নৈরাশ্য! এই রত্ন! এই আমার সুন্দর! দূর! এ যে পুরুষই নয়! সুপুরুষ তো পরের কথা। তা সত্ত্বেও রত্ন হৃদয়ঙ্গম করল যে গোরীর সঙ্গে একটি বার দেখা না করে সে দেশান্তরী হতে পারে না। সেই একটি বার দেখাতেই তাদের জীবনের এস্‌পার কি ওস্‌পার হয়ে যাবে। গোরী যদি হতাশ হয় তবে প্রথম দর্শনই শেষ দর্শন। প্রথম অঙ্কেই নাটকের যবনিকা। তার পরে হয়তো ভদ্রতা বা বন্ধুতা বা রাখীবন্ধ ভাইবোনের আনুগত্য। কিন্তু মধুর রস আর নয়। প্রেম আর নয়।

রত্ন আরো হৃদয়ঙ্গম করল যে প্রথম দর্শনের জন্যে প্রস্তুতি চাই। যেমন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি। প্রথম দর্শনের মতো অত বড় পরীক্ষা আর কী আছে! বি এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় সুযোগে সফল হওয়া যায়। কিন্তু প্রথম দর্শনে ব্যর্থ হলে সে ব্যর্থতার প্রতিকার নেই। বি এ পরীক্ষায় খারাপ করলে এম এ পরীক্ষায় কালিমা ক্ষালন হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই রঙের নেশা ছুটে গেলে পরে আর তেমন নেশা ধরে না। প্রথম দর্শনের জন্যে প্রস্তুতি আরো কঠিন। রত্ন এত দিন এ প্রস্তুতির কথা ভাবেনি। কেননা প্রথম দর্শনের কথা ভাবতে চায়নি। এবার মনঃস্থ করল যে দেশান্তরী হবার আগে গোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সাক্ষাৎকারের পূর্বে প্রস্তুত হবে।

সে স্থির করল দুই ভাবে প্রস্তুত হবে। এক, প্রেমের মূলভিত্তি এমন গভীর করে পাতবে যে চোখের ভালো লাগা না লাগার উপর অনুরাগের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্ভর করবে না। দুই, চোখের ভালো লাগার জন্যে চেহারার যত্ন নেবে। অশরীরী প্রেমে চেহারার জন্যে চাড় না থাকতে পারে। যেমন উদাসিনী মালাদি তেমনি উদাসীন রত্ন। কিন্তু গোরীর সঙ্গে প্রেম ঠিক অশরীরী নয়। গোরীও ঠিক উদাসিনী নয়। রত্ন কেমন করে উদাসীন হবে?

গোরীকে তার প্রস্তুতির কথা জানাতেই উত্তর এলো অতি অপূর্ব। লিখেছিল ও মেয়ে—

বেশ ছেলে তো! তুমি ভেবে মরছ তোমার রূপ নেই দেখে আমি মূর্চ্ছা যাব! আর আমি ভয়ে মরছি আমার যৌবন চলে যাচ্ছে দেখলে তোমার প্রেমও চলে না যায়! তোমরা পুরুষ। কুড়িতে কুঁড়ি। আর আমরা নারী। কুড়িতে বুড়ী। ফুল যেমন দেখতে সুন্দর, কিন্তু দু' দিনেই এলিয়ে যায় শুকিয়ে যায় আমরাও তেমনি। তেমন সৌন্দর্য নিয়ে আমি কী করব! আর আমার সৌন্দর্য নিয়ে তুমিই বা করবে কী! বাসি ফুল সুন্দর বলে কি কেউ বাসি ফুলের মালা পরে!

ওগো তোমার রূপ না হয় নেই, কিন্তু যৌবন তো আছে। থাকবেও অনেক দিন। তুমি আমার চোখে যৌবনের প্রতীক। আমাদের দেশের যৌবন। আমাদের সমাজের যৌবন। তুমি সেই যৌবনের প্রতিনিধি। তোমার সঙ্গে থাকা যৌবনের সঙ্গে থাকা। তোমার সঙ্গে থাকলে আমি চিরযৌবনা হব। রূপ! আমার রূপই তোমার রূপ। এর থেকে স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে তুমি করবে কী! কাকে দেবে, ওগো ভ্রমর? না, না, তোমাকে রূপবান হতে হবে না। হলে তুমি কি আমার থাকবে? কে কখন চুরি করে নেবে!

প্রস্তুতির নাম করে আর কত কাল অদর্শন হতে চাও বল তো। কিন্তু আমি যে আর সইতে পারছিনে। আমার কেবলি মনে হচ্ছে এ জন্মে নয়। তোমার আমার দেখা এ জন্মে নয়। হাত পা অবশ হয়ে আসে, রক্ত হিম

হয়ে আসে, যখন ভাবি যে মিলন তো দূরের কথা, দর্শনও হবার নয়। আমাদের প্রেম শুধু চিঠিতে চিঠিতে। জ্যোতি বলছিল বার্নার্ড শ আর এলেন টেরি। শুনে এত রাগ হলো। বলে বসলুম, রত্ন যদি আমাকে দেখতে না আসে আমি যাব রত্নকে দেখতে। জ্যোতি বলল, শাস্ত্রেও তাই লিখেছে। রত্ন কারো অন্বেষণ করে না। রত্নকেই অন্বেষণ করতে হয়।

আর ভালো লাগছে না, মণি। আর ভালো লাগছে না। ওগো তুমি পরীক্ষার পরেই তোমার ভাঙা দেহমন নিয়ে চলে এস। জ্যোতির আশ্রমে তোমার জন্যে ব্যবস্থা করব। সেখানে আমার যাওয়াআসার স্বাধীনতা আছে। কেউ কিছু মনে করবে না। জ্যোতি স্বয়ং তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবে। কানন সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আর আমি গিয়ে দূর থেকে একটি বার দেখেই এক ছুটে পালিয়ে আসব। তোমাকে দেখা দেব না। কেন দেখা দেব? আমি তোমার কে যে আমার দেখা পাওয়া তোমার চাই? কই, তেমন আগ্রহ তো দেখিনে। আগ্রহ যত সবই আমার দিক থেকে। লজ্জায় মরি।

কি শীত কি বর্ষা রত্ন প্রতিদিন গঙ্গায় নাইতে যায়। সময় থাকলে সাঁতার কাটে। সাঁতরাতে সাঁতরাতে অর্ধেক নদী পার হয়। কিংবা এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে গিয়ে হাজির হয়। তার ক্লান্তিমোচনের পদ্ধতি এই। নদীর সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। বহমান স্রোত তাকে প্রাণদান করে। সে শিশুর মতো লাফায় ঝাঁপায়, গা মেলে দেয়, হাত পা ছোঁড়ে। জল থেকে যখন উঠে আসে তখন তার দম ফুরিয়ে এসেছে, তবু তার মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তাকে যেন দম দেওয়া হয়েছে। গোরীর চিঠি পড়ে সে যেদিন উন্মনা হয় সেদিন নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনেক ক্ষণ ডুবসাঁতার দিয়ে হঠাৎ এক সময় পানকৌড়ির মতো মাথা তোলে। হাত পা ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে ভেসে থাকে। স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হাত পা চালিয়ে ভাঁটির ঘাটে ওঠে। সেখান থেকে উজিয়ে আসতে পারে না। পায়ে হেঁটে ফিরে আসে। অঙ্গ শীতল না হয়ে থাকলে আবার ঝাঁপ দেয়।

গোরীর এই চিঠি পেয়ে সে গঙ্গার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিশু যেমন মায়ের কোলে। অর্ধেক নদী পারাপার করে তার প্রাণ জুড়াল। এত দিন তার ধারণা ছিল প্রেমের পক্ষে দর্শনের চেয়ে অদর্শনই শ্রেয়। সেইজন্যে সে নানা ছলে অদর্শনটাকে সুদীর্ঘ করার চেষ্টায় ছিল। এখন তার খেয়াল হলো যে একজনের রূপের প্রদীপ থেকে অপর জন তার প্রদীপ জ্বালিয়ে নিলেই রূপান্বিত হবে। তেমনি একজনের যৌবনের পরশমণির পরশ লাগলে অপর জনের তনু যৌবনান্বিত হবে।

সে লিখল সে পদ্মার চর থেকে ফিরে গোরীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজবে। কিন্তু কোথায় ও কবে তা বলতে পারবে না। আশ্রম তার আস্তানা হবে না।

গোরী অধীর হয়ে লিখে পাঠাল—

সত্যি তুমি আসবে! আমার যে বিশ্বাস হয় না গো। সত্যি আমাদের চার চোখ এক হবে! ওগো কবে? ওগো কোন দিন? আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখো না। আমি বার বার প্রত্যাশা করেছি। বার বার হতাশ হয়েছি। আর আশা করতে ভরসা পাইনে। কাননকে খবর দিতে হবে। সে আর তুমি একসঙ্গে এসো। নয়তো কথা উঠবে। জ্যোতির আশ্রমে তুমি বিশ্রাম করবে না জানি। সবাই যেখানে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে একজন সেখানে বিশ্রাম করবে কোন মুখে!

কত যে কথা আছে তোমার সঙ্গে! কোনো দিন কি মুখ ফুটে বলতে পারব! যদি দেখা হয়ও। না গো না। পারব না। চিঠিতে কত কী বলা যায়। মুখোমুখি বলা যায় না। আমাদের এই চিঠি লেখালেখিই ভালো। মুখোমুখি ভালো নয়। আমি এখন থেকেই ভয় পেতে আরম্ভ করেছি। তোমার চাউনির সামনে আমি কি মাথা তুলতে পারব! তোমার দৃষ্টি যে অন্তর্ভেদী। ধরা পড়ে যাব যে। তুমি তখন কী মনে করবে আমাকে! আমি ভয় করি। আমি তোমাকেই ভয় করি। তোমার কাছ থেকে আমি আত্মগোপন করতে চাই। পর্দার আড়াল থেকে আমি তোমাকে দেখব। তুমি

দ্বিতীয় ভাগ

আমাকে দেখতে পাবে না। ওগো তুমি আমাকে দেখতে চেয়ো না। শুধু আমাকে দেখা দিয়ো।

সাত

পরীক্ষার ঝঞ্ঝাটে রত্ন বড় চিঠি লিখতে পারে না। গোরীর তাতে কী আফসোস! সে তার অভ্যাসমতো পাতার পর পাতা লিখে যায়। সেসবও রত্নর পাঠ্য। তবে সবকিছু উত্তরযোগ্য নয়। পরীক্ষার পরে এক সময় উত্তর দিলে ক্ষতি নেই।

ইদানীং গোরীর চিঠিতে বিচিত্র খবর থাকে। শিকারের বিবরণ। তার জন্যে আলাদা একটা হাতী বরাদ্দ। হাতীটার নাম মান বাহাদুর। হাওদার উপর পর্দা খাটানো থাকলেও সে যখন খুশি পর্দা ঠেলে সরিয়ে দেয়। মুখ খোলা রাখে। তার হাতেও বন্দুক। কিন্তু গুলী যদিও ছুঁড়েছে এখনো জীবহত্যা করেনি। বাঘ ভালুক পেলে মারত। কিন্তু তা হলে জঙ্গলে রাত কাটাতে হয়। তাতে সে নারাজ। দিনের বেলা পাখী মারার জন্যেই অভিযান। শুয়োর খোঁচানোর দলে সে যাবে না। সাহেব খোঁচাতে পারলে যেত। ডোমকুলের সাহেবদের সঙ্গে তার প্রোপ্রাইটর যান। কী যে আনন্দ পান তাতে! আনন্দ মদিরা।

বন্দুক ও শিকারের কুহক গোরীকে ঘরে থাকতে দেয় না। ভোর না হতেই বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে বুঝতে পারে ওটা বাইরেরই কুহক। যত ক্ষণ বাইরে থাকে তত ক্ষণ ভুলে থাকে। কিন্তু বিকেল চারটের সময় থেকে মন কেমন করা শুরু হয়। ওটা যে ডাক আসার সময়। ডাকে যে রত্নর চিঠি থাকে বা থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে চায়। কিন্তু শিকারেব নেশায় এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে ফিরতে বললেই ফেরা তখনি হয় না। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়।

বন্ধুর চিঠি পেতে এই কয়েক ঘণ্টার বিলম্ব তার সমস্ত দিনটা মাটি করে দেয়। ফেরা যাক ফেরা যাক করে সে অন্যান্যদের দিনটাও মাটি করে। পদ্মার

চরে যারা চখা শিকারে গেছে তারা কি অত সহজে থলে ভর্তি করতে পারে! চখা অতি হুঁশিয়ার পাখী। খালি হাতে ফিরতেও কেউ রাজী নয়। এক গোরী ছাড়া। তার লক্ষ্য জ্ঞান নেই। কেবল ফাঁকা আওয়াজ। তার তাতে লজ্জা নেই। সে যে নির্ভয়ে গুলী ছুঁড়তে পেরেছে এই যথেষ্ট কেরদানী। এমনি কিছু দিন চালাতে পারলে ইংরেজ ফেরার হবে। ঐ মহিষমর্দিনীর সঙ্গে লড়তে যাবে কে!

গোরী তার শিকারকাহিনীর শেষে লেখে, "আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ কী, জান? তোমার চিঠি পাওয়া। চিঠি যখন পাই তখন প্রাণ ফিরে পাই। তার আগে তিন চার ঘণ্টা ছটফট করতে হয়। মনে হয় বাড়ী আজ আর পেঁাছব না। পথে পথেই রাত কাটবে। হাতী হয়তো পথ ভুলে উলটো দিকে চলল। সত্যি সত্যি পেঁাছে যাই। ওরা বলে, এমন কী রাত হয়েছে! আমি বলি, এমন দেরি হবে জানলে আদৌ যেতুম না। লোকগুলো কী শয়তান! কত যে নিরীহ পাখী মেরেছে তার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল নেই। আহা! কী যে কান্না পায় দেখে! নরম তুলতুলে শরীর কাঠের মতো শক্ত। যেন কাঠের পুতুল। চোখের মণি যেন জমাট অশ্রু। কী যে মায়া লাগে দেখতে!"

আরেক দিন লেখে, "চিঠি পেতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়, তাই শিকারে যেতেই পা ওঠে না। ওগো কেমন করে আমি জেলে যাব! সেখানে কি তোমার চিঠি পাব! পেতে অশেষ বিলম্ব হবে না? ওগো কেমন করে আমি গা ঢাকা দিয়ে দেশের জন্যে লড়ব? মাটির তলায় লুকোব? তোমার চিঠি কি রোজ চারটের সময় মিলবে! আজ এক জায়গায় কাল এক জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে লুকিয়ে বেড়াতে হবে আমাকে। কে আমার ঠিকানা জানবে যে তোমার চিঠি পেঁাছে দেবে! প্রিয়তম, তুমি আমার সব পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করেছ। এ নেশা যার আছে সে কেমন করে দেশের স্বাধীনতা আনবে! এ যে মদের চেয়েও প্রবল!"

একদিন রত্নর চিঠি না পেলে সে দিশেহারা হয়। চিঠি তো এক টুকরো কাগজ নয়। একটুখানি সঙ্গসুখ। দিনান্তে ওটুকু যদি না পায় তবে রাত কাটে কী করে! কালরাত্রি যেন পোহাতে চায় না। বার বার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। যা নয় তাই কল্পনা করে। রত্ন কি আর আছে! সে নেই। সে মরে

দ্বিতীয় ভাগ

গেছে বা চলে গেছে বা অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে। চোখের জলে ভিজে যায় বালিশ। ভিজে যায় বিছানা। গোরী ওঠে, দীপ জ্বালায়। কেরোসিনের টেবল ল্যাম্প। রত্নকে লিখতে বসে।

আমার স্বাধীনতার জন্যে তুমি দিনরাত ভাবছ। স্বাধীনতা আমি চাই। কিন্তু তোমার হাত থেকে নয়। আমার স্বাধীনতা তোমার অধীনতার জন্যে। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি মরতে চাই। এই আমার জীবনের চরম অভিলাষ। তার পর তুমি আমার চিতার উপর তাজমহল গড়ে দিয়ো, যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাক।

স্বাধীনতার সংকল্প আমি নিয়েছি। স্বাধীন আমি হবই। কিন্তু আমার স্বাধীনতা তোমার স্বাধীনতার মতো নির্ব্যূঢ় নয়। আমি তোমার হতে চাই বলেই স্বাধীন হতে চাই। তুমি আমার না হয়েও স্বাধীন। নারী ও পুরুষ সমান স্বাধীন কেন হবে না এ নিয়ে তর্ক করেছি আমিও। এখনো তর্ক করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তো জানি আমার দৌড় কত দূর। লক্ষ্মীবাঈ হব বলে ঘোড়ায় চড়তে গেলুম, মরাঠা মেয়েদের মতো কাছা দিয়ে শাড়ী পরতে পারলুম না। বসতে গিয়ে দেখি বসা অস্বস্তিকর। লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো অস্ত্র হাতে নিলুম। মানুষ মারার আগে পশুপাখী মারতে গেলুম। শিকারের তোড়জোড় করে জীবহত্যা করতে পারলুম না। প্রিয়তম, আমার মতো অপদার্থকে দিয়ে দেশের কাজ হবার নয়। আমি বিপ্লবী নায়িকা নই। আমি একান্তভাবে প্রেমাধীনা পরাধীনা নারী। তোমারই অধীনা।

আচ্ছা, তুমি কি যীশু খ্রীস্ট না মহাত্মা গান্ধী? তোমার পুরোনো চিঠিগুলি আজ আবার নাড়াচাড়া করছি আর ভাবছি তোমার অমন সাধু হবার সাধ হলো কেন? তুমি যাঁকে যশোবাবু বল আমি তাঁকে মিস্টার ফৌজদার বলি। তাঁকে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও ভালোবাসতে পারবে না। ভালোবাসব বললেই কি ভালোবাসা যায়! এই যেমন হিং বা রসুন। বহু সদ্‌গুণের অধিকারী। কিন্তু ব্যঞ্জনে দাও দেখি। ক'জন খেতে

ভালোবাসবে? আলাদা করে দাও দেখি। কারই বা মুখে রুচবে! আমার তো গন্ধে বমি আসে। জোর করে বমি চাপতে যাওয়া কি ভালোবাসা? তার চেয়ে ভোজন ত্যাগ করাই শ্রেয়।

তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। তুমি চাও অন্তঃপরিবর্তন। ধর তাই হলো। কিন্তু হলে কার কোন কাজে লাগবে! এরা আমার কে! সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অজানা বিদেশী লোক। আমি এদের কে! বেঁধে আনা বিদেশিনী ক্রীতদাসী। এরা দেবতা হলেই বা আমার কী! আমার দাসীপনা তো ঘুচবে না। আমাকে মর্যাদা দেওয়া হবে দেবীর, কিন্তু সে দেবী খড়ের। তাকে বিসর্জন দিতে বাধবে না। সে যদি মা না হয় তবে তার পরিণাম কী হবে তা কে না জানে! সে থাকতেই আর একটি দেবী আসবে। কথাটা কেউ মুখ ফুটে বলবে না। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে বাকী থাকে না। আমার মূল্য আমার জন্যে নয়। বংশধরের জন্যে। এরা কি কোনো দিন আমার মূল্য অন্যনিরপেক্ষ বলে মানবে? বাইরে মানতে পারে, অন্তরে মানবে না। তা হলে অন্তঃপরিবর্তন কিসের?

কান্ত, তোমার প্রেম আর আমার মুক্তি একসূত্রে গাঁথা। তুমি থাকতে আমি আর কারো দিকে তাকাব না। আর কেউ আমার নয়। আমি আর কারো নই। ওদের অন্তঃপরিবর্তনে আমার কী! রত্ন আছে আমার। আমি রত্নসম্পন্না। আর কোনো সম্পদে আমাব কাজ কী! রত্নকে লোকে যত্ন করে সিন্দুকে তুলে রাখে। সাধ করে কণ্ঠে ধারণ কবে। কিংবা করে কর্ণাভরণ, নাসাভরণ। আমার রত্নকে নিয়ে আমি কী যে করি, কোথায় যে রাখি! আমার ঘর থাকলে আমি ঘরে বন্ধ করে রাখতুম। আমাব বাহির থাকলে আমি চোখে চোখে রাখতুম। আমার রত্নকে কে কোন দিন চুরি করে নিয়ে যাবে, ভুলিয়ে নিয়ে ধরে রাখবে, ভেবে আমাব ঘুম আসতে চায় না। আমার জীবনে এ কী যাতনা এলো! এমন হবে কে জানত! আমার স্বাধীনতার জন্যে আমি জ্বলেপুড়ে মরছিলুম, এখন দেখছি তোমার স্বাধীনতা আমার গায়ে সয় না। ওগো আমি কী যে অসহায় বোধ করি

দ্বিতীয় ভাগ

যখন ভাবি যে আমার রত্নকে আমি বুকে করে রাখতে পারছিনে! আর কেউ যদি তা করে তখন!

বত্ন কিছু দিন আগে গোরীকে লিখেছিল যশোবাবুর যাতে অন্তঃপরিবর্তন হয় তাই তার কাম্য। জন গ্রেগরীর হতে পারে, যশোবাবুর হতে পারে না? অন্তঃ-পরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা সে স্পষ্ট করেনি। তার মতে অন্তঃপরিবর্তন হচ্ছে গোরীকে স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র দেওয়া। কিন্তু গোরীর মতে তা নয়। অন্তত ওর চিঠি থেকে মনে হয় না যে ও ছাড়পত্রের কথা ভাবছে। ও ভাবছে মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি অথচ সেই সঙ্গে সপত্নীজ্বালা থেকে অব্যাহতির কথা। যশোবাবুর অন্তঃপরিবর্তন বলতে গোরী বোঝে তিনি তাকে মা হতে বাধ্য করবেন না, সে যদি মা না হয় তবু আরেকটি বিয়ে করবেন না। কিন্তু গোরী বিশ্বাস করে না যে সে অর্থে তাঁর অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। ঘটলে এই পর্যন্ত ঘটবে যে তিনি ওকে দেবীর মর্যাদা দেবেন। ওর উপর জোর খাটাবেন না। কিন্তু প্রত্যাশা খাটাবেন। প্রত্যাশা বিফল হলে পুনশ্চ বিবাহ। পুরুষের সে অধিকার আছে।

রত্নর মনে একটা খটকা বাধল। গোরী যদি মা না হয় ও যশোবাবু যদি আবার বিয়ে না করেন তা হলে দুজনের বোঝাপড়া এমন কী কঠিন যে সম্পর্ক-চ্ছেদ করতেই হবে? তা হলে মুক্তি মানে কী? বিবাহ থেকে মুক্তি নয় বোধ হয়। বিবাহ যেমন আছে তেমনি রেখে যশোবাবু যে অর্থে মুক্ত পুরুষ গোরীও সেই অর্থে মুক্ত নারী হতে চায় না তো? যশোবাবুর যেমন সুধা গোরীর কি তেমনি রত্ন?

চার জনের তাস খেলার উপমা একবার মনে এসেছিল। খেলায় জিতলে সুধাদি পাবেন যশোবাবুকে, রত্ন পাবে গোরীকে। এই ছিল সে খেলার পণ। এবার যখন সেই উপমা মনে এলো তখন তার মর্ম বদলে গেল। খেলায় জিতলে যশোবাবু পাবেন সুধাকে, গোরী পাবে রত্নকে। বিবাহ ব্যতিরেকে। রত্নের মনে খট করে বাজল। সে বিবাহ নামক প্রথাটায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু বিবাহিতা নারীর উপনায়ক হতে ঘৃণা বোধ করে। গোরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধের

ভিত্তি হবে গৌরীর কুমারীত্ব, তার কুমারত্ব। গৌরীকে তা হলে ছাড়পত্র নিতে হয় বা বিবাহ নাকচ করতে হয়। এ রকম জল্পনা মাস কয়েক আগেও শোনা যেত। কিন্তু ইদানীং তার স্বামীর সঙ্গে তার শিকারে যাওয়া ও ঘোড়ায় চড়ার সূত্রে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। খুব একটা বৈরীভাব নেই। তিনি তাকে লক্ষ্মীবাঈ হবার সুযোগ দিয়েছেন বলে সে কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ।

ওদের ওই চারজনের তাস খেলায় সুধাদির হাতের পাঁচ ছিল—"আমার ঘরদোর পড়ে রয়েছে, জায়গাজমি বারো ভূতে লুটে খাচ্ছে। আমি চললুম রে, যশো। চলি তবে, রানী বোন।" মাঝে মাঝে তিনি ওটা তুলে দেখাতেন আর অমনি দু'দিক থেকে রব উঠত, "না। না। তুমি যেয়ো না।" "তোর যাওয়া হতে পারে না।"

তেমনি রত্নর হাতের পাঁচ ছিল—"এখন থেকে আমরা আবার রাখীবন্ধ ভাইবোন। মোগল বাদশা আর রাজপুত রানী। ইতিহাসে অমর।" মাঝে মাঝে সে ওটার উল্লেখ করত আর অমনি আর্তনাদ উঠত, "তা হলে আমি মরে যাব।"

এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। রত্ন লিখল, "তুমি হবে লক্ষ্মীবাঈ আর আমি হব তোমার রাখীবন্ধ ভাই। দেশ স্বাধীন হবে। তুমিও স্বাধীন হবে। আমাদের দেখাশোনার দ্বার অবারিত। এই সম্পর্ক মেনে নাও তো আমি পরীক্ষার পর সোজা বেগমপুর গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই জন্মে কেন, এই মাসেই চার চোখ এক হবে, গৌরী বোন।"

গৌরী উত্তর দিল, "আমি তোমার পায়ে কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে বোন বলে ডেকে চরম শাস্তি দিলে! তুমি কি জান না যে ও ডাক আমার প্রাণদণ্ড! আমার মনে হলো আমি মূর্চ্ছা গেছি। ফিটের ব্যারাম আমার কোনো কালে ছিল না। এই প্রথম। রতন, অরূপ রতন, অভাগিনীকে আর কত পরখ করবে! পরখ করতে গিয়ে দেখবে নারীবধ করে বসেছ। রতন, মনের মতন, তুমি কেন আমাকে নিয়ে যাও না? হরণ করে নিয়ে যাও না?"

প্রভাতের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বাকী ছিল। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তার ঘরে গিয়ে তার পড়ার ব্যাঘাত করল রত্ন। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর প্রিয় প্রসঙ্গ উঠল।

দ্বিতীয় ভাগ

"তার পর? তুমি কি তোমার ও অধ্যায় শেষ করে দিয়েছ? না এখনো গৌর প্রেমে মাতোয়ারা?" প্রভাত বলল রহস্য করে।

"আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়?" রত্ন রঙীন হলো।

"কী মনে হয়, বলব? মনে হয় তোমার মুখে কেউ মুঠো মুঠো ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে। হোলি খেলেছে তোমার সঙ্গে। তুমি যার হৃদয় জয় করেছ তার মতো নারীরত্ন আমিও দেখিনি, তুমিও দেখবে না। কিন্তু ওর ভালোবাসা পাওয়া আর ওকে পাওয়া একই কথা নয়। ও যদি তোমাকে অমন আশা দিয়ে থাকে তবে না বুঝে দিয়েছে। আমার ওই বোনটির উপর আমার অগাধ স্নেহ, কিন্তু ওর সংসারজ্ঞান নেই।"

"কেন ও কথা বলছ?" রত্ন আশ্চর্য হলো।

"কেন বলছি? আচ্ছা, তুমিই বল। ভাগবতে ষোল হাজার গোপবধূর দৃষ্টান্ত আছে। তাঁদের মতো প্রেম আর হয় না। কিন্তু প্রেমের জন্যে তাঁদের একজনও কি কুল ছেড়েছিলেন? পদাবলীতে আমরা রাধার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। তিনিই প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ। তিনিও কি শ্যামের জন্যে কুল ছেড়েছিলেন? সেকালের শ্রীমতী যা পারলেন না একালের শ্রীমতী কি তা পারবেন? সেইজন্যে বলছিলুম আমার বোনটির সংসারজ্ঞান নেই।"

"ভাই প্রভাত, তুমি তা হলে আমাদের কী করতে বল? ওকে আর আমাকে?" রত্ন সুধাল অন্তরঙ্গ ভাবে।

"ভালোবাসতে। কিন্তু কামনা না করতে। কামনা থাকলে পূরণ না করতে।" প্রভাত বলল আরো অন্তরঙ্গ ভাবে।

রত্ন ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর প্রশ্ন করল, "এটা কি তুমি সংস্কারবদ্ধ বলে বলছ? না তুমি ভুক্তভোগী বলে বলছ?"

"না, ভাই। আমি সংস্কারবদ্ধ নই। আমি বিশ্বাস করিনে যে একটি মেয়ে একটি পুরুষের সঙ্গে নারায়ণশিলা সাক্ষী করে মন্ত্র পড়েছে বলে সেই সুবাদে চিরকালের মতো তারই হয়ে গেল। এমন কি পরকালেও। মানুষের ইহকাল পরকাল একরাত্রের একটি অনুষ্ঠানে নির্ধারিত হয়ে যায় না। স্বয়ং নারায়ণই

ষোল হাজার গোপবধূর সঙ্গে বিহার করে অন্য রকম সাক্ষ্য দিয়েছেন।” প্রভাত রঙ্গ করে বলল।

রত্ন আবার রঙীন হয়ে উঠছে লক্ষ করে প্রভাত তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরিয়ে দিল। বলল, “হৃদয়ের ভালোবাসা ও অঙ্গের কামনা দুই এক নয়। হৃদয়ের টান নাড়ীর টানের মতো আজীবন থাকে। যদি তাই নিয়ে তোমরা তুষ্ট হও তবে তোমাদের সুখ চিরন্তন হবে। আর যদি অঙ্গের কামনাকে তার সঙ্গে জড়াও তা হলে অঙ্গ যত দিন না জুড়ায় তত দিন জ্বলতে থাকবে। জল যেমন এক দিকে যেতে না পেলে আরেক দিকে গড়ায় আগুন তেমনি এক ইন্ধন না পেলে আরেক ইন্ধন পোড়ায়। কামনা থাকলে তাকে পাত্রান্তরিত করতেই হবে একদিন না একদিন। তোমাকেও, তাকেও। তা বলে প্রেম কেন পাত্রান্তরিত হবে?”

রত্ন স্তম্ভিত হলো। কিছু ক্ষণ মৌন থেকে বলল, “তোমার যুক্তি যদি যথার্থ হয় তবে প্রত্যেক পুরুষের দুটি করে নারী চাই আর প্রত্যেক নারীর দুটি করে পুরুষ। একটি হৃদয় ভরাতে। একটি অঙ্গ জুড়াতে। তা হলে তুমি একবিবাহ প্রচার কর কেন?”

প্রভাত অসঙ্কোচে বলল, “হৃদয় ভরাতেও নয়। অঙ্গ জুড়াতেও নয়। ঘরসংসার করতে। মা হতে। ছেলে মানুষ করতে। পরিবারের বাঁধুনি ঠিক রাখতে।”

“তা হলে এক একটি পুরুষের তিন তিনটি নারী? এক একটি নারীর তিন তিনটি পুরুষ? বহুবিবাহ না বহুবিহার— কোনটা তোমার লক্ষ্য?

রত্ন বিমূঢ় হয়েছিল। তাকে আরো বিমূঢ় করল প্রভাতের এই উক্তি— “আমার বক্তব্যের সারতত্ত্ব তুমি ধরতে পারনি, রতন। আমি একবিবাহেরই পক্ষপাতী। বহুবিবাহের নয়। বহুবিহারেরও নয়। আমার পরিকল্পনায় রামের গৃহিণী হবে শ্যামের প্রেমিকা আর হরির নায়িকা। শ্যামের গৃহিণী হবে হরির প্রেমিকা আর রামের নায়িকা। হরির গৃহিণী হবে রামের প্রেমিকা আর শ্যামের নায়িকা। তেমনি রাম হবে মালতীর স্বামী আর মাধবীর কামী আর মল্লিকার প্রেমী। শ্যাম হবে মাধবীর স্বামী আর মল্লিকার কামী আর মালতীর

প্রেমী। হরি হবে মল্লিকার স্বামী আর মালতীর কামী আর মাধবীর প্রেমী। তা হলে সকলেই সুখী। সকলেই সমৃদ্ধ। এক সেট ব্যবস্থায় যেটা কদাচিৎ সম্ভব তিন সেট ব্যবস্থায় সেটা সাধারণত সম্ভব।”

রত্নর মুখে চোখে আতঙ্কের লক্ষণ দেখে প্রভাত তাকে অভয় দিল। “অবশ্য আমি প্রস্তাব করব না যে তিন সেট ব্যবস্থা আমাদেরই দ্বারা প্রবর্তিত হবে। কালক্রমে আপনাআপনি বিবর্তিত হবে। সেকালে একই ব্যক্তি ছিল পুরোহিত ও বৈদ্য ও সৈনিক ও কৃষক। শ্রমবিভাগ ঘটে বৈদ্যকে করে দিল স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি। একালে বৈদ্য কত ভাগ হয়েছে, লক্ষ্য করেছ তো? দাঁতের ডাক্তার, চোখের ডাক্তার, কানের ডাক্তার, চামড়ার ডাক্তার, ফুসফুসের ডাক্তার। প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে এক একটি ডাক্তার। একজন আরেক জনের কাজ করবে না। যে যার নিজের কাজ করবে। তেমনি—”

রত্ন ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। এ শর্তে সে স্বামী হতে চায় না, কামী হতে চায় না, প্রেমী হতেও তার অরুচি। যে মেয়ে অন্যের গৃহিণী হবে রত্ন হবে তার প্রেমিক বা নায়ক! কক্ষনো না। যে মেয়ে অন্যের প্রেমিকা হবে রত্ন হবে তার নায়ক বা স্বামী! কক্ষনো না। যে মেয়ে অন্যেব কামিনী হবে রত্ন হবে তার স্বামী বা প্রেমিক! কক্ষনো না। স্বাধীন পুরুষ সে বহু নারীর সঙ্গে বহু প্রকার সম্পর্ক পাতাবে, যেমন বহু পুরুষের সঙ্গে। সেসব হলো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের। কিন্তু নরনাবী সম্পর্ক কেবল একজনের সঙ্গে একজনেরই। তেমন স্বাধীনতা নারীরও থাকবে। গোরীরও থাকবে।

প্রভাত তা শুনে বলল, “সে কি কখনো হয়! মেয়েমানুষ প্রথমে মেয়ে, তার পরে মানুষ। নারীর মধ্যে নারীত্বই প্রধান, ব্যক্তিত্ব অপ্রধান। তুমি যার সঙ্গে ব্যক্তি বলে বা মানুষ বলে সম্পর্ক পাতাবে সে-ই একদিন তোমাকে স্বামী বলে বা কামী বলে কল্পনা করবে। গোরী কি তা সহ্য করবে! করত, যদি গোড়া থেকে তুমি তিন সেট ব্যবস্থায় সায় দিতে। তার স্বামী অন্যজন, কামী অন্যজন, প্রেমিক শুধু তুমি। তা হলে তোমার কত বেশী স্বাধীনতা থাকত ভেবে দেখ। ঘর তো ওকে তুমি দেবে না। সংসারী হবে না তো। কেন তবে

বেচারিকে ঘরসংসার ছেড়ে পথে বেরোতে বলা! স্বাধীনতার জন্যে? কী হবে তেমন স্বাধীনতা দিয়ে? নারীর কাছে তার ঘরের নিরাপত্তাই সব চেয়ে বড়। যেমন পুরুষের কাছে তার জীবিকা। তার কেরিয়ার।"

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। রত্ন সংসারী হবে না, অথচ গোরী স্বাধীনা হবে। কেমন করে তা হলে তাদের সামঞ্জস্য হবে? গোরীর অসংসারিত্বে না রত্নর সংসারিত্বে?

রত্ন ভাবছিল। প্রভাত তার পরীক্ষার পড়া সরিয়ে রেখে নিচু গলায় গল্প বলতে বসল। এমন সব গল্প যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। আরব্য রজনীর মতো অশ্লীল, অথচ ভারতীয় রজনীর ঘটনা। যাদের সঙ্গে যাদের যোজনা তারা সবাই প্রভাতের চেনা মহলের। তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে আপোসে বা গোপনে। তাতে কোনো পক্ষই বঞ্চিত হয়নি। স্বামীরাও বদলি পেয়েছে। প্রেমিকরাও সংসারী হয়েছে। বিয়ে ভেঙে যায়নি। আবার ছাঁদনাতলায় যেতে হয়নি। রক্ষিতা হতে হয়নি। বন্ধ্যা থাকতে হয়নি। অথচ সন্তানের অঙ্গে কলঙ্কও লাগেনি! সব দিক রক্ষা হয়েছে। সকলেই সুখী।

রত্ন কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই। আমি চাই অবিভক্ত সমগ্র নারী। সেও পাবে অবিভক্ত সমগ্র পুরুষ। এই ভিত্তির উপর দাঁড়াবে পরিপূর্ণ নরনারী সম্পর্ক। শ্রমবিভাগ এ ক্ষেত্রে খাটে না। ওটা মিথ্যা লজিক।"

"অমন করে কাঁপছ কেন? শীত করছে? নাও, নাও, এই পশমিনাটা নাও। গায়ে জড়াও।" প্রভাত তার কাঁপুনির অন্য কারণ অনুসন্ধান করল না।

রত্ন জাঁকিয়ে বসল। সে জানত প্রভাতের মনের কোণে একটা কম্‌প্লেক্‌স ছিল। সেটা এক কথায় এই যে, শ্রদ্ধার পাত্রীকে সম্ভোগ করা যায় না, সম্ভোগের পাত্রীকে শ্রদ্ধা করা যায় না। একবার সে বলেছিল, "আমার গুরুজন যদি আমার বিয়ে দিতেন আর আমার বৌ যদি হতো সত্যিকারের দেবী তা হলে আমি তাকে সারা জীবন পূজা করে যেতুম, কিন্তু কোনো দিন তার গায়ে হাত দিতুম না। আমাকে দায়ে পড়ে আর কারো দিকে তাকাতে হতো যাকে আমি ভয় করতুম না, ভক্তি করতুম না, অসঙ্কোচে বিনা অনুমতিতে ভোজন করতুম।"

দ্বিতীয় ভাগ

শুনতে কালাপাহাড়ের মতো, কিন্তু আসলে এটা মান্ধাতার আমলের সংস্কার। এবং এটারই উপরে দাঁড়িয়েছে তার নিঃশ্বাস উড়িয়ে দেওয়া পরিকল্পনা। আগে ছিল দ্বয়ী। এখন হয়েছে ত্রয়ী। এর নাম সংস্কারমুক্তি নয়। প্রকৃত সংস্কারমুক্তি হচ্ছে কামনার পাত্রীকে শ্রদ্ধা করতে শেখা, শ্রদ্ধার পাত্রীকে কামনা করতে কুণ্ঠিত না হওয়া।

প্রভাত বলল, "আমি তোমার প্রেমে বাধা দিচ্ছিনে। আমার বক্তব্য হলো তুমি ওর সঙ্গে সীমা মেনে চলবে। ওর মধ্যে প্যাশন এত বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমরা তোমাদের বন্ধুরাই বাধা দেব।"

রত্ন চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলল, "আমার সাধনা হচ্ছে রসের সাধনা। সেই সঙ্গে রূপের সাধনা। রস থেকে আসবে রূপ। আমাকে রূপান্তরিত করবে। রূপান্বিত করবে। কায়া না থাকলে রূপ রাখব কোথায়? রূপ তো নিরাকার নয়। প্রতিমাপূজার পক্ষে সব চেয়ে জোরালো যুক্তি প্রতিমা না থাকলে রূপ রাখবার আধার থাকে না। কায়া থাকবে, তাতে রূপ থাকবে, এই পর্যন্ত যদি মেনে নাও তবে যার জীবন্যাস হয়েছে তেমন প্রতিমাকে তুমি লীলা করতেও দেবে। আমরা জীবন্ত প্রতিমা। তাঁরই প্রতিমা।"

"প্রেমকে তুমি অত সীরিয়াস ভাবে নিচ্ছ কেন? আর কেউ কি কোনো দিন প্রেমে পড়েনি? আমরা প্রত্যেকেই এক আধ বার এর ভিতর দিয়ে গেছি। যাওয়া ভালো। কিন্তু মাথা হারানো ভালো নয়। তোমার বাস্তববোধ নেই।" প্রভাত সস্নেহে অনুযোগ কবল।

"আমাব কাছে," রত্ন বলল তন্ময় হয়ে, "প্রেম হচ্ছে পূজা। এর চতুরঙ্গ উপচার। দেহ মন হৃদয় আত্মা কোনো একটি অঙ্গ বাদ পড়লে অঙ্গহানি। বিভিন্ন উপচার বিভিন্ন দেবতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না। পূজা যেমন একটি দেবতাও তেমন একটিই। আমরা যে যার দেবতা পেয়ে গেছি। আর খুজতেও চাইনে, হারাতেও চাইনে। সীমাবদ্ধ সম্পর্ক কেন? সীমার বাইরে কি আব কেউ আছে? মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসব ন কোই। ভক্তি আর প্রেম আর কামনা আর ভোগ সব ওই একজনকে ঘিরে। মীরার বেলা সে ছিল

পুরুষ। আমার বেলা সে নারী। সে যদি আমার হয় তো আর কোনো নারী আমার নয়। আমার না হয় তো আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। যা ছিল আমার পূর্বকল্পনা।"

প্রভাত খানিকটা মেনে নিয়ে বলল, "তোমার হতে পারে, কিন্তু তোমারই হবে এটা দুরাশা। ওর স্বামীব সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়। একজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না হলে যদি আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন না হয় তবে তুমি যা করতে চেয়েছিলে তাই কর। আরো পশ্চিমে চলে যাও। ওর মুক্তির দায় আমরা অন্যান্য বন্ধুরা নেব। বিবাহের কাঠামো ঠিক রেখে তার ভিতরে যতটা মুক্তি আঁটে ততটা মুক্তি ও আদায় করে নেবেই। ও কি সামান্য মেয়ে! ও রাধা কি দ্রৌপদী এ যুগে জন্মান্তর নিয়েছে।"

রত্নর মাথায় ঘুরছিল, 'ওর মধ্যে প্যাশন এত বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমবা তোমাদের বন্ধুবাই বাধা দেব।' এব একটা জুৎসই উত্তর হাতের কাছে খুঁজে না পেয়ে সে ভাবি অসহায় বোধ করছিল। তথ্যের সঙ্গে তো তর্ক করা চলে না। নাকাল হলে তথ্যকে যাবা উড়িয়ে দেয় রত্ন তাদের একজন নয়।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় প্রভাত তার আপন কাহিনী বলতে আবম্ভ করেছিল। বত্নর হোঁশ হলো যখন তখন শুনতে পেল প্রভাত বলছে, "সন্ন্যাসিনীকে ভগিনী বলে ডাকতে হয়। আমিও ডাকি। কী যন্ত্রণা বল দেখি! যদি ওকে বিয়ে করি—ওদের সঙ্ঘে তাব নজিব আছে--বিয়ের পবে ও আমার ঘবে আসবে না, ওকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। সঙ্ঘের মেয়ে সঙ্ঘেই থাকবে। ওটা ওদের সঙ্ঘের নিয়ম। দেবজন্ম হবে, অথচ তার জন্যে হরপার্বতীকে মিলতে দেওয়া হবে না।"

রত্ন গরম হয়ে বলল, "তা তুমি মরতে ওখানে প্রেমে পড়তে গেলে কেন?"

প্রভাত মুচকি হেসে বলল, "তার আগে তুমিই বল মেয়েবা সাধুসন্ন্যাসী দেখলে পতঙ্গের মতো ছুটে যায় কেন? গুবু গুবু করে পাগল হয় কেন?"

রত্ন কী যেন বলতে যাচ্ছিল, প্রভাত তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "সেদিন চোখে পড়ল টলস্টয় বলেছিলেন গোর্কীকে—'Not that a woman

is dangerous who holds a man by his . . . but she who holds him by the soul.' মাঝখানের ডটগুলো আমার নয়।"

শরমে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিল না। দুজনেরই মুখ শিমুল ফুলের মতো লাল। প্রভাত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। বলল, "যোগিনীর প্রেমে পড়ে আমাকে সারা জীবন যোগী হতে হবে দেখছি। নয়তো একজনকে ভালোবেসে আরেকজনকে বিয়ে করতে হবে। যা সকলে করে। রতন, তুমি হলে কী করতে? গোরী যদি যোগিনী হতো তুমি কী হতে?"

ওটা একটা চ্যালেঞ্জ। রত্ন ঘেমে উঠে বলল, "আমিও যোগী হতুম।"

"দূর মিথ্যুক! যার মধ্যে প্যাশন অত কম সে যোগী হতে পারে না। তার জন্যেও প্যাশন লাগে। গোরী ইচ্ছা করলে যোগিনী হতেও পারে, ভোগিনী হতেও পাবে। তুমি পার না। ও মেয়ে তোমাকে ভোগেও হারাবে, যোগেও হারাবে। ও যদি আর্টিস্ট বা ইনটেলেকচুয়াল হয় তা হলেও তুমি ওর কাছে হারো। রতন, কেবল একটি বিষয়ে তুমি জিততে পার। হৃদয়ভরা ভালোবাসায়। তোমার হৃদয়টি সোনা দিয়ে তৈরি। সোনালী হৃদয়। গোরী তোমার কাছে হারে তো ওইখানেই হারবে।"

রত্ন অভিভূত হয়েছিল। আবেগের সঙ্গে বলল, "আমি ওর কাছে সব বিষয়ে হারতে রাজী। ও আমাকে সর্বতোভাবে জিতে নিক। ওর নামেই আমার নাম হোক। চাঁদের মতো আমি হই সূর্যের আলোয় আলোময়। কান্তার রূপে কান্তিমান।"

প্রভাত তাব কানে টান দিয়ে বলল, "এসব কথা পুরুষের মুখে মানায় না। পুরুষের মতো পুরুষ হতে হবে তোমাকে। নয়তো মেয়েরা তোমাকে নামঞ্জুর করবে। গোরীও।"

আট

রত্ন তার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা মেলে দিল। তার পরীক্ষা শেষ হয়ে এসেছে। আর একটা দিন বাকী। তা নিয়ে ভাবতে হবে না। অনার্স সাবজেক্ট তো নয়।

রত্ন ও শ্রীমতী

তার চোখে ঘুম আসছিল না। জল আসছিল। এমন করে গৌরীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার জীবন যে ছাড়িয়ে নিতে বাধে। ছাড়িয়ে নেবার কথা ভাবতেই পারা যায় না। তার একমাত্র আশ্বাসনা যুগ্ম ইচ্ছা। গৌরীর বা তার একার ইচ্ছায় তো সব কিছু হতে পারে না। গৌরী যদি নীড় চায় ও সে চায় আকাশ তা হলে মাঝামাঝি একটা নীড়াকাশ কি সম্ভব হবে না? তেমনি গৌরী যদি যোগিনী হতে চায় ও সে চায় ভোগী হতে তা হলে কি মাঝামাঝি এমন কিছু নেই যা যোগও বটে ভোগও বটে? তার কেমন এক অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে সহজিয়ারা এইরূপ এক মধ্যপন্থার সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু এখন থেকে ও কথা ভাবা বৃথা। প্রথম পদক্ষেপ প্রথমে। রত্ন উঠে চিঠি লিখতে বসল। গৌরীকে।

মাঝ রাত্রে বিদ্যুৎ নিবে গেল। তখন মোমবাতি জ্বালাতে হলো। এক সময় মোমবাতিও নিঃশেষ। তখন আবার মোমবাতি। মোমবাতির পর মোম-বাতি। শিবরাত্রির জাগর চলল চৈত্রমাসের অন্য তিথিতে। দখিন হাওয়া এসে কেলি করে যাচ্ছিল আলোর শিখার সঙ্গে। মাঝে মাঝে নিবিয়ে দিচ্ছিল।

রত্নর মনে হতে থাকল তার দৃষ্টি খুলে গেছে। সে আগের চেয়ে অনেক বেশী দেখতে পাচ্ছে। তার বয়সের ছেলেরা কেউ অত দূর দেখতে পায় না। বিশ্বরহস্য কি পুঁথি পড়ে ভেদ কবা যায়! ভেদ করতে হয় দৃষ্টি দিয়ে। আর দৃষ্টির উপর থেকে পর্দা সরে যায় প্রেম যখন গৃহপ্রবেশ করে। অন্তরে ঘর করে।

রত্ন লিখছিল। লিখতে লিখতে লেখার কুহকে লিখে চলল –

আমার এ চিত্ত তোমার গৃহ। তুমি এ গৃহের গৃহিণী। প্রেমিকা তুমি। মানসী তুমি। আর কী তা আমি বলতে পারব না। গৌরী, জ্যোৎস্না-গৌরী, জানিনে তোমার মনে কী আছে। আমার মনে যা আছে তাও বলতে পারছিনে। ভাষা এখনো তত সুন্দর হয়নি।

আমি দিন দিন উপলব্ধি করছি যে ভাষা সৃষ্টি করতে হবে। প্রেমের ভাষা। যে ভাষায় প্রেম নিবেদন করবে দেশের তরুণতরুণীরা। সুন্দর

প্রেম। চতুরঙ্গ প্রেম। যে প্রেম সুধার চেয়েও স্বাদু। মধুর চেয়েও মধুর। যার অন্য নাম মধুর রস। সেই মধুর রসের জন্যে চাই মধুরতর ভাষা। মধুরতম ভাষা।

এটাও একটা কাজ। এই ভাষা সৃষ্টি করা। এ না হলে প্রেম বেশী দূর উড়তে পারে না, উঠতে পারে না। মানুষের প্রেম যে পাখীর প্রেমের চেয়ে এত দূরে এত ঊর্ধ্বে গেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের মুখের ভাষা। এ যদি পিছিয়ে পড়ে তবে প্রেম এগিয়ে যেতে বাধা পায়। সেইজন্যে এটাও একটা দরকারী কাজ। কাজের মতো কাজ।

আমাদের পরে যারা ভালোবাসবে তারা আমাদের ভালোবাসার ভাষায় ভালোবাসা জানাবে। সেইজন্যে এ ভাষা নিখুঁৎ হওয়া চাই। শুধু কি ভাষা নিখুঁৎ হবে? ভাষা যার বাহন সেও কি নিখুঁৎ হবে না? হবে বই-কি। ভালোবাসা নিজে নিখুঁৎ হবে। মধুর থেকে মধুরতর। মধুরতর থেকে মধুরতম। প্রেমের আস্বাদন যদি কোনো দিন মাধুর্য হারায় বা তাতে মাধুর্যের ভাগ কম পড়ে তবে ভাষা দিয়ে সে অভাব পূরণ হবে না, প্রিয়ে। সেইজন্যে আমাদের সদা সজাগ থাকতে হবে প্রেম যাতে ফুরিয়ে না যায়, হারিয়ে না যায়, পালিয়ে না যায়, তিতিয়ে না যায়, বিষিয়ে না যায়, পাতলা হয়ে না যায়।

তা বলে তাকে ধরে রাখতে বেঁধে রাখতে চাইব না আমরা। পারব না, যদি চাইও। একটি ভালোবাসার পক্ষে একটা জীবন কিছু নয়। সারা জীবন ভোর করে দিলেও ভালোবাসার অ আ ক খ সারা হয় না। আমার তো সবে হাতে খড়ি। আমার তো মনে হয় না যে তোমার কাছে আমার প্রেম শেখা কোনো দিন শেষ হবে। এ জীবনটা আমি তোমাকেই দিয়ে রেখেছি। যা তোমারই তাকে তুমি আলো বাতাসের মতো ভোগ করতে পাব। কিন্তু তাকে বেড়া দিয়ে দখল করতে গেলে ঠকবে। দরজা জানালা বন্ধ করে কি আলো বাতাস ভোগ করা যায়?

আমার দিক থেকে যা বলা হলো তা তোমার দিক থেকেও বলা। আমি তোমাকে সর্বতোভাবে পেলে ধন্য হব। কিন্তু তার জন্যে একটি বারও

বলব না। আজ প্রভাত আমাকে একটা নতুন সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন করল। শুনে হাসবে। বলল, "গৌরী যদি যোগিনী হতো তুমি কী হতে?" আমি তার মুখে মুখে জবাব দিলুম, "আমিও যোগী হতুম।" তার পর থেকে ভাবছি আর ভাবছি। ঘুম আর আসছে না। কত রকম সন্ধি ও সমন্বয়ের কল্পনা উঁকি মারছে। কিন্তু যতই ভাবছি ততই বুঝছি প্রভাতকে যে উত্তর দিয়েছি সে-ই যথার্থ।

আর আমি যদি যোগী হই তা হলে? এর উত্তর আমি দিতে পারিনে, দিতে পার তুমি। তুমি কী উত্তর দেবে তুমিই জান। যাই দাও সত্য করে দেবে। একবার দিয়ে পরে যদি বুঝতে পার যে ভুল হয়েছে তবে ভুল শুধরে দিয়ো। পরস্পরকে প্রতারণার মতো পাপ আর নেই। প্রেম কখনো প্রতারণা সইতে পারে না। কিছু দূর পর্যন্ত পারে হয়তো। বেশী দূর পর্যন্ত নয়।

ধোঁয়াব মতো অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করছি যে প্রেম একতরফা হতে পারে, সমস্ত বঞ্চনা সত্ত্বেও। পারে সারা জীবন। কিন্তু তার পাবিণতি রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি অপর পক্ষ সাড়া না দেয়। ঠিকমতো সাড়া না দেয়। পরিণতি দু'পক্ষের অপেক্ষা রাখে। দু'পক্ষের সাড়াব। ঠিকমতো সাড়ার। নয়তো ছন্দ কেটে যায়। সেই তো বিচ্ছেদের নিদান। বিরহকে ভয় নেই। বিচ্ছেদকে ভয়। প্রিয়তমে, বিচ্ছেদেরও ভয় নেই, যদি আমবা সাড়া দিতে থাকি, সাড়া পেতে থাকি—হোক না কেন সাত সমুদ্দুব তেবো নদীব পার থেকে।

রত্ন আরো কত কথা লিখত জমে যাওয়া চিঠিগুলির উত্তরে। কিন্তু তাব কানে এলো, "রতন, তোমার ঘরে তখন থেকে আলো জ্বলছে কেন, ভাই? পরীক্ষার পড়া এত কী বাকী আছে? আমি কি তোমার মনে কোনো বকম আঘাত দিয়েছি? আমার সেই পরিকল্পনাটার দোষ নয় তো? না প্রেমের সীমা-নির্দেশ করেছি বলে উত্তেজিত হয়েছ?"

রত্নর মনে বিঁধে রয়েছিল প্রভাতের সেই উক্তি—'ওর মধ্যে প্যাশন এত

বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমরা তোমাদের বন্ধুরাই বাধা দেব।' তার ঘুম না আসার সেটাই সব চেয়ে বড় কারণ। অথচ গৌরীকে সাত আট পাতা জুড়ে এত ক্ষণ ধরে যে চিঠি লিখেছে তাতে ও কথার আভাসটুকুও নেই।

দরজা খুলে দিল রত্ন। প্রভাত ঘরে ঢুকল না। প্রস্তাব করল বাইরে গিয়ে বসতে। শীত সামান্যই ছিল। তিন প্রহর রাত্রে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের ঘন ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আকাশ পারাবারের তটে বালুকণা গুনতে বসল দুই বন্ধুতে। খুঁজতে লাগল আপন আপন তারা।

প্রভাত বলল, "যার যেমন তারা তার তেমন ভাগ্য। আমি জ্যোতিষ না মানলেও এটা মানি যে নারীর প্রভাব ও পুরুষের ভাগ্য একসঙ্গে যায়। কে তোমার নারী, আমাকে বল। আমি বলে দেব, কী তোমার ভাগ্য।"

তাজ্জব! রত্ন বিশ্বাস করল না। তখন প্রভাত আবার বলল, "আমার ভাগ্য আমার জানতে বাকী নেই। আমার তারা হবে সন্ন্যাসিনী আর আমি হব ষোল আনা স্বাভাবিক মানুষ। যোগিনীর সঙ্গে ভোগীর প্রেম। দেবীপ্রতিমার পায়ের তলায় যেমন মহিষাসুর মূর্তি তেমনি আমার তারার দিকে নয়ন তুলে আমি। দেবী দেবীই থাকবে, দানব দানবই থাকবে, প্রেম প্রেমই থাকবে। থাকবে না শুধু সামঞ্জস্য। তার স্থান নেবে টেনসন। ভাই রতন, যোগে আর ভোগে স্বতোবিরোধ। সন্ধি হবে কোন শর্তে?"

রত্নরও সেই জিজ্ঞাসা। কোন শর্তে?

প্রভাত বলল, "যাক, তোমার কাছে এ প্রশ্ন গুরুতর নয়। কারণ তোমার তারা যোগিনী নয়।" তার পর কী মনে করে বলল, "তবু তোমার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তোমার তারা সুদূর। কে জানে কত কাল সুদূর থাকবে! তার মুক্তির পরেও কি তাকে তুমি পাবে? ডিভোর্স হিন্দু সমাজে অচল। তা হলে ঘুরে ফিরে সেই একই দাঁড়াল। যোগে আর ভোগে স্বতোবিরোধ। সামঞ্জস্যের পরিবর্তে টেনসন।"

"না, টেনসন কেন হবে! ও যদি যোগিনী হয় তবে আমিও যোগী হব।" রত্ন বলল অস্ফুট স্বরে। বোধ হয় বুকে আর মুখে অসহযোগ।

"আর ও যদি যোগিনী না হয়?" প্রভাত বলল অর্থপূর্ণ ভাবে।

রত্ন এর জন্যে তৈরি ছিল না। ঘাবড়ে গেল। প্রভাতের নীরবতাও অর্থ-পূর্ণ। রত্ন মুষড়ে পড়ল। প্রভাতের প্রশ্নের যত রকম উত্তর দিতে যায় কোনোটাই জুতসই নয়।

প্রভাত বলল, "তোমাদের কথা আমি যখন অবসর পাই ভাবি। কিন্তু কোনো মতেই তোমাদের মেলাতে পারিনে। মেলাতে গেলে দেখি উলটো বিপত্তি। সেইজন্যে তোমাকে নিরুৎসাহিত করি। ওকেও। কিন্তু ক্রমেই আমার প্রত্যয় হচ্ছে তোমাদের প্রেম সত্য। প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল তোমরা প্রেমের আইডিয়াটারই প্রেমে পড়েছ। অদেখা অচেনারও তো একটা মাদকতা আছে। একটু একটু করে বোধগম্য হচ্ছে তোমরা দু'জনেই খুব সীরিয়াস। তোমাদের মেলাতে পারলে আমি সুখী হতুম, কিন্তু সমাজ তো আমার হাতে নয়। হিন্দুরা বিধবাবিবাহে নিমরাজী হয়েছে, কিন্তু সধবাবিবাহে গররাজী হবেই। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে ডিভোর্স একদিন সম্ভব হবে ততঃ কিম্? তুমি তো বিবাহে বিশ্বাস কর না, সংসারী হতে চাও না।"

রত্ন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। মৃদু কণ্ঠে বলল, "গোরী যদি প্রস্তাব করে আমি ঠেলতে পারব না।" তার বুকের স্পন্দন কানে বাজছিল।

"দূর বুদ্ধু! মেয়েরা কি প্রস্তাব করে! প্রস্তাব করতে হয় পুরুষদেরই। কবে যে তুমি পুরুষের মতো পুরুষ হবে! গোরী যদি তোমাকে পুরুষ করে তুলতে পারে আমি তাকে সাত ভাই চম্পার তরফ থেকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবার প্রস্তাব আনব।"

এর পরে প্রভাতের মনে পড়ল সে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। "হাঁ, যা বলছিলুম। তোমরা কি সত্যি বিয়ে করবে! কর তো আমি তোমাদের বিয়ে দিতে পারি।"

রত্ন যেন আকাশ থেকে পড়ল। "কী করে? কী করে?"

প্রভাত তাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বলল, "ইসলামী মতে।" তার পর ভয় ভাঙাবার জন্যে বলল, "কেন? ভয় কিসের? এই তো আমাদের বাবুলাল মুসলমান। কে বলবে যে হিন্দু নয়! ধর্মে হিন্দু নয়, কিন্তু আর সব বিষয়ে

হিন্দু। হিন্দুর মতোই আচার ব্যবহার। আমরা সকলে ওর হাতে খাই। 'এ মল্লিক' যে মুসলমান ক'জন খোঁজ রাখে? 'কে মল্লিক' যে মুসলমান তা তুমিও কি জান? তেমনি 'আর মল্লিক' যে মুসলমান তা কেউ টের পাবে না। মিসেস মল্লিকের প্রথম নাম যে কী তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামাবে না।"

রত্ন ভেবে বলল, "তা নয়। আমি যে ভগবানকে নারীরূপে ধ্যান করি। নারীতে ভগবান দেখি। আমি যদি ইসলামে দীক্ষা নিই ওরা কি আমাকে আমার বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেবে? আর ও বেচারির দিকটাও ভেবে দেখতে হয়। ওর গৃহদেবতা মাধব ওর কাছে আমার চেয়েও প্রিয়। মাধবকে কি ও ছাড়তে পারবে? জোর করে ছাড়াতে গেলে আবার সেই বলপ্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে। মানুষের উপর মানুষ ফোর্স খাটাবে এখানে আমার মৌলিক আপত্তি। তা সে কায়িক অর্থেই হোক আর মানসিক অর্থেই হোক।"

প্রভাত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "তা হলে আমি নাচার। তোমরা কেউ সীরিয়াস নও। প্রেমে সীরিয়াস হতে পার। বিবাহে সীরিয়াস নও। বেশ, তবে হাত গুটিয়ে বসে থাক। আমি আগে কাউন্সিলে যাই। আইন বদলানোর জন্যে হৈ চৈ করি। তোমাকে ভরসা দিতে পারি যে আগামী নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির টিকিট নিয়ে আমি দাঁড়াচ্ছি। খোদ দেশবন্ধু আমাকে ভালোবাসেন। তিনি বেঁচে থাকতে আমাকে রুখবে কে? তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না, শুনছি। ভাবছি একবার দার্জিলিং গিয়ে দর্শন করে আসব। একটা চাকরির জন্যেও উমেদারি করতে হবে। ক্যালকাটা করপোরেশনে।"

রত্ন জানত না যে প্রভাত আর পড়বে না। চাকরি করবে। প্রভাত বলল, "ওরা যদি অনুমতি দেয় সন্ধ্যাবেলা ল কলেজে হাজিরা দেব। আইনের ডিগ্রী পাব। তার পর চাকরি ছেড়ে ওকালতী। ওকালতীতে দু'পয়সা হলে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হতে সাধ। আরে, ভাই! ব্যারিস্টার না হলে তোমাকে চিনবে কে! তোমার কথার দাম কী! দেশবন্ধু যদি ব্যারিস্টার না হয়ে মোক্তার হয়ে থাকতেন কি উকীল হয়ে থাকতেন তা হলে কি তাঁর এমন দেশজোড়া নাম হতো! তা যদি বল, সুভাষদা যদি আই সি এস না হয়ে ডেপুটি কি সাবডেপুটি হয়ে থাকতেন বা লেকচারার হয়ে থাকতেন তা হলে কেউ তাঁকে এত বেশী

সম্মান করত! দেশের লোকের দুর্বলতাগুলো ভালো করে অধ্যয়ন করতে হয়। তা যদি বল, তোমার মহাত্মা গান্ধী যদি ব্যারিস্টার না হয়ে ঝাড়ুদার হয়ে থাকতেন তা হলে কী হতো আমি লিখে দিতে পারি। ওই বিরাট ব্যক্তিত্ব কারো নজরে পড়ত না। ওকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে আবার সন্ন্যাসেরও দরকার ছিল। তা না হলে তিনি কি তিলকের চেয়ে জনপ্রিয় হতে পারতেন? ওটা ভারতের সনাতন দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। সন্ন্যাস চিরদিন এ দেশের মনোহরণ করে এসেছে।"

গান্ধীর সমালোচনা রত্ন সহ্য করতে পারত না। যদিও নিজে সমালোচনা করতে পেছপাও হতো না। তার ভাবখানা যেন এই যে, আমার আপনার লোকের দোষ আমি ধরব, তুমি ধরবার কে?

রত্ন টিপ্পনী কাটল, "ভারতের সনাতন দুর্বলতা তোমারও তো মনোহরণ করেছে।"

প্রভাত যেন ঠিক এই জিনিসটির প্রতীক্ষায় ছিল। আলোচনাটাকে ঠেলতে ঠেলতে সন্ন্যাসের দিকে নিয়ে আসা প্রকারান্তরে সন্ন্যাসিনীর দিকে নিয়ে আসা। মহিলাটির নাম সে কিছুতেই ফাঁস করবে না। বয়স? সমবয়সিনী। রূপ? অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী। গুণ? সর্বগুণান্বিতা। তবে তিনি সন্ন্যাস নিলেন কেন? সেইখানেই তো রহস্য। বোধ হয় তাঁর আকর্ষণ শতগুণ করার জন্যে। চিরন্তন করার জন্যে।

প্রভাত হাহুতাশ করে বলল, "আমার ভাগ্যে সুখ নেই। আমার তারা আমাকে সুখী হতে দেবে না। ওকে পেলে তো সুখী হব। তা হবার নয়।"

রত্নর মনে পড়ছিল অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রভাত তাকে কী পরামর্শ দিয়েছিল। মালাদি যদি তার প্রেমের প্রতিদান দিতেন, যদি তাকে বিয়ে করতেন, তা হলে বাকীটুকু তাঁর করুণা নয়, তার পৌরুষ। প্রভাতকে ও কথা মনে পাড়িয়ে দিতেই সে লাফ দিয়ে উঠল।

"কী সর্বনাশ! সন্ন্যাসিনীকে সন্ন্যাসভ্রষ্ট করা! পাপ হবে যে! অনির্মল নর যদি অঙ্গস্পর্শ করে দেবীপ্রতিমা কলুষিত হবে যে!" প্রভাত ত্রস্ত হয়ে বলল।

দ্বিতীয় ভাগ

"আর নির্মল নর যদি অঙ্গস্পর্শ করে?"

"তুমি যতই নির্মল হও না কেন অঙ্গস্পর্শ ব্যাপারটাই অনির্মল। আমি তো ওর মধ্যে শুচিতার নামগন্ধ পাইনে। বিবাহসত্ত্বেও না। মাতৃত্বসত্ত্বেও না। যা অশুচি তা অশুচি। গোবর ছিটিয়ে তাকে শুচি করা যায় না। ওটা মনকে চোখ ঠারা।"

রত্ন চেপে ধরল, "তা হলে মানতে হয় যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরাই ঠিক।"

প্রভাত কোণঠাসা হয়ে বলল, "সে বিষয়ে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খৃীস্টান একমত। ন্যায়ত আমারও সন্ন্যাসী হওয়া সংগত। কিন্তু আমি আধুনিক সভ্যতায় দীক্ষিত হয়েছি। নারী ও নর একসঙ্গে হাত না লাগালে এ সভ্যতার রথ চলবে না। সেইজন্যে আমি সন্ন্যাসের উপর খড়্গহস্ত। ভোগ বাদ দিলে এ সভ্যতার প্রায় সবটাই বাদ পড়ে। ভোগ বলতে কেবল সম্ভোগ নয়, শিল্প বিজ্ঞান স্থাপত্য বাণিজ্য সব কিছুই বোঝায়। আমি ভোগী হব। তুমি ভোগী হবে। দেশসুদ্ধ লোক ভোগী হবে। নইলে ভালো ঘরবাড়ী, ভালো আসবাব-পত্র, ভালো পোশাক, ভালো খাবার, ভালো ছবি, ভালো গান, ভালো যন্ত্রপাতির সমজদার থাকবে না, খরিদদারও জুটবে না। উৎপাদন লোপ পাবে। সভ্যতা দেউলে হবে।"

তারাভরা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রত্ন বলল, "ভাই প্রভাত, আমি তো ঐশ্বর্যের উপাসক নই। মাধুর্যের উপাসক। আধুনিক সভ্যতা বলতে যদি ঐশ্বর্য বোঝায় তা হলে তার শোভাযাত্রায় আমার স্থান কোথায়? আমি ওই আকাশের তারাদের দলে। ওই সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের। সপ্তর্ষি মণ্ডল ও অরুন্ধতীর।"

তার পর বলতে লাগল, "কাল অনুসারে আধুনিক হওয়া তো গুণ অনুসারে আধুনিক হওয়া নয়। গুণ অনুসারে আধুনিক হতে হলে ফোর্স জিনিসটাকে পরিহার করতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হবে স্বাধীন ও সপ্রেম। যত রকম মানবিক সম্বন্ধ আছে সব ক'টা হবে স্বাধীন ও সপ্রেম। আরো কত রকম সম্বন্ধ সৃষ্টি হবে। সেও হবে স্বাধীন ও সপ্রেম। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যদি বল দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হলো তবে ভদ্রবেশে আদিম পশুই রয়ে গেল।

তার হাতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। আর ভোগ-বিলাসের অশেষ উপকরণ তুলে দেওয়াও অপচয়কর। অমনি করেই এ সভ্যতা দেউলে হবে বা অপঘাতে মরবে।"

"তার পর," রত্ন আরো বলল, "কোনটা আদিম আর কোনটা এলিমেণ্টাল তা যদি আমরা খুঁটিয়ে না দেখি তা হলে ভুল করব। যাকে তুমি অশুচি ভাবছ তা এলিমেণ্টাল। নারীর সঙ্গে নরের সম্বন্ধ যদি বলবর্জিত হয়, যদি স্বাধীন ও সপ্রেম হয়, তা হলে কোনো অবস্থায় অশুচি হতে পারে না। প্রাণগঙ্গার গঙ্গোত্রী কি অশুচি হতে পারে? তা হলে প্রাণও অশুচি। এলিমেণ্টালকে আদিম বলে ভুল বোঝার ফলে এই কুসংস্কার।"

প্রসঙ্গটার পরিবর্তন করে প্রভাত বলল, "ও তোমাকে বড্ড ভালোবাসে। না, রতন?"

রত্ন যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বিশ্বাস করে বলল, "হাঁ, ভাই। মা'র মতো। মানে, তেমনি। মানে, মাত্রাতীত। অনেক ভালোবাসাই এ জীবনে পেলুম। কিন্তু এর মতো কিছু নয়।"

প্রভাত গদগদ ভাবে বলল, "ভালো। ভালো। সব ভালো। শুধু এক বাটি দুধে এক ফোঁটা ব্রাণ্ডি যদি না মিশত তা হলে আরো কত ভালো হতো! বুঝলে?"

রত্ন বুঝেছিল। বলল, "কেন? প্যাশন কি মন্দ?"

"মন্দ নয় তো কী! প্যাশন যদি একের দ্বারা তৃপ্ত না হয় অন্যের দিকে ছোটে। একাধিকের দিকে তাকায়। তার একনিষ্ঠতা নেই। অথচ প্রেম স্বভাবত একনিষ্ঠ। যা থাক কপালে সে একজনকেই বেছে নেয়। প্রেম বলে, আমার প্রিয়া যদি সন্ন্যাসিনী হয় তবে সন্ন্যাসিনীই শ্রেয়। আর প্যাশন বলে, শ্রেয় হলে কী হবে! প্রেয় নয়। সে তো তৃপ্তি দিতে পারে না। যে তৃপ্তি দেবে তারই সঙ্গ চাই।"

রত্ন ভেবেছিল প্রভাত তার নিজের পরিস্থিতি ব্যক্ত করছে। কিন্তু প্রভাত আরো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল। "প্যাশনের ভাষা সর্বত্র এই। নরনারী নির্বিশেষে।"

অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে রত্ন বলল কাঁপতে কাঁপতে, "ও যদি আমাকে

নিয়ে সুখী না হয় আমি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সরে যাব, প্রভাত। আমার মনে হয় প্রথম দর্শনেই তার আভাস পাব। তোমার কী মনে হয়?"

প্রভাত বলল, "হাঁ। প্রথম দর্শনেই তোমার ভাগ্যনির্ণয় হয়ে যাবে। তবে এ ব্যাপারে প্রথম দর্শনই শেষ কথা নয়। মিলনকামী নরনারী পরস্পরকে চেনে শুভদৃষ্টির লগ্নে নয়, ফুলশয্যার রাত্রে। আলোতে নয়, অন্ধকারে। মানুষের জগতে এই একটিমাত্র চেনা যা অন্ধকারের অপেক্ষা রাখে। যা সূর্যের আলোকে ভয় করে, চাঁদের আলোকে ভয় করে, তারার আলোকে ভয় করে। এমন কি দীপের আলোকেও ডরায়। যেখানে ধর্ম অভয় দিচ্ছে সেখানেও কেন এই ত্রাস? সেইজন্যেই বলি অশুচি। তুমি যাই বল না, ভাই রতন, আমি কিছুতেই স্বীকার করব না যে নরনারীর মিলন কোনো অবস্থায় শুচি হতে পারে। অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্র পড়াও মনকে চোখ ঠারা।"

"অথচ," প্রভাত এইপর্যন্ত মেনে নিল, "মনকে চোখ ঠারাও দরকার। মনটা একটা ইডিয়ট। কত সহজে ভোলে। এই যে আমি তোমার সঙ্গে এত তর্ক করছি, কখনো কি পারতুম আমার ওর সঙ্গে তর্ক করতে, যদি আজকের এই অন্ধকার রাত্রে তোমার বদলে ও বলত এই সব কথা? গন্ধর্বদের মতো প্রাণপণে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াতুম। দুজনে মিলে।"

রাত হয়ে যাচ্ছিল। দুই বন্ধুরই পরীক্ষা বাকী ছিল। উঠতে হলো অগত্যা। চলতে চলতে প্রভাত বলল, "একটা কথা আমি এখনো বুঝতে পারিনি। ওর চার দিকে এত পুরুষ থাকতে তোমাকেই কেন ওর পছন্দ হলো? তুমি কি পুরুষোত্তম? কী তোমার সিক্রেট? তোমার হৃদয়টি সোনালী। এই কি? তার জন্যে কি মেয়েরা সব সমর্পণ করে?"

রত্ন বিমূঢ় হয়ে বলল, "কী জানি! অত ভেবে দেখিনি। এক হতে পারে আমি ফ্রী ম্যান। আমি ওকে ডাক দিয়েছি মুক্ত আকাশের তলে। আমার প্রেম আউটডোর প্রেম। আমার জীবনটাও আউটডোর জীবন। আমি ঘরের মানুষ নই, চরের মানুষ। চরের মানুষ ঘর বাঁধে না। বাঁধলেও সে ঘর কাঁচা। আমি ঝড় জল আলো বাতাস আগুন বিদ্যুতের স্বজাতি। আমি ফ্রী স্পিরিট। মুক্তি বলতে ও এত দিন যা বুঝেছিল তা নেতিবাচক। বিযোড় থেকে মুক্তি। মনে

হয় এবার একটা কিছু ইতিবাচক বুঝেছে। যোড়ের মধ্যে মুক্তি। আমার বিশ্বাস বিধাতা আমাদের ষোড়ে ষোড়ে পাঠান। কে যে কার জুড়ি তা আবিষ্কার করতে হয়। মনে হয় ও ওর জুড়িটিকে আবিষ্কার করেছে। আমিও আমারটিকে।"

প্রভাত তার হাতে চাপ দিল। চাপটা বিদায় সূচক। বলল, "আমিও আমারটিকে।"

আবার কবে দেখা হবে কে জানে! তাই কথা যেন ফুরোতে চায় না। তার আগে রাত হয়তো ফুরোবে। প্রভাত পা বাড়ালে রত্ন তার সঙ্গে পা মেলায়। রত্ন ফিরতে গেলে প্রভাতও তার সঙ্গে ফেরে। ফিস ফিস গুজ গুজ চলতে থাকে।

রত্ন বলল, "আরেক হতে পারে অন্যের কাছে ও যা পেয়েছে তা প্রেম নয়, শেম। আমার কাছে যা পাবে বলে আশা করেছে তা শেম নয়, প্রেম। তোমার সঙ্গে আমার কোথায় মিলছে না, বুঝেছ? তুমি ধরে নিচ্ছ যে মিলনমাত্রেই শেম। অথচ অপরিহার্য। আমার বিশ্বাস তা নয়। গোরীর বিশ্বাস তা নয়। তা যদি হতো তবে ওর অন্য উপায় ছিল। নিরুপায়ের মতো ও আমার দিকে অমন একান্তভাবে তাকিয়ে রইত না। বাউলদের একটা গান আছে। শুনেছ বোধ হয়। লালন ফকিরের ভণিতা।

চাতকের এমনি ধারা
তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা
তবুও অন্য বারি খায় না তারা
মেঘের জল বিনে।

আমাকে পাগল করে দেয় যখন ভাবি যে মধুর রসের আস্বাদন পাবার জন্যে একটি কন্যা তৃষিত হয়ে চেয়ে আছে চাতকের মতো আমার দিকে। আর আমি কিনা দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াব বলে সংকল্প করেছি বৈশাখের মেঘের মতো।"

প্রভাত বলল, "একটি মেয়ের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানোতেই পৌরুষ বেশী। তোমার সংকল্প তুমি কেন ত্যাগ করবে?

ত্যাগ যদি করতে হয় ও-ই করবে ওর গৃহ। বৃহত্তর জীবনের জন্যে। ভাই রতন, তোমাকে শক্ত হতে হবে। আমি স্বীকার করি যে গোরীর মতো নারী আর হয় না, তোমার কাছে গোরীর প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। তা বলে তুমি কেন তোমার জীবনের পরিকল্পনা বিসর্জন দেবে? পুরুষ যদি তার কেরিয়ার বিসর্জন দেয় তা হলে তার জীবনে কাজ কী? মেয়েরা কেন যে এটা বোঝে না!"

পুরোনো তর্ক। রত্ন ওটার পাশ কাটিয়ে গেল। বলল, "আমার ভালোবাসা সসীম নয়। আমার ভালোবাসা নয় তেমন ভালোবাসা যে ভালোবাসা বলে, এত দূর পর্যন্ত, এর বেশী নয়। আমি হাতে রেখে ভালোবাসতে জানিনে। একজনকে ভালোবেসে আরেকজনের জন্যে কিছু হাতে রাখিনে। আমার ভালোবাসা সর্বস্ব পণ করে। কেরিয়ার তো তুচ্ছ। ভাই প্রভাত, গোরীর সঙ্গে আমার তাস খেলার স্টেক অত্যন্ত উঁচু। জিতলে সব কিছু জিতে নেব। হারলে সব কিছু হারাব। যায় যাবে জীবনের পরিকল্পনা।"

প্রভাত তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "তা বলে কালকের পরীক্ষায় ফেল করা চলবে না। যাও, শুয়ে পড় গে।"

ভোরের আগে রত্নর ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু কী এক অপরূপ অনুভূতি তাকে অনেক ক্ষণ অবধি আচ্ছন্ন করে রাখল। তার সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু নির্ণয় করার শক্তি ছিল না কিসের অনুভূতি। পরে যখন তার ভালো করে জ্ঞান হলো তখন মনে হলো প্রেম এসেছিল তার সমস্ত সত্তা ছেয়ে। ওই অব্যক্ত অনুভূতি প্রেমের অনুভূতি।

কিসের সঙ্গে ওর উপমা দেওয়া যায়? তার হৃদয় ভরে উঠেছে, ভারী হয়ে উঠেছে, ব্যথা করছে স্তনের মতো স্তন্য রসে। সেখানে ক্ষীর জমে গেছে, উপচে পড়ছে। কে সেই ক্ষীর টেনে নেবে? নিঃশেষে পান করবে?

গোরীকে তার মনে ছিল না। একটু একটু করে মনে পড়ল। আছে। আছে একজন যে তার ভরা বুক খালি করবে, ভারী বুক হালকা করবে, জমে ওঠা ক্ষীর নিঃশেষে আকর্ষণ করবে। তখন এ ব্যথা থাকবে না। এই উপচয়ের ব্যথা।

রত্ন ও শ্রীমতী

রত্নর মনে হলো তার কোনো অভাব নেই, অভাববোধ নেই। তার আছে ঐশ্বর্য। অপার্থিব ঐশ্বর্য। যা দিয়ে সে গোরীকে ধনী করে দিতে পারে। তার আছে মাধুর্য। অন্তরের মাধুর্য। যা দিয়ে সে গোরীর পিপাসা মেটাতে পারে। পরিবর্তে সে কিছু চায় না। তার কোনো কামনা নেই। সে পূর্ণ।

পরীক্ষা অবশেষে সারা হলো। শেষ খাতাখানি প্রহরীর হাতে সমর্পণ করে রত্ন চলে গেল গঙ্গার ধারে। সেখানে গা মেলে দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত চুপচাপ পড়ে থাকল। নদীর দিকে চেয়ে রইল অপলক নেত্রে। কাল থেকে দেখতে পাবে না পারাপারের দৃশ্য। তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল নুয়ে পড়া মাঝি দূরে থাকা নৌকার গুন টেনে। তার সামনেই হঠাৎ মাথা তুলে উঠছিল শুশুক। তক্ষুনি ডিগবাজি খেয়ে ডুব দিচ্ছিল। মেয়েরা ঘট ভরছিল। রত্ন নয়ন ভরে নিল।

সে রাত্রে গেট বন্ধ হলো না। সারা রাত মানুষের পায়ের শব্দ, ঘোড়ার খুরের শব্দ। হস্‌টেল ছেড়ে ছেলেরা বাড়ীর পথ ধরেছে। কে ফিরবে, কে ফিরবে না, এই তাদের একমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ। "রত্না, তুমি ফিরবে তো?" "না, ভাই।" বলতেও কষ্ট, শুনতেও কষ্ট। কে জানে হয়তো আবার দেখা হবে। "পুনর্দর্শনায় চ।"

রত্নও বেরিয়ে পড়ত সেই রাত্রেই। বেরিয়ে পড়ার গণ-উত্তেজনায়। কিন্তু তার মন পড়ে রয়েছিল পরের দিন সকালবেলার ডাকের উপর। গোরীর চিঠির আশায়। কী বন্ধন! কী মধুর বন্ধন! গোরীকে মুক্ত করতে গিয়ে রত্ন পড়েছে বাঁধা। আনন্দের সঙ্গে বাঁধা।

ঘুম আসছিল না। ঘুম যদি বা আসতে চায় রত্নই তাকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠেকিয়ে রাখে। গোরীর সঙ্গ আরো কিছু ক্ষণ পেতে চায়। ধ্যানে।

নয়

যাত্রার জন্যে রত্ন পা বাড়িয়ে বসেছিল। কিন্তু ন'টার আগে তো ডাক দিয়ে যাবে না। তত ক্ষণ যাত্রীদের যাত্রা দেখবে, না গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটবে? মনঃস্থির করা শক্ত। যাত্রা দেখারও একটা আকর্ষণ আছে।

দ্বিতীয় ভাগ

এমন সময় তার কানে এলো কে যেন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, "রত্নকান্ত মল্লিক। আছেন না চলে গেছেন?"

রত্ন চিনতে পেরেছিল কার গলা। রমেনদা তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আবার দেখা হলো তা হলে!"

"পরেও কত বার দেখা হবে।" রত্ন আশ্বাস দিল।

"তোমার পরীক্ষা চলছিল বলে তোমাকে বিরক্ত করিনি। কেমন পরীক্ষা দিলে? ভালোই? সাবাস। এবার কী করবে কিছু ভেবেছ?" এমনি কত কথার পর রমেনদা বলে বসলেন, "তুমি যদি বিনয় সরকারের মতো বিশ্বময় ঘুরে বেড়াও, দশ বছর পরে ফের, আমি কি তত দিন বেঁচে থাকব?"

"কেন? কেন? বেঁচে থাকবেন না কেন? কতই বা আপনার বয়স? আমি ফিরে এসে দেখব আপনি হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট হয়ে দিব্যি পসার জমিয়েছেন। যেমন মোটা পসার তেমনি মোটা আপনি। এখনকার মতো তালপাতার সেপাই নন।"

রমেনদার চোখে জল এসে পড়ল। কতকটা আপন মনে বলে ফেললেন, "তোমাকে আজ যদি না জানাই আর কবে জানাব? আমার মানসী নারী সাবিত্রী। যে নারী এক বছর বাদে বিধবা হবে শুনেও স্বয়ংবরা হয় আর যমের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধে জিতে অবিধবা হয়।"

রত্ন প্রথমটা ঠাহর করতে পারল না। তার পর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল। বলল, "রমেনদা, আপনি কি সত্যবান?"

তিনি হাসির ভাণ করে বললেন, "কেন? আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি এক বছর পরে থাকব না?"

"কেন থাকবেন না?" রত্ন ত্রস্ত হয়ে বলল, "আলবৎ থাকবেন।"

"কিন্তু জ্যোতিষীরা তা বলে না, ভাই। একজন নয়। একাধিক জন।"

"আমরা সাত ভাই চম্পার দল জ্যোতিষ মানিনে। ওরা আপনাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে যে শেষটা হয়তো ভয়ে ভয়েই আপনার দেহান্ত হবে। তখন ও বেটারা বলবে ওদের গণনা অভ্রান্ত। বেটাদের ফাঁসী হওয়া উচিত।" অহিংসা-বাদী বলে উঠল।

"বলেছ বেশ!" রমেনদা করুণ স্বরে বললেন, "কিন্তু বাংলাদেশের কন্যা-কর্তাদের কাছে ওদের লিখনই বিধাতার লিখন। আর কুমারীরা যদিও সাবিত্রীসমান হতে উপদেশ পায় তবু জ্যোতিষীদের সতর্কতাবাণী শুনে বৈধব্যের ভয়ে পেছিয়ে যায়। গরিবের মেয়ে। দেখতে ভালো নয়। তাকে যদি পছন্দের স্বাধীনতা দেওয়া হয় সেও পছন্দ করবে না আমাকে। সেও বিধবা হতে ভয় পায়। আর আমি জলজ্যান্ত মানুষটা যে মরে নাস্তিত্ব হয়ে যাব আমার দিকটা সে ভেবে দেখবে না।"

রমেনদার কণ্ঠস্বরে হতাশা। রত্ন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছিল না যে জলজ্যান্ত মানুষটা নাস্তিত্ব হয়ে যাবে বছর না ঘুরতে। ধর, তাই যদি হয় তবে কী হবে আরেক জনের জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে! তার চেয়ে মহাপ্রয়াণের জন্যে প্রস্তুত হওয়া শ্রেয়।

"তুমি যে বল মেয়েরা যদি পছন্দ করে বিয়ে করে তা হলে আর কোনো গোল থাকে না, কই, তা তো এখানে খাটছে না?" রমেনদা সমাজসংস্কারককে চেপে ধরলেন।

"কিন্তু, রমেনদা, কেন বেচারিদের পরীক্ষায় ফেলবেন? বিয়ে করে কাজ কী আপনার? যদি বাস্তবিক জীবনের আশা ফুরিয়ে এসে থাকে?"

"উঁহু। তা নয়। তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না, ভাই। সত্যবানের একমাত্র আশা সাবিত্রী বলে এ জগতে কেউ একজন থাকবে যে তাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে। বিধাতার লিখন রদ করবে। সেই সাবিত্রী কি আছে না নেই? সে কি কবিকল্পনা? তা হলে কেন মেয়েদের আশীর্বাদ করা হয়, সাবিত্রীসমান হও? তবে দুটি একটি মেয়ের নাম জানি যারা ডাক্তারের নিষেধসত্ত্বেও বাপ মা'র অমতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বৈধব্যের ঝুঁকি নিয়ে যক্ষ্মারোগীকে বরণ করেছে, বিয়ে করেছে। যমদূতকে বেশ কিছুকাল ঠেকিয়ে রেখেছেও। এরাই নারীরত্ন। এদের একজনের ভালোবাসা পেলে এ জীবনে আমারও আশা থাকত, ভাই।" রমেনদার আশা দুর্মর। তিনি এখনো আশা রাখেন।

'নারীরত্ন' শুনে গোরীকে মনে পড়ছিল রত্নর। গোরী কি রত্নকে সত্যবান জানলে সাবিত্রীর মতো ভালোবাসত, সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে ছিনিয়ে

নিয়ে আসত? কে জানে! কিন্তু রত্নর নিজের প্রেম যেন সাবিত্রীর সমান হয়, যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়, যদি তেমন কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে গৌরীর জীবনে। ভগবান না করুন।

আচ্ছা, সোনালী কি পারত না রমেনদাকে বাঁচাতে? তা হলে তো সোনালীও বাঁচত।' জ্যোতিষীদের মুখে ছাই পড়ত। সাত ভাই চম্পার মুখ উজ্জ্বল হতো।

রমেনদা তা শুনে রসিয়ে রসিয়ে বললেন, "রত্নভাই, তোমার প্রতিভা আছে। কী রকম একখানি যোজনা! অযোগ্যং অযোগ্যেন যোজয়েৎ! যে পুরুষকে কোনো নারী বরণ করবে না আর যে নারীকে কোনো পুরুষ গ্রহণ করবে না সেই নামঞ্জুর মানবমানবীর একজনের ব্যর্থতার সঙ্গে আরেক জনের ব্যর্থতা যোগ করলে যোগফল দাঁড়াবে একজোড়া সার্থকতা!" তার পর সস্নেহে বললেন, "আসলে তুমি চাও না যে তোমার ভাইবোনেরা কেউ অসার্থক হয় বা অসার্থক হয়ে অকালে ঝরে যায়।"

রত্ন অপ্রতিভ হলো। কিন্তু তার মন মানল না। তার স্থির বিশ্বাস রমেনদা যদি সোনালীকে বাঁচাতেন সোনালীও রমেনদাকে বাঁচাতে পারত। তাঁকে বাঁচতে দিচ্ছে না তাঁর সমাজভয়। সোনালী যে পতিতা।

"আচ্ছা, রমেনদা, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। সোনালীর হয়ে কথা বলবার অধিকার নেই আমার। তার চেয়ে বরং আর একটি মেয়ের নাম করতে পারি।" কিন্তু বলতে গিয়ে থমকে গেল রত্ন। অনধিকারচর্চা নয় তো!

"কে? কে? কার নাম?" রমেনদার নয়নদীপ দীপ্ত হয়ে উঠল।

"আপনি চিনবেন না। মালবিকা দেবী। মালাদি।" রত্ন জিব কাটল।

"নাম শুনিনি তো। তোমার আপন দিদি? এত বয়সেও বিয়ে হয়নি?"

"না, আপন দিদি নন। বিধবা। শিক্ষিতা। সদ্‌বংশীয়া। সচ্চরিত্রা। আমি তো ঘটকালিতে বিশ্বাস করিনে। নয়তো বলতুম রাজযোটক।"

রমেনদা ঘাড় নাড়লেন। "না, না। বিধবা মেয়েকে দ্বিতীয় বার বৈধব্যের শোক দেওয়া যায় না। বিধবারা এমনিতেই বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, জান তো। তেমনি বিধবারা ডরায় সিঁদুর দেখলে। আমার তো মোটে একটি বছর পরমায়ু। তোমার দিদি আমার মুখ

দেখেই মূর্চ্ছা যাবেন। ভাববেন এ তো সত্যবান নয়। এ যে সাক্ষাৎ যমরাজ!" হেসে উঠলেন রমেনদা। করুণ হাসি।

রত্নর মনে হলো এখানেও সেই একই বাধা। সমাজভয়। মালাদি যে বিধবা। রমেনদার সংস্কার বিমুখ। সংস্কারটা সমাজভয়ের নামান্তর। তাঁকে বাঁচতে দিচ্ছে না তাঁর সমাজের চিরাচরিত অত্যাচার। সবার উপর সমাজ সত্য!

রমেনদা যেতে না যেতে গৌরীর চিঠি এসে হাজির। বন্ধুর জন্যে দুঃখ-কাতর যার মন তার মেঘলা আকাশে রামধনু আঁকা হলো। কী আনন্দ! কী আনন্দ! জগতে মৃত্যু আছে, শোক আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেম আছে! প্রেম আছে! গৌরী লিখেছিল—

তোমার প্রেম আমাকে নিশিদিন ঘিরে রয়েছে, মোহন। সারাক্ষণ ঘিরে রয়েছে যেমন বায়ুমণ্ডল ঘিরে রয়েছে পৃথিবীকে। আমি তোমার প্রেমের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু বেঁচে থেকে কী হবে, মোহন! পানিমে মীন পিয়াসী। এত প্রেম আমাকে ঘিরে রয়েছে, তবু আমার পিয়াসা যায় না। আমার মতো দুঃখিনী কে! সুখিনীই বা কে!

মাণিক, তোমার চেয়ে তোমার প্রেম বড়। যে প্রেম আমাকে ঘিরে রয়েছে সে কি মানুষের প্রেম! সে বোধ হয় কোনো দেবতার! কিন্তু দেবতা তো তুমি নও। দেবতা হচ্ছে মাধব। তোমাকে আমি মাধবের স্থানে বসাতে পারিনে। বসালে অপরাধ হবে। অমঙ্গল হবে তোমার আমার দুজনারই। না, ধন, তুমি মাধবের চেয়ে বড় নও। মাধবের সমান নও। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে ঐ একটিই। মনুষ্যলোকে তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কেউ তোমার সমকক্ষ নয়। কিন্তু দেবলোকে মাধব। ঐ কষ্টিপাথরের বিগ্রহের সঙ্গে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওর সঙ্গে তুমি পারবে কেন? কিন্তু তোমার প্রেম তোমার চেয়ে বড়। প্রেম পারে ওর সঙ্গে যুঝতে। ও আমাকে ছাড়তে চায় না। তোমার প্রেম চায় আমাকে কাড়তে। এই অসম সমরে কে জিতবে? কে হারবে? ওগো তোমার প্রেম যেন জয়ী হয়। জয়ী হয় নিজের জোরে।

আচ্ছা, আমাকে তুমি গৌরী বলে আর কত কাল ডাকবে, বল তো?

দ্বিতীয় ভাগ

যে নামে আমাকে এত লোক ডাকছে সে নামে তুমিও যদি ডাকো তবে তোমার নিজস্ব কোনখানে? আমি যে তোমাকে অষ্টোত্তর শত নামে ডাকি। না ডেকে তৃপ্তি পাইনে। তুমিও কেন আমাকে অষ্টোত্তর শত নামে ডাকো না? শোন, যেখানে যত সুন্দর নাম দেখবে আমার জন্যে চুরি করবে। তাদের প্রিয়রা তাদের যে সব নামে ডাকে আমার প্রিয় তুমি আমাকে সেই সব নামে ডাকবে। আমিই তোমার অরুণা, অমিয়া, অশোকা, অনীতা। আমিই তোমার আভা, আশা, আলোকলতা। এমনি প্রত্যেক অক্ষরে এক বা একাধিক নাম। ই'তে ইলা, ইন্দিরা, ইন্দ্রাণী। ঈ'তে ঈশিতা। উ'তে উর্বশী, উমা। ঊ'তে ঊর্মিলা, ঊষা। ঋ'তে ঋতা। ঌ'তে কোনো নাম আছে কি? এ'তে এণা। ঐ'তে ঐন্দ্রিলা। ও'তে? ও'তে ওগো। ঔ'তে? ঔ'তে কী গো? ঔ'তে কী তা বলতে পার যাব তোমার সঙ্গ।

চিঠিখানি সুটকেসে ভরে রত্ন নাইতে গেল। গঙ্গায়। এই শেষ বার। তার বড় আশ্চর্য লাগছিল ভাবতে যে প্রতিমাভঙ্গকারীর সব চেয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী—কিনা মাধব বলে একটি বিগ্রহ, একটি প্রতিমা! একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা। আয়রনি অফ ফেট। কালাপাহাড়ের মতো তলোয়ার দিয়ে ওই মূর্তিটাকে খণ্ড বিখণ্ড করতে পারা যায়। কিন্তু তার ফলে গৌরীর হৃদয়টাও খণ্ড বিখণ্ড হবে। সে তার মাধবকেই একান্ত করবে। কান্তকে প্রত্যাখ্যান করবে। না, ফোর্স দিয়ে এর কোনো সমাধান হবে না। ফোর্স-এর সাহায্য নিলে রত্নর হার হলো। সে যে ফোর্স জিনিসটার বিরুদ্ধে।

খেতে বসে দেখা হয়ে গেল বিদ্যাপতির সঙ্গে। "কী আশ্চর্য! তুমি এখনো যাওনি!" রত্ন সুধায় বিদ্যাপতিকে। বিদ্যাপতি সুধায় রত্নকে।

বিকেলে ট্রেন। তার দেরি ছিল। বিদ্যাপতি প্রস্তাব করল, "চল দীঘা ঘাটে গিয়ে আচার্য ধ্যানচন্দ্রকে প্রণাম করে আসা যাক।" রত্ন রাজী হলো।

ধ্যানচন্দ্র অসহযোগের সময় কলেজের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। ক্রমেই তাঁর ছাত্রসংখ্যা কমে আসছে। তা বলে তাঁর আশাবাদে ভাঁটা পড়ছে না। তিনি আপনার ভিতর থেকেই উৎসাহ লাভ

করছেন। উৎসাহের উৎস তাঁর অন্তরে। বলেন, "আমরাই একদা নালন্দা বিক্রমশিলা প্রতিষ্ঠা করেছি। সে ক্ষমতা আমাদের হারিয়ে যায়নি, আছে। তা হলে ছাত্রেরা চলে যাচ্ছে কেন? এর উত্তর, ওরা নালন্দা বিক্রমশিলার ছাত্র নয়। পথ ভুলে এসেছিল, ভুল বুঝতে পেরে পিছু হটছে। ওরা চায় জীবিকা, ওরা চায় মর্যাদা। ওদের মধ্যে এমন ছেলেও আছে যে চায় জ্ঞানের জন্যে জ্ঞান। কিন্তু সাধক ওদের মধ্যে কোথায়? যারা সংসারের জন্যে নয়, সত্যের জন্যে উৎসর্গীকৃত।"

ধ্যানচন্দ্র বিদ্যাপতিকে বা রত্নকে পড়াননি বা পড়ান না। লোকমুখে তাদের সুখ্যাতি শুনে তাদের দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা গিয়ে আলাপ করে আসে। তার পর থেকে মাঝে মাঝে যায়, দুদণ্ড গঙ্গার ধারে বসে, আচার্যের সঙ্গে ভাববিনিময় করে। তাঁর বয়স এমন কিছু বেশী হয়নি। ত্রিশের কোটায়। মুখে সৌম্য শ্রী। চোখে স্নিগ্ধ আভা। কিছু ক্ষণ কাছে বসলে বোঝা যায় তিনি একজন সাধক ও সত্যিকার জ্ঞানী। কেবলমাত্র বিদ্বান বা মস্তিষ্কবান নন। রত্ন ও বিদ্যাপতি তাঁব দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে নেয়। আব তিনিও তাদের পেলে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন।

"বিদ্যাপতি আর রত্না। কোলরিজ আর শেলী। এস, এস। তোমাদের পরীক্ষা সারা হয়ে গেছে তা হলে?" এই বলে তিনি তাদেব ধবে নিয়ে গিয়ে পাটির উপর বসালেন ও বসলেন। সেইখানেই শোওয়া বসা। সেইখানেই খাওয়া। একটা নিচু ডেস্কে লেখাপড়া। ডেস্কেব তলায় দামী জিনিস রাখা। দেয়ালজোড়া বুকশেল্‌ফ্‌। তাতে বাজ্যেব বই। ইউবোপেব জ্ঞানবিজ্ঞানেব সঙ্গে তিনি অসহযোগ কবেননি। বলেন, "ইউবোপ তো আমাদেব জ্ঞান-বিজ্ঞানেব সঙ্গে অসহযোগ করছে না। জমিন আলাদা আলাদা। কিন্তু আসমান তো এক। আলোর সঙ্গে অসহযোগ? তা কি কখনো হয? আমাদের অসহযোগ আলোর সঙ্গে নয়, বিশেষ একটা সিস্টেমেব সঙ্গে।"

রত্ন ফিরবে না শুনে তিনি বিমর্ষ হলেন। বললেন, "বত্নাজী, অনেক কথা তোমাকে বলার ছিল। আবার কবে সুযোগ হবে, কে জানে। একটা কি দুটো বলি। মনে রাখবার মতো হলে মনে রেখো।"

দ্বিতীয় ভাগ

রত্ন ও বিদ্যাপতি উভয়ে অবধান করল। জানালার বাইরেই গঙ্গা। ছলাৎছল ছলাৎছল কানে আসছিল। কী মনোরম আবেষ্টন!

"তুমি একজন স্বাপ্নিক। বিদ্যাপতিও তাই। স্বপ্ন যদি দেখতে চাও তোমরা তবে বর্তমান কালের জন্যে দেখো। ভাবীকালের জন্যে নয়। ভাবীকাল হচ্ছে পরকাল। পরকালের স্বপ্ন দেখলে ইহকালকে অবহেলা করা হয়। মাত্র এইটুকুর উপর নজর রাখলে চলবে যে স্বদেশের উত্তরপুরুষকে তোমরা দায়বদ্ধ রেখে যাচ্ছ না। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ভুলটি করেছিলেন। আমাদের পরাধীনতা তো তাঁদেরই ভুলের পরিণাম। তাঁদের ভুল পরকালের খাতিরে ইহকালকে উপেক্ষা, পরলোকের আশায় ইহলোকের উপর অনাস্থা। উপনিষদে বলেছে, যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। যা এখানে তাই সেখানে। যা সেখানে তাই এখানে। তা.হলে কেন আমরা সেখানকার জন্যে ভেবে এখানকার কাজ কামাই করব? সেখানকার পালা তো একদিন আসবেই। এখানকার পালা কি আর আসবে? যখনকার যা তখনকার তাই নিয়ে আমরা থাকব। স্বপ্ন দেখতে হলে এখনকার স্বপ্নই দেখব। এই জীবনের স্বপ্ন। সামনের বিশ ত্রিশ বছরের স্বপ্ন।"

বিদ্যাপতি রত্নর দিকে রত্ন বিদ্যাপতির দিকে তাকাল। কী এর তাৎপর্য!

ধ্যানচন্দ্র এর পর একটু দম নিলেন। তার পর বলতে লাগলেন, "মনে রেখো, জীবৎকাল ছোট। যা করতে চাও অবিলম্বে কর। ভবিষ্যতের জন্যে চেয়ে থেকো না। কিন্তু কী করতে চাও সেটা আগে স্থির করে নাও। স্থির করতে যদি পাঁচ দশ বছর সময় লাগে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু স্থির করা অত্যাবশ্যক। রত্নাজী, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি পরমাত্মার কাছে যে যা চায় সে তা পায়। সেইজন্যে চাওয়া এমন বিপজ্জনক?"

"বিপজ্জনক!" বিদ্যাপতি বাধা দিয়ে বলল।

"হাঁ, ভাই। বিপজ্জনক। তুমি হয়তো এক ঘড়া মোহর চাইলে। পেয়েও গেলে এক ঘড়া মোহর। করবে কী সেই মোহর নিয়ে? তা তো তুমি ভেবে দেখনি। হঠাৎ বুক ফেটে মারা যাবে। নয়তো বেপরোয়া খরচ করবে। উড়িয়ে দেবে। নয়তো পুঁতে রাখবে, ডাকাতকে ডেকে আনবে। কেমন, ঠিক কি না?

সেইজন্যে বলি, চাওয়া এমন বিপজ্জনক। সব রকম চাওয়ার মধ্যেই বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। ভক্তরা তাই বলেন, আমি কিছুই চাইনে। এমন কি স্বর্গও চাইনে। আমি তোমাকেই চাই, হে কৃষ্ণ! হে রাম!"

ধ্যানচন্দ্র ভাবে বিভোর হলেন। রত্ন কান পেতে রইল। বিদ্যাপতিও তন্ময়।

"আমি কিন্তু তাও বলিনে। আমি কী বলি, শুনবে? আমি বলি, আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও। ব্যস্। এইটুকুই আমার প্রার্থনা।" এই বলে ধ্যানচন্দ্র অন্যমনস্ক হলেন। বোধ হয় মনে মনে জপ করছিলেন, তুমি আমাকে চাও, তুমি আমাকে চাও। আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও। হে কৃষ্ণ! হে হরি!

রত্ন ও বিদ্যাপতি অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকল। ধ্যানচন্দ্র তদ্গত ভাবে বসে রইলেন। বিদ্যাপতি কী ভাবছিল সে-ই জানে। রত্ন ভাবছিল গোরীর কথা। পরমাত্মাকে গোরীতে তর্জমা করে নিলে প্রার্থনার ভাষা এই রূপ শোনায়। "আমি কিছুই চাইনে। এমন কি স্বর্গও চাইনে। আমি তোমাকেই চাই, হে গোরী, হে প্রিয়া!"

না। তাও নয়। রত্ন মনে মনে বলল, "আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও, হে নারী, হে দেবতা!"

এর মর্ম কী তা অনুধাবন করে রত্ন। অতি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা। একটিমাত্র বাক্য। ছোট একটি সূত্র। কিন্তু এর মধ্যে নেই হেন কথা নেই। সেইজন্যে এই ভাষায় চাওয়া এমন বিপজ্জনক। যদি পায় তা হলেও পশতাবে। রত্নকে তাই মনঃস্থির করতে হবে। যত দিন মন স্থির হয়নি তত দিন কিছু চাইবে না। ভুল চাওয়ার চেয়ে না চাওয়া ভালো।

আচার্য অবশেষে মৌনভঙ্গ করলেন। বললেন, "বিদ্যাপতি, তোমাকেও কিছু বলার ছিল। তুমি অবশ্য ফিরে আসছ। আবার এ নিয়ে কথাবার্তা হবে।"

বিদ্যাপতি বলল, "তা হলেও শুনে রাখি।"

"তোমার বয়সের ছেলেরা সাধারণত কিসের অন্বেষণে জীবনযাত্রা শুরু করে? এক কথায় তার নাম ধন। কিন্তু ভারতের কোটি কোটি সন্তান যদি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ধনের অন্বেষণে বাহির হয় তবে সেই কি হবে আমাদের সাধনার স্বরাজ? স্বরাজের আমলে তাদের ক'জনের ভাগ্যে ধন জুটবে বা

জুটতে পারে? আমি একটি হিসাব তৈরি করেছিলুম আয়কর বিভাগের বন্ধুদের সৌজন্যে। যারা আয়কর দেয় ও যারা আয়কর ফাঁকি দেয় তাদের সংখ্যা সব জড়িয়ে বিশ হাজারের বেশী হবে না কিছুতেই। তা হলে নিম্নতম আয়কর দেবার সামর্থ্য জন্মাতে কোটি কোটি ভারতসন্তানের ক'শতাব্দী সময় লাগবে হিসাব করে দেখবে কি? স্বরাজ কি আলাদীনের প্রদীপ যে কয়েক শতাব্দীর কাজ কয়েক দশকেই সম্ভব হবে, ভাই? না আমরা কোটি কোটির জন্যে স্বরাজ চাইনে, চাই বিশ হাজারের জায়গায় বিশ লাখের জন্যে।" আচার্য উত্তর প্রত্যাশা করলেন।

রত্ন আশঙ্কা করছিল এই বার আসছে চরকা ও খাদি। ছিলও একটা চরকা ও ঘরে। কোটি কোটি ভারতসন্তানের মুখ চেয়ে দিনে আধ ঘণ্টা সুতো কাটতে বলা হবে তাদের। পড়েছে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। সুতো কাটতে হবে তাঁর সংগে এখনি।

উত্তরের জন্যে চেয়ে থেকে উত্তর না পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "তা ছাড়া কোটি কোটি লোক ধনের অন্বেষণ করবে এটাও তো ভালো নয়। কাম্য নয়। কেননা ধনের অন্বেষণ হচ্ছে এমন এক অন্বেষণ যার জন্যে অল্পবিস্তর আত্মবিক্রয় করতে হয়ই। যার জন্যে পরকে শোষণ করতেও হয় অল্পাধিক। তার সম্বন্ধে শেষ কথা যীশু খৃীস্ট বলে গেছেন দু'হাজার বছর আগে। কেউ কখনো দুই প্রভুর সেবা করতে পারে না। গড আর ম্যামন উভয়ের আরাধনা করা যায় না। দেশের কোটি কোটি লোক যদি ধর্মের অন্বেষণ না করে ধনের অন্বেষণ করে তবে ধন মেলে বই-কি। মেলে হয়তো দু'এক শতাব্দী পরে। কিন্তু ধর্ম রসাতলে যায়। ফলে মহতী বিনষ্টি।"

বিদ্যাপতি কী যেন বলবে বলবে করছিল, আচার্য অনুমান করে বললেন, "কাম্য যা তা সকলের পক্ষেই কাম্য। নয়তো কারো পক্ষেই কাম্য নয়। কোটি লোকের পক্ষে যা অকাম্য তোমার পক্ষেও তা অকাম্য। তোমার বন্ধুর পক্ষেও তাই। যে শিক্ষা তোমাদের কাম্যাকাম্য বিনিশ্চয় করতে না শেখায় সে কি শিক্ষা? তোমাদের মন পড়ে আছে লক্ষ্মীর পায়ের তলায়। আর করছ তোমরা সরস্বতী-পুজা। না, না, রত্নাজী, তোমাদের লক্ষ্য করে বলিনি। তোমাদের বয়সের

ছেলেদের কথা বলছি। ওরা সবাই সিদ্ধার্থ হবে। অর্থ বলতে ওরা বোঝে অর্থনীতি যাকে বলে অর্থ। আমার বিচারে ধন কথাটির অন্য মানে। স্নেহ, প্রেম, সৌহার্দ, সকলের প্রতি দরদ, ভগবানে বিশ্বাস, ভগবান না মানলে সত্যে বিশ্বাস, ন্যায়ে বিশ্বাস, জগতের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস, সরল প্রকৃতি, আভ্যন্তরিক বীর্য, কঠোর শ্রম করার শক্তি, অপরকে শোষণ করতে অনিচ্ছা, ধর্মভয়, বিবেক-বোধ, আত্মবলি দিতে প্রস্তুতভাব, আত্মবিক্রয় এড়াতে দারিদ্র্যবরণ—এইগুলিকেই বলি ধন। এ ধন যাদের আছে তাদের যদি বলি ধনী আর যাদের নেই তাদের যদি বলি দীনহীন তা হলে কি ভুল হবে, বিদ্যাপতি? ভুল হবে, রত্নাজী?"

আরো দু'চার কথার পর তিনি হাত যোড় করে বিদায় নমস্কার জানালেন। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকা এক্কায় উঠে বসল দুই বন্ধু। ঘোড়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। রত্নর মালপত্র আগে থেকেই চাপানো হয়েছিল। সে আর হস্‌টেলে ফিরবে না। সোজা স্টেশনে যাবে। মাঝ পথে নামিয়ে দেবে বিদ্যাপতিকে। ওর ট্রেন রাত্রে। ও যাবে দারভাঙগা। ওর বাড়ী।

"কি হে, কিছু বুঝলে?" দুলতে দুলতে প্রশ্ন করল বিদ্যাপতি।

"হাঁ। আচার্যজী আমাদের প্রার্থনার ভাষা ঠিক করে দিলেন। কাম্যাকাম্য বিনিশ্চয় শিখিয়ে দিলেন। মূল্যবোধ শুধরে দিলেন।" দুলতে দুলতে জবাব দিল রত্ন।

দশ

পরের দিন সকালে শেয়ালদা।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল ললিত ও কানন। রত্নকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো। কানন আরো আধ ফুট ঢ্যাঙা হয়েছে এই ছ'মাসে। আর ললিত হয়েছে আরো চোয়াড়ে। আরো নীরেট ও বলিষ্ঠ।

"আরে এ কে! এ যে সাক্ষাৎ রবি ঠাকুর!" পরিহাস করল ললিত।

"মাইনাস তাঁর দাড়ি।" সংশোধন করল কানন।

সেই যে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে পায়জামা ধরেছিল ও চুল ছেড়ে

দ্বিতীয় ভাগ

দিয়েছিল বিদ্যাপতি অঞ্জন ও রত্ন এত দিনে সেটা রত্নর নিজের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিল, কিন্তু খট করে চোখে ঠেকল ললিতের ও কাননের।

"ওহে রৈবিক, তুমি কি ওই পায়জামা পরে আমার পিসির বাড়ী উঠবে নাকি! তা হলে হাঁড়ি ফেলা যাবে যে! খাবে কী! তোমার সঙ্গে ধুতী থাকে তো চল ওয়েটিং রুমে গিয়ে ভোল ফেরাবে। ওহে কানন, আজকেই ওকে একটা হেয়ারকাটিং সেলুনে নিয়ে যেতে হবে। মেয়েলি চুল আমার অসহ্য।" কুলীর পিছন পিছন চলতে চলতে বলল ললিত।

"শুধু কি সেলুনে! আমার উপর হুকুম আছে ওকে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে ওর ফোটো তোলাতে। ওহে রাবীন্দ্রিক, তোমার জন্যে একজোড়া ফুল তোলা কার্পেটের জুতো আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। আমি তোমার জুতো বরদার হয়ে ললিতের পিসির বাড়ী যেতে পারব না কিন্তু। আমি বলি, তুমি আমার সঙ্গেই যাদবপুর চল। জ্যোতিদার দাদা ওখানকার অধ্যাপক। জান, রতন, বৌদি হচ্ছেন নরওয়ে দেশের মেয়ে।" কানন বলল উৎফুল্ল হয়ে।

রত্ন পড়ে গেল দোটানায়। ললিত আর কানন দু'জনেরই ইচ্ছা তাকে কাছে রাখা। সেও দু'জনকেই কাছে পেতে চায়। তা তো হবার নয়। সে ললিতের দিকেই ঝুঁকল। কারণ ললিতকে দিয়ে সে সুধাদিকে বলাবে, সুধাদি ঘটাবেন যশোবাবুর অন্তঃপরিবর্তন। তার থেকে ঘটবে গোরীর মুক্তি।

মির্জাপুর পার্কের গায়ে ললিতের পিসিব বাড়ী। উঠোনের চার দিকে চকমিলান। উপরে একটা জালির মতো। তা দিয়ে আলো হাওয়া নেমে আসে কুয়োর ভিতরে নামার মতো। তেতালা ছাড়িয়ে দোতালা অবধি পৌঁছয়। একতলাটা অন্ধকূপ। সেখানে দম বন্ধ হয়ে আসে। এ'রা কলকাতার একটি বনেদী পরিবার। এঁদের পূর্বপুরুষ জব চার্নকের আমলে কলকাতায় এসে জমি কেনেন। এখন সে জমি সোনার খনি। পিসেমশায় কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। তাঁকে বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতে পাওয়া যায় না। বাড়ীর মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা।

রত্নর স্থান হলো তেতালায় ললিতের ঘরে। অন্দর ঘেঁষে সিঁড়ি। কানে

আসছিল "বেশ ছেলেটি।" "ফ্লের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।" "আমাদের ক্ষেন্তির সঙ্গে মানাত কিন্তু।" "কি লো ক্ষেন্তি! বর মনে ধরেছে?"

পাশের ঘর থেকে সাফসুতরো হয়ে এসে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করল রত্ন। ভিতর থেকে বয়ে আনা হতে থাকল থালা থালা ফলমূল মিষ্টান্ন পেস্তা বাদাম কিসমিস খেজুর চা রুটি বিস্কুট। এর নাম প্রাতরাশ। এর পর কে একটি ছোট মেয়ে দৌড়িয়ে এসে রুপোর তবকে মোড়া সুগন্ধি পান দিয়ে পালিয়ে গেল। তারও মাথায় ঘোমটা। বয়স যদিও দশ কি এগারো। আড়াল থেকে কানে এলো, "বর কী বলল রে? পছন্দ হয়েছে তো?"

এর পর পিসিমার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো রত্নকে। মধ্যবয়সী মোটাসোটা গিন্নীবান্নি মানুষ। অতিরিক্ত ফরসা। আপাদ মস্তক অলঙ্কার। কিন্তু ওই একখানাই বসন। তার অনেকখানি লেগেছে ঘোমটা দিতে। রত্ন তাঁর পায়েব ধুলো নিতে হাত বাড়ালে তিনি তার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন।

বললেন, "এস, বাবা, বস। তোমাকে দেখব বলে ব্যাকুল হয়ে রয়েছি। ললিতের কাছে তোমার নাম প্রায়ই শুনি। ও তোমাকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসে। আমার কাছে তোমরা দু'ভাই এক মায়ের পেটের ভাই। আমাদের এই গরিবের বাড়ীতে তোমার অবশ্য খুবই কষ্ট হবে। তা হলেও তুমি তোমার যত দিন খুশি থাকবে। তুমি যত বেশী দিন থাকবে আমবাও তত বেশী খুশি হব। তোমাকে আলাদা একখানা ঘর দিতে পাবছিনে বলে লজ্জায় মরে যাচ্ছি, বাবা। নিচের তলা কি তোমার যোগ্য!"

পিসিমাকে রত্ন অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার করে নিল। এ বিষয়ে তার একটা সহজাত দক্ষতা ছিল। ললিত তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার সময় রসিকতা করল, "আমাকে কি তুমি সর্বস্বান্ত করবে?"

"কেন, বল তো?"

"যার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই তাকেই তুমি আপনার করে নাও। তখন আমাকেই সে পর মনে করে। তোমাকে আপন।"

দ্বিতীয় ভাগ

এটা কিন্তু ঠিক পরিহাসের মতো শোনাল না। শোনাল আক্ষেপের মতো। রত্ন বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে বলল, "ওটা তোমার ভুল। তুমি বড় অভিমানী।"

ললিত কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, "আমার মনে সাধ ছিল তোমাকে আমাদের দেশের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু ভরসা হয় না। সাবু হয়তো গৌরীর মতো আমাকে পর করে দেবে।"

গৌরীর নাম উঠতেই রত্নর মনে পড়ল যে আজ ও মেয়ের চিঠি আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে সে উতলা বোধ করল গৌরীর হাতের কার্পেটের জুতো জোড়ার জন্যে। ওই যেন তার লিপি। তার প্রণয়লিপি।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গল্প করতে বসল দুই বন্ধুতে। রত্ন বলল, "তোমার বিয়েতে যোগ দিতে পারিনি বলে আমি সত্যি খুব দুঃখিত। জান তো, আমি প্রেমহীন বিবাহ সইতে পারিনে। আমাকে ক্ষমা কোরো, ভাই।"

"ক্ষমার প্রশ্ন উঠলে তো?" ললিত তাকে অভয় দিল। "আমার বিয়েতে আমারই কি যোগ দিতে ইচ্ছা ছিল? প্রেমহীন বিবাহ বলে নয়। অন্য কারণে।"

এই বলে সে তার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করল। সাবুর সঙ্গে তার বিয়ে গৌরীরই নির্বন্ধে। গৌরী বলে যশোবাবুকে। যশোবাবু বলেন ডোমকলের কুঠিয়াল সাহেবকে। কুঠিয়াল সাহেব বলেন পুলিশ সাহেবকে। পুলিশ সাহেব বলেন ললিতের বাবা লালাবাবুকে। লালাবাবু ছেলের আন্দামানযাত্রার ভয়ে সরাসরি সম্মতি দেন, তার ফলে ললিত বেকসুর ছাড়া পায়। বাড়ী গিয়ে শোনে তার বিয়ে। ভিতরের খবর কেউ তার কাছে ভাঙে না। ভাঙলে সে হয়তো আবার জেলে যেত।

বিয়েটা চোখ বুজে করে ফেলার পর সে ভেবেছিল পুনরায় বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে দেশোদ্ধার করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। যার কাছে যায় সে-ই বলে, "তোমাকে বিশ্বাস নেই। পুলিশ তোমার বিয়ে দিয়েছে। তুমি গবর্নমেণ্টের জামাই।" সে প্রতিবাদ করে, কিন্তু অভিযোগটা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। বিয়ে করলে খালাস পাবে এ রকম একটা কথাবার্তা হয়েছিল তার গুরুজনের সঙ্গে সাহেবদের। তাঁদের প্রত্যাশাও ছিল যে বিয়ের পর সে বৌ

নিয়ে ঘরসংসার করবে। জান নিতে জান দিতে জোর পাবে না। পোষ মানবে। পোষ মানা পলিটিক্‌স করবে।

"এখন আমি করি কী!" ললিত বলল কাতর কণ্ঠে। "কে আমাকে বিশ্বাস করে বিপ্লবী দলে নেবে। বাংলাদেশের বিপ্লবী সম্প্রদায় আমার মুখ দর্শন করবে না। বাংলার বাইরেও কি আমার ঠাঁই হবে! দু'দিন বাদে ওরাও টের পাবে। টের পেয়ে চর বলে আমাকে গুলী করবে! চিরকালের মতো আমার মুখ পুড়ে গেছে। তাই তো দিন দিন আমার চেহারা হনুমানের মতো হচ্ছে।"

রত্ন ব্যথা বোধ করছিল। বেচারা ললিত! সে এখন করবে কী! কোন কাজে লাগবে! নিজে বিপ্লবী না হলেও রত্ন বিপ্লবীদের অন্তর বুঝত।

"এর জন্যে—এই ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী কে?" ললিত গর্জে উঠল।

রত্ন প্রমাদ গনল। অন্তরাল থেকে সবাই শুনতে পাবে নাম।

"এই ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী কে? তোমার জন্যে যিনি পাদুকা রচনা করেছেন। একেই বলে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ!" ললিত ধীরে ধীরে সুর নামিয়ে আনল।

রত্ন আঘাত পেয়ে তাকিয়া চেপে ধরল। কোন মুখে প্রতিবাদ করবে।

"অনেক দিন থেকে আমি সুযোগ খুঁজছি। তোমাকে বলব তোমার ভাগ্যদেবীর কীর্তি। তোমাকে ঈর্ষা করি বলে নয়। তোমাকে ভালোবাসি বলে। তুমি আমার প্রিয়। বিশ্বাস কর, সেও আমার প্রিয়। বলতে পারতুম প্রিয়া। কিন্তু তা হলে তুমি বেদনা পেতে।"

রত্ন এটা অনুমান করেনি। চমকে উঠল। পাঁশুটে হয়ে গেল তার মুখ।

"কী করে জানব, বল, যে তুমি আসবে ওর জীবনে? জানলে কি আমি ওর প্রেমে পড়তুম? শুধু কি আমি? আরো কত ছেলে ওকে ভালোবেসেছে। এমন কি, জ্যোতিদাও। তাঁর মতো স্থিতপ্রজ্ঞ সাধুপুরুষও। আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওর পুরুষকে ভালোবাসাবার। কেবল কি পুরুষকে? নারীকেও।" ললিত বলল চাপা গলায়।

রত্ন উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বাধা দিল না। ললিত বলে গেল, "তোমার পরিচয় দিয়েছিলুম সোনালীর কথা ভেবে। তখন তো

দ্বিতীয় ভাগ

স্বপ্নেও ভাবিনি যে পরিচয় পরিণত হবে প্রেমে। রত্ন, তোমার প্রথম চিঠি যেদিন এলো আমি ওর কাছে উপস্থিত ছিলুম। ও তোমার চিঠি পড়ে এমন অভিভূত হলো যে কথা বলতে পারল না। ওর মুখে নতুন এক আলোর উদয় হলো। চিঠিখানা ও আরেক বার পড়ল। তার পর আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি পড়ে দেখলুম সবই আমার জানা কথা। নতুন আলো কোথায়! কিন্তু ওর সেই ভাবাবেশ কাটল না। কয়েক সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখি ওর জাগরণ ঘটেছে। ও পুষ্পিতা হয়েছে। প্রেমের জোয়ার এসেছে ওর জীবনে। তখনো বুঝতে পারিনি যে তুমিই ওর সোনার কাটি। পরে শুনলুম জ্যোতিদার কাছে। জ্যোতিদার কাছে ও হৃদয় খুলে দেখায়। ওর কিছু গোপন নেই ওই একটি মানুষের কাছে। জ্যোতিদাকে ও পুরুষ বলে গণ্য করে না। কিন্তু আমাকে গণ্য করে।"

একটু দম নিয়ে ললিত আবার বলে চলল, "আমি অভিমানী মানুষ। জেলের সড়ক ধরলুম। পৌঁছে গেলুম জেলে। ওরও সাধ ছিল জেলে যেতে। কিন্তু ইংরেজের বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। বন্দুক বাজেয়াপ্তির ভয় দেখিয়ে ফৌজদার বংশকে হাত করল। ওরা ওকে এমন বোঝান বোঝাল যে ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ভোজ দিয়ে আপ্যায়িত করল। ঘরের বৌ ঘরে রইল, মালখানার বন্দুক মালখানায় রইল, ধরা পড়ল কিনা ওর মণ্ডলীর জনকয়েক হতভাগা বিপ্লবকর্মী। তাদের মধ্যে আমি। ওর হতাশ প্রেমিক। আমার দ্বীপান্তর হতে পারে শুনে ওর মাথায় ঢুকল যেমন করে হোক আমাকে বাঁচাতেই হবে।"

রত্ন অধীর হয়ে বলল, "তার পর?"

"তার পর যা হলো তা তোমাকে আগেই বলেছি। কিন্তু তার তাৎপর্য বলিনি। সাবু হচ্ছে আমার কনসোলেশন প্রাইজ। ওই নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। আসল প্রাইজ আমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে।" ললিত বলল রহস্যময় ভাবে।

রত্ন তার বন্ধুর হাতে চাপ দিয়ে বলল, "যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন সাবুকে সুখী কর। শুনেছি সে তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে।

সে কেন দুঃখ পাবে? একজনের ট্র্যাজেডীকে দু'জনের হতে দিয়ো না। প্রকৃতিস্থ হও।”

“সব বুঝি, ভাই। সমস্ত বুঝি। সাবুর প্রেম পেয়ে আমি ধন্য। তাকে সুখী করতে পারলে ধন্য হব। কিন্তু ভালোবাসা কি অত সহজে পাত্রান্তরিত হয়? কেমন করে আমি একটি নারীকে ভালোবাসব, আরেকটি নারীকে আদর করব? সাবুকে আমি ঠকাতে পারব না। ওর কাছে আমি তিন বছর সময় চেয়ে নিয়েছি। এই তিন বছরে আমার ভালোবাসা পাত্রান্তরিত হবে। কী জানি কখন কী হয়ে যায়, সেইজন্যে দূরে দূরে থাকি। আরো দূরে চলে যেতে চাই। জাপান কি আমেরিকা।”

রত্ন বলল, “ভাই ললিত, তোমার পথের কাঁটা হব জানলে আমি গোড়া থেকেই সাবধান হতুম। এখন যে বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে, ভাই। কী আমি করতে পারি যাতে তুমি সুখী হও? দেশান্তরী হব?”

“না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। গোরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেটে গেছে। সাবুর সঙ্গেই আমার যা কিছু সম্পর্ক। তবে তোমাকেও একটা কথা বলে রাখি। গোরী যাকে খুঁজছে সে পুরুষোত্তম। তুমি যদি তা হয়ে থাক তবে তোমার মধ্যেই তার সন্ধান সমাপ্তি পাবে। যদি না হয়ে থাক তবে তোমার কপালেও আছে সান্ত্বনা পারিতোষিক।”

রত্ন শিউরে উঠল। বলল, “কার সঙ্গে ও আমার বিয়ে দেবে?”

“আছে ওর হাতে কয়েকটি রাঙা টুকটুকে মেয়ে। কিন্তু যা বলছিলুম। ওর স্বামীর সঙ্গে ওর নৈশ যুদ্ধের আদত কারণ হলো এই। তিনি নন পুরুষোত্তম। তিনি নন বীর। ও হবে বীরভোগ্যা। আর কারো কাছে ও আত্মসমর্পণ করবে না। অন্য যত কারণ সব গৌণ। প্রেমহীন বিবাহ দিতে ওর একটুও বাধল না। ও কিসের বিদ্রোহী!”

“ঠিক প্রেমহীন তো নয়। সাবু ভালোবাসত যে! যাক গোরীর স্বামী পুরুষোত্তম কি না বলতে পারব না। কিন্তু তিনি ওর কাছে পরপুরুষ। ওর বিয়েটা বিয়েই নয়।”

দ্বিতীয় ভাগ

এই বার বোঝা গেল গৌরী কেন বলেছিল ললিত প্রতিক্রিয়াশীল। সে বলল, "দূর! বিয়ে কখনো বিয়ে না হয়ে পারে! স্বামী কখনো পরপুরুষ হতে পারে!"

রত্ন সরাসরি সুধাল, "কেন? বিবাহভঙ্গে তোমার আপত্তিটা কিসের?"

ললিত টাল সামলাতে সময় নিল। বলল, "ওঃ। প্রতিমাভঙ্গ থেকে তুমি বিবাহভঙ্গে পৌঁছেছ! যার মানে পরিবারভঙ্গ!" সে যে অনুমোদন করে না তা স্পষ্ট।

"আচ্ছা, গৌরী যদি আমাকে ভালো না বেসে তোমাকে ভালোবাসত তা হলে শেষপর্যন্ত বিবাহভঙ্গ না করে আর কী করত?" রত্ন ললিতকে চেপে ধরল।

"সেই ডাক্তারকে নিয়ে যা করত।" ললিত পিছলে গেল।

"কী করত! কী করত!" উত্তেজনায় কাঁপতে থাকল রত্ন।

"ইলোপমেণ্ট।" ললিত বলল ফিস ফিস করে। মৃদু হেসে।

রত্ন এর জন্যে তৈরি ছিল না। তার মাথায় বাজ পড়ল। শাদা হয়ে গেল তার মুখ। ললিত তা লক্ষ করে তাকে ঝাঁকুনি দিল। সে যে কী ভাবছিল তা সে-ই জানে। সে যে ভয় পেয়েছিল তা প্রত্যক্ষ।

এর পরে চাকর এসে তেল মাখিয়ে দিল। স্নান করিয়ে দিল। অন্দর থেকে ডাক পড়ল পিসেমশায়ের সঙ্গে বসে খেতে। সে এক এলাহি কান্ড। অতগুলো পদ সে কোনো দিন চোখে দেখেনি। চেখে দেখা তো দূরের কথা। পাখা হাতে পাশে বসেছিল স্বয়ং ক্ষেন্তি। মাথায় ঘোমটা। সে-ই যেন রত্নর প্রোপ্রাইটর। কানে আসছিল, "ওলো ক্ষেন্তি, বর যে হাত গুটিয়ে বসে রইল। কিছুই যে মুখে দিল না।"

ভোজনের পর বিশ্রাম। রাত্রে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। হাই তুলতে তুলতে রত্ন কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে ঘুমতে দিচ্ছে কে? বাড়ীর মেয়েরা চক্রান্ত করে ললিতকে পাঠিয়ে দিলেন কী একটা কাজে। ঘরে ঢুকল রত্নর হতে ইচ্ছুক শ্যালিকার দল। চন্দন দিয়ে কুঙ্কুম দিয়ে তাকে চিত্রবিচিত্র করা হলো। কেউ একটু হলুদ ছুঁইয়ে দিয়ে গেল। কেউ ঠেকিয়ে দিয়ে গেল চুয়া। কেউ বুলিয়ে দিয়ে গেল পাউডার। কেউ মাখিয়ে দিয়ে গেল ক্রীম।

কামানো গোঁপে যখন রং লাগানো হচ্ছে তখন রত্নর ঘুম ছুটে গেল। সে চোখ মেলে চাইতেই মায়াকন্যারা কোথায় মিলিয়ে গেল।

প্রবেশ করলেন শুভ্রকেশা শুভ্রবেশা ঠানদি। রত্ন ধড়মড় করে উঠে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। তার পর আসন নিলেন।

"এলুম নাতজামাইকে দেখতে। ওরা বলছিল পায়জামা পরা মোচনমান। মোচনমান তো নুর কোথায়?" এই বলে তিনি থুতনিতে হাত দিয়ে একটু নাড়লেন।

সকালবেলার মতো ভিতর থেকে আসতে থাকল থালায় থালায় লুচি মাংস গলদাচিংড়ি বেগুনি ফুলুরি আলুর দম কচুরি নিমকি সিঙাড়া হালুয়া সন্দেশ। দুপুরের ভূরিভোজনের পর কার পেটে খিদে থাকে। রত্ন হাত যোড় করে মাফ চাইল!

কে শোনে কার কথা! দুপুরে নাকি ওর বৌ ওকে পেট ভরে খাওয়ায়নি। তাই ওর পেটে খিদে মুখে লাজ। ঠানদি ওকে উপরোধে ঢেঁকি গেলাবেন। এক এক করে কাঁকন বাজিয়ে চুড়ি বাজিয়ে তাঁর নাতনিরা ওকে ঘিরে বসল।

"হাঁ রে, নাতজামাই! যাত্রার দলের ছোকরাদের মতো তোর ওই বাবরি চুল কেন রে! গান জানিস তো গা না একটা!" ঠানদি আবদার ধরলেন আহারপর্বের পরে।

রত্ন যত বলে সে গান জানে না সমবেত কণ্ঠে কোরাস ওঠে, "গান! গান!" ভিতর থেকে একটা হারমোনিয়াম এলো। এ যে কী বিপদ তা কল্পনা করা যায় না। ওস্তাদজীর উদ্দেশে নেপথ্য থেকে ফরমায়েস আসছিল, মিঞা কী মল্লার, দরবারী কানাড়া, বাগেশ্রী, মালকোশ। রত্ন জানে না শুনে খিল খিল হাসি। সঙ্গীতের পরীক্ষায় সে সসম্মানে ফেল করল। তখন তাকে সঙ্গীতরত্ন উপাধি দেওয়া হলো। তার পর তার বামে বসানো হলো ক্ষেমঙ্করীকে। সেও চন্দনচর্চিতা।

এমন সময় ললিত এসে পড়ল। আর অমনি রসভঙ্গ হলো। ঠানদি তাঁর দলবল নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। রত্নর চেহারা দেখে ললিত রেগে বলল,

"তোমাকে বাঁদর সাজিয়েছে। আর তুমি তা সেজেছ।" পাশের ঘরে গিয়ে আয়নায় মুখ দেখে রত্নর চক্ষুস্থির। তৎক্ষণাৎ ধুয়ে ফেলতে হলো। ছি ছি! ললিত কী মনে করল!

সকাল থেকেই গৌরীর দেওয়া জুতো জোড়াটার জন্যে রত্ন ছটফট করছিল। কানন কথা দিয়েছিল বিকেলে বহন করে আনবে। তার দয়ামায়া আছে। তাই ললিত যখন তাগিদ করল নবনীর খোঁজে বেরোতে তখন রত্ন বলল কাননের জন্যে সবুর করতে।

অবশেষে কানন এলো। এসে রত্নর মাথায় চাপিয়ে দিল কাগজের মোড়া একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স। জুতোর দোকানে যেমনটি পাওয়া যায়। বলল, "এখন থেকে তোমার নাম পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী। কেন, বল তো?"

এই বলে হেসে আকুল হলো নিজেই নিজের রসিকতায়। কানন যখন হাসে তখন ছাদ ফাটিয়ে হাসে। মৃদু হাসি বা মুচকি হাসি তার ধাতে নেই। কে কী মনে করছে তা সে গ্রাহ্যই করে না। কথা বলে উচ্চ স্বরে। কে শুনছে না শুনছে ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্তরালে গুঞ্জন উঠল, "চাঁদ মামার মতো হাসিখুশি গোল মুখ।" "হাসিখুশির মলাটে ওর ছবি আছে।" "যা বাজখাঁই গলা।" "আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা—"

রত্ন তখন মাথার জুতো কোলে চেপে ধরে রোমাঞ্চ বোধ করছে। কাননের প্রশ্নের উত্তর দিল না। হয়তো শোনেইনি।

"বলতে পারলে না তো?" কানন এক গাল হেসে বলল, "আরে বোকা, ও কি তোমার পায়ের জুতো? ওটা ওর নিজের পায়ের মাপে। ওর কেমন যেন ধারণা তোমার সঙ্গে ওকে এক মাপে তৈরি করেছেন বিধাতা। প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গ মিলিয়ে। আমি বলি, তা কি কখনো হতে পারে! ও বলে, রাখ বাজি। আমি বাজি রেখেছি একশো এক টাকা। জানি জিতবই। ফিরে গিয়ে ওটা আদায় করতে হবে।"

ললিত বলল, "দেখাই যাক না। রত্ন, বাক্স খুলে পায়ে দাও।"

পায়ে দিতে রত্নর পা সরছিল না। ও কি পায়ে দেবার মতো! ও যে মাথায় করে রাখবার মতো! ও যে বুকে চেপে ধরবার মতো! ও যে প্রিয়ার পাদস্পর্শে

পবিত্র! তারও সন্দেহ ছিল না যে একজনের জ্বতো আরেকজনের পায়ে হবার নয়।

ললিত বাক্‌স খুলে জ্বতো জোড়া বার করল। কালোর উপরে সোনালী আর গোলাপী। চমৎকার দেখতে। রত্নর পা টেনে নিয়ে দোকানদারের মতো পরিয়ে দিল ললিত। কী আশ্চর্য! ছোট হলো না যে! বড়ও হলো না! অবিকল এক সাইজ। কেবল আঙুলের দিকটা আঁটসাট। ভালো মুচিকে দিয়ে বাঁধিয়ে নিলে ষোলো আনা ফিট করবে।

কাননের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। সে কি স্বপ্ন দেখছে! ললিত বলল, "এবার জানা গেল কে বোকা। ওহে কানন, তুমি সরল বলে কি এত সরল! বাজি রাখার আগে ভেবে দেখলে না যে যারা ঘন ঘন পত্রবিনিময় করে তারা সেই সুত্রে মাপ বিনিময়ও করে থাকতে পারে। মর এখন নগদ একশো এক টাকা গুনে!"

"মাপ সেও চায়নি, আমিও দিইনি।" রত্ন বলল লাজুক ভাবে।

কানন প্রতীতির সঙ্গে বলল, "মিথ্যা পাবুলদিও বলেনি, রত্নও বলছে না। বিধাতা ওদের দুটিকে একই মাপে সৃষ্টি করেছেন।"

এ কি সত্য! রত্নর অন্তরে অপরিসীম বিস্ময় ও অব্যক্ত পুলক।

ললিত তাড়া দিয়ে বলল, "ওঠ। ওঠ। আমি ওসব ভেল্‌কি ও ভোজ-বাজিতে বিশ্বাস করিনে। রত্ন ওর চেয়ে মাথায় আধ ফুট উঁচু। পায়ের মাপ তো সেই অনুপাতে হবে।"

রত্ন কিন্তু ঠিক করে ফেলল নিজের পায়ের মাপের জরিন নাগরা বা লপেটা কিনে গৌরীকে উপহার পাঠাবে। কাননেরই হাতে। কিনতে যাবার সময় ললিতকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। বিধাতা যাদের এক মাপে বানিয়েছেন সে তাদের এক মাপের জুতো পরতে দেবে না! এমন গোঁয়ার! যা চোখে দেখল তাও বিশ্বাস করবে না! এমন যুক্তিহীন!

রত্ন কাননের হাতে যে চিঠি দেবে তাতে লিখবে, গৌরীকে—কাননের কাছ থেকে বাজির টাকা নিয়ো না। তোমার ঋণ ও অন্য ভাবে শোধ করবে।

এগারো

নবনী কলকাতায় নেই। শ্বশুরবাড়ী গেছে। গোলদীঘিতে সমবয়সী কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কানন ফিরে গেল যাদবপুর। ললিত ও রত্ন বাড়ী ফিরল।

হেয়ারকাটিং সেলুনে যেতে রত্ন রাজী হয়নি। সে এখন চুল ছাঁটাবে না, আরো বড় হতে দেবে। ফোটোগ্রাফিক স্টুডিওতেও যাবে না। তার চেহারা গোরীকে দেখাবার মতো নয়।

রাত্রে ভোজনবিলাসীর স্বর্গ। রত্ন কিন্তু বলে বসল, "এক বাটি পায়েস। তার বেশী খাব না।" এ কথা আগে জানায়নি কেন? জানালে পিসিমার আয়োজন সংক্ষেপ হতো। রত্নর সম্মানেই অমন রাজসূয় যজ্ঞ।

"জানিনে তোমার মনে কী আছে।" বিছানায় গিয়ে ললিত বলল, "তুমি ওকে দেখতেও যাবে না, দেখাও দেবে না। চিঠি পাবে আর চিঠি লিখবে। জুতো খাবে। এই তোমার প্রেম। ওর প্রেম কিন্তু এমন ফিকে নয়।"

রত্ন বলল, "তুমি কেমন করে জানলে?"

"আগুন কখনো ঢাকা থাকে? প্রেম কখনো ছাপা থাকে? ওকেও দেখেছি, তোমাকেও দেখছি। তুমি হাত খালি করে উড়িয়ে দিতে জান না। আর ও হলো উড়নচণ্ডী।"

এমনি কথায় কথায় বলা হয়ে গেল প্রেমের ইতিবৃত্ত। রত্নর দিক থেকে। ললিত অত কথা জানত না। এক মাস আগে আদৌ জানত না যে রত্নও গোরীকে ভালোবাসে। ওর ধারণা ছিল প্রেমটা গোরীর একতরফা। প্রথমে শুনতে পায় বৌদির কাছে। যশোবাবুর বড় বোন। পরে সাবুর কাছে। যশোবাবুর ছোট বোন। খবরটা যশোবাবুর কানেও পৌঁছেছে।

"সত্যি?" রত্নর চমক লাগল।

"সত্যি।" ললিত তার সন্দেহ ভঞ্জন করল।

রত্নর বুকটা দমে গেল। সে মনে মনে একটা বক্তৃতা মুসাবিদা করেছিল। ললিতের জন্যে। ললিতের মুখ দিয়ে সুধাদির জন্যে। সুধাদির মুখ দিয়ে

যশোবাবুর জন্যে। কিন্তু কার্যকালে তার মুখ দিয়ে বাক্য সরল না। সে কান পেতে রইল ললিতের উক্তির জন্যে।

ললিত বলল, "যশোবাবু লোকটা যাকে বলে গুড স্পোর্ট। কোথায় ক্রোধে অনর্থ বাধাবেন, তা নয় হেসে অস্থির। বললেন, এ এক নতুন রূপকথা। চোখে না দেখতেই তনুমন সঁপে দেওয়া। তার পর চোখে দেখে চক্ষুঃস্থির। ওদের একবার চোখোচোখি ঘটালে হয় না? বেশ একটা মজাদার ব্যাপার হতো। এক দাগ ওষুধেই প্রেমজ্বর সেরে যেত।"

রত্ন গদগদ স্বরে বলল, "তোমার কাছে অকপটে বলছি, ভাই। যশোবাবুকে আমি দাদার মতো ভালোবাসি। তাঁর যদি চিত্তপরিবর্তন হতো, তিনি যদি গোরীকে ছেড়ে দিয়ে সুধাদিকে বিয়ে করতেন তা হলে আমরা চার জনেই চির সুখী হতুম। তিনি আব সুধাদি, গোবী আব আমি। তখন আমরা চার জনেই চার জনেব প্রিয়পাত্র হতুম।"

"কেমন মজা হতো। না?" ললিত বলল শ্লেষ দিয়ে।

"এখন যা হয়েছে তার চেয়ে তো ভালো হতো।" রত্ন তর্ক কবল।

"ছাই হতো!" ললিত রাগত ভাবে বলল।

"কেন? কেন?" রত্ন অনুনয়ের স্বরে সুধাল।

"কেন? কেন? তা হলে অনেক কথা বলতে হয়। অনেক অন্তবঙ্গ কথা। যা বলতেও লজ্জা। শুনতেও লজ্জা। শেষ কালে না বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে যায়!"

"না। ঘটবে না।" রত্ন নিশ্চয়তা দিল।

তখন ললিত বলল, "আমার দোষ নেই কিন্তু। আমি তিক্ত হয়ে বয়েছি। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কেউটে বেবিযে আসবে। তখন আমাকে মেবো না।"

রত্নর মুখ শুকিয়ে গেল। সে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, "তোমার কী দোষ!"

ললিত বলল, "তবে শোন।"

রত্নকে রাজশাহীতে মাস ছয়েক আগে ললিত যা বলেছিল তার পরে পদ্মানদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সকলেরই জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। কারো কম, কারো বেশী। বত্ন প্রেমে পড়েছে। ললিত বিয়ে করেছে। তেমনি যশোবাবুও ঠিক সেই মানুষটি নেই। কংগ্রেসের যুগ গেছে বুঝতে পেরে তিনি

ইংরেজের সঙ্গে দহরম মহরম করছেন। এই কারণে তাঁকে অনাহারী ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে।

হাকিম হয়ে তিনি দেখছেন তাঁর সদরে এসে বাস করা দরকার। নইলে কর্তব্যহানি হবে। একরারি আসামীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে হলে, জখমী ফরিয়াদীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখে নিতে হলে সদরে হাজির থাকা একান্ত আবশ্যক। দুষ্টু লোকেরা বলে, তা নয়। ক্লাবে গিয়ে তাস খেলতে হলে, পেগ টানতে হলে, বল নাচতে হলে মফঃস্বলের চেয়ে সদর প্রশস্ত।

আসলে তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হতে না পারলেও মনেপ্রাণে ব্যারিস্টার হয়েছেন। গ্রামে তাঁকে ধরে রাখা যায় না। এক দল মোসাহেবকে নিয়ে তাঁর দিন আর কাটে না। বেহালা বাজিয়ে বাজিয়ে তিনি শ্রান্ত। গোরীর মন পাওয়া গেল না। এখন সদরে গিয়ে তিনি বসবাস করবেন। গোরী যদি সদরের টানে যায় তা হলে একসঙ্গে ঘর করতে করতে মনের মিলও হয়ে যাবে। সেখানে সুধা থাকবে না ব্যবধান রচনা করতে। সুধার সঙ্গে তিনি অন্যত্র মিলিত হবেন। বৌ বৌ ঠাঁই ঠাঁই।

গোরীর কাছে যখন প্রস্তাবটা তোলা হলো সে উত্তেজনার আতিশয্যে উদ্বাহু হলো। বেণুপুরের পচা ডোবায় থেকে যে মাছ কোনো দিন বাড়বে না সদরের সরোবরে যাবার পথ কেটে দিলে সে তো চঞ্চল হয়ে উঠবেই। কিন্তু দু'দিন পরে সে বলতে আরম্ভ করল, না, মাধবকে ছেড়ে আমি যাব না। আমাকে নিয়ে যেতে চাও তো মাধবকেও নিয়ে চল।

তার বোঝা উচিত ছিল সেটা সম্ভব নয়। গৃহদেবতাকে মন্দিরভ্রষ্ট করলে গোটা পরিবারটাই উৎসন্ন যাবে। কিন্তু তার জেদ সে মাধবকেও নিয়ে যাবে। পরে একটা রফা হলো। মাধব যাবেন না। তাঁর একটি প্রতিনিধি গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যখন সব এক রকম স্থির তখন শেষ মুহূর্তে বলে কী! কই, সুধা যাচ্ছে না যে?

আর কেউ হলে বলা যেত ন্যাকামির চূড়ান্ত। কিন্তু গোরীর বেলা সে কথা বলা চলে না। সুধা ওর মিলিটারি স্ট্র্যাটেজীর অঙ্গ। সুধা না থাকলে ও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে না। দুর্বল হয়ে পড়ে। দৃশ্যত ওরা দুই সতীন।

রত্ন ও শ্রীমতী

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। বস্তুত ওরা পরস্পরের রক্ষাকবচ। সুধা যদি না থাকত গৌরী কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারত না। আর গৌরী যদি না থাকত যশোবাবু এত দিনে আর একটি বিয়ে করে থাকতেন ও নতুন বৌ সুধাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে থাকত।

কই? সুধা যাচ্ছে না যে?

এর উত্তরে যশোবাবু বললেন, সুধা কোন সুবাদে সদরের বাড়ীতে থাকবে? এখানে সে আমার মায়ের ভাজের ভাইঝি। মায়ের পরিচর্যা করতে এসেছে। সদরে সে কার কে হয়? লোকের কাছে মুখ দেখাবে কী বলে?

গৌরী বলল, আমার দিদি বলে।

যশোবাবু তো হতভম্ব। তিনি যতই বলেন, তা হয় না, গৌরী ততই রুখে দাঁড়ায়। কেন হবে না? আলবৎ হবে। জরুর হবে। আমার দিদি আমার কাছে থাকবে না? কে আমার সংসার দেখবে? বাজার হিসাবের আমি কী বুঝি? সবাই আমাকে ঠকাবে।

প্রতি বারের মতো এ বারেও গৌরী জিতল। যশোবাবু ভেবেছিলেন তাঁর মতো চালাক লোক আর নেই। গৌরীকে ফাঁদে ফেলবেন সুধাকে আলাদা রেখে। ডিভাইড য়্যান্ড রুল। একালের চাণক্য শ্লোক। কিন্তু ইংরেজ হেরে গেল ভারতনারীর কাছে। গৌরী সুধাকে ঘরে ডেকে ভোজ দিল। সুধা গৌরীকে ঘরে ডেকে ভোজ দিল। দুই বোনে গলাগলি ভাব।

যশোবাবু এর পর নতুন ট্যাকটিক্স প্রয়োগ করলেন। গৌরীর সাধ ঘোড়ায় চড়ে দেশের জন্যে লড়তে। নবাবের আস্তাবল থেকে ঘোড়া কেনা হলো। অতি সুলক্ষণ কালো ঘোড়া। যার পূর্বপুরুষের পিঠে চড়ে সিরাজ উদ্দৌলা নাকি ক্লাইভের সঙ্গে লড়েছিলেন। চার দিকে পর্দা খাটিয়ে একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ঘেরাও করা হলো। বোধ হয় লড়াইয়ের মাঠও পর্দা দিয়ে ঘিরে ফেলা হতো। কিন্তু বার তিন চার ঘোড়ায় চড়ার পর গৌরীর উৎসাহ নিবে গেল। ও মেয়ে হাড়ে হাড়ে বাঙালী। ঝাঁসীর রানী সেজে অভিনয় করতে গেলে সইবে কেন? একদিন চিৎপাত। কাছা দিয়ে শাড়ী না পরলে যা হয়। সইসের সামনে বেআব্রু।

দ্বিতীয় ভাগ

যশোবাবু বললেন ব্রীচেস পরতে। গোরী বলল ও মেমসাহেব নয়। দেশের জন্যে লড়তে গিয়ে মেমসাহেব বনবে না।

ঘোড়াটা যদিও সিরাজের ঘোড়ার বংশধর তবু তার দ্বারা বাংলার সিংহাসন ফিরে পাওয়া গেল না। এবার হাতীর পালা। হাতীর পিঠে চড়ে শিকারে যাবার শখ গোরীর ছেলেবেলার। যশোবাবু তার জন্যে আলাদা একটা হাতী বরাদ্দ করলেন। হাতীটা তাঁর নিজের পূর্বপুরুষের। তার হাতে আলাদা একটা রাইফেল দেওয়া হলো। শিকারের ছলে কোথায় কোথায় নিশিযাপন করা হবে তারও একটা নির্ঘণ্ট তৈরি হলো। তাঁবু পাঠানো হলো গোরুর গাড়ী করে। গোরী কিন্তু বেলা চারটের মধ্যেই ফিরতে চাইবে। কিছুতেই রাত কাটাবে না বাড়ীর বাইরে, তাঁবুতে। চারটের মধ্যেই তার হাতে পাখী পড়বে এ রকম ভরসা কে দেবে? প্রত্যেক বার দেরি হয়ে যায়। পাখী পড়ে না। শূন্য থলে নিয়ে ঘরে ফিরতে হয়। ফিরতে ফিরতে আটটা ন'টা। গোরীর কী রাগ! কী রাগ!

রেগেমেগে দিল বন্ধ করে শিকার। রাইফেল চালাতে শিখেছে। কিন্তু চিড়িয়া মারতে নয়। ও কি পারবে কোনো দিন সাহেব মারতে? অস্ত্র হাতে নিলে কী হবে, শিক্ষা চাই, শৌর্য চাই। যশোবাবু ওকে খুশি করার জন্যে অনেক কিছু তো করলেন। কিন্তু ওর মন পেলেন না। ওর ধৈর্য নেই। একটা কিছু নিয়ে লেগে থাকতে জানে না। ওর দ্বারা রাজনীতিও কি হবার? ভেবেছিল ওকে ধরে মান্ডালে কি আন্দামান চালান দেওয়া হবে। তা তো হলো না। আশা করেছিল গান্ধী জেল থেকে বেরিয়েই গণসত্যাগ্রহ করবেন, সেও ঝাঁপ দেবে। সেটা দূর আশা।

যশোবাবুর গুরুজন তাঁকে আবার বিয়ে করতে বলছেন। তিনি আগেও "না" বলেছেন। এখনো তাই বলছেন। এবার কিন্তু মন থেকে নয়। এবাবকার বলায় তেমন আন্তরিকতা নেই। ললিতের বৌদিকে নাকি মুখ ফুটে বলেছেন, আর কেন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যাই। নতুন বৌ এলে সেও তো এরই ধারা ধরবে! এরই প্রভাবে পড়বে। আমি বৈরাগী

হব তাতে দুঃখ নেই, বোন। আমার দুঃখ শুধু এই যে গোরীর দৃষ্টান্ত দেখে দেশের বৌঝিরা অবাধ্য হবে।

ভিতরে ভিতরে মেয়ে দেখা চলেছে। আঁচতে পেরে সুধা বলছে সেও আর থাকবে না। তা শুনে যশোবাবু বলছেন নতুন বৌকে সুধার অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে, নয়তো তিনি বিয়ে করবেন না। এ হেন শর্তে রাজী হবে এমন মেয়েই বা কোথায়! মেয়ের বাপই বা কোথায়! যশোবাবু গোরীর মায়া কাটাতে মন বাঁধছেন। কিন্তু সুধার মায়া কাটাতে বললে কেঁদে ফেলবেন। কত কালের সম্পর্ক! ওঁর প্রথম পক্ষ যে আত্মহত্যা করল সে তো সুধার উপব তাঁর অনুরাগ দেখে। হাঁ, সুধারই আপন বোন। দোষটা তা বলে সুধার নয়। বোন যত দিন জীবিত ছিল তত দিন সে ধরা দেয়নি। ঐ ট্র্যাজেডীর পরেও কি ধরা দিত! দিল যখন দেখল যে যশোবাবু আর বিয়ে করবেন না। সুধার জন্যে আজীবন অপেক্ষা করবেন।

পরে অবশ্য তাঁর সেই ভীষ্মের পণ ভঙ্গ হলো। সেটা পুত্রার্থে। তিনি সুধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোরীর পাণিগ্রহণ কবেন। বিনিময়ে হৃদয় অর্পণ করেন না। গোরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা বিশেষ একটি উদ্দেশ্যসিদ্ধিব জন্যে। উত্তরাধিকারী লাভ। এর জন্যে তিনি সুধাকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর গোরী যখন বিদ্রোহ করল তখন তিনি পায়ে ধরে সুধাকে ঘরে নিয়ে এলেন। মনে করেছিলেন তিনি এমন একটা চাল চাললেন যে বিদ্রোহিণীব আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কোনো গতি রইল না। গোরীকে তার গুরুজন শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু সে তার পতাকা নত করল না। অসুখ বাধিয়ে মামার বাড়ী গেল। যশোবাবু গেলেন বিলেত।

ইতিমধ্যে গোরীতে সুধাতে সখী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুজনে দুজনের কাছে অংগীকার করে যে কেউ কারো অনিষ্ট করবে না। যদি করে তবে নাবী-বধের পাপের ভাগী হবে। মাধবের সাক্ষাতে অংগীকার। তিনি সাক্ষী। বিলেত থেকে ফিরে এসে যশোবাবু অশেষ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুই নারীর সংগে বুদ্ধির যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছেন না। তারা তাস খেলতে বসে তাদের দুজনের হাত যোগসাজস করে অতি সুকৌশলে খেলছে। যশোবাবুর একমাত্র ভরসা

বাহুবল, কিন্তু গোরী তো আর পনেরো বছর বয়সের অবলা বালা নয়। তার গায়ে যথেষ্ট জোর। বরং যশোবাবুরই সামর্থ্য কমে আসছে। এখন আর পনেরো বনাম ত্রিশ নয়। বিশ বনাম পঁয়ত্রিশ।

কিন্তু তাঁর শেষ চালটা গোরীকে বেকায়দায় ফেলেছে। সত্যি সত্যি যদি তিনি আর একটি বৌ ঘরে আনেন তা হলে সুধাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। সে যাবেই। তার স্বামী প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন। সে কারো গলগ্রহ নয়। প্রেমের টান না থাকলে সে কবে চলে যেত। সে যদি চলে যায় গোরীর জীবন দুর্বহ হবে। সে আর বেগমপুর টিকতে পারবে না। অথচ মাধবকে ফেলে যেতেও তার পা ওঠে না। তার নিজের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিলে সে কি কোনো দিন মনঃস্থির করতে পারবে! সিদ্ধান্তটা নিতে হবে অন্য একজনকে। যে তাকে ভালোবাসে তাকে। যাকে সে ভালোবাসে তাকে। সেই একজন কি রত্ন? তবে রত্নকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে সিদ্ধান্তটা গোরীর উপর খাটাতেও হবে জোরসে। নয়তো গোরী নতুন বৌয়ের ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে কি আত্মহত্যা করবে।

রত্ন যদি কিছু করতে চায় তো সময় বেশী নেই। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। কিন্তু রত্নর মাথাব্যথা আছে কি? মনে তো হয় না। মনে হয় তার পায়ে ব্যথা। তাই ফুলবাবুর মতো ফুল তোলা কার্পেটের জুতো পায়ে দেওয়া। গোরীর আপন হাতের কাজ। অন্য কারো জন্যে সে আর কোনো দিন পাদুকা রচনা করেনি। যে তেজস্বিনী মেয়ে! রত্ন তাকে দিয়ে পাদবন্দনা করিয়ে নিল। ছি ছি! এ যে প্রকারান্তরে পায়ে ধরে প্রেম সাধা! এমন সুন্দর সামগ্রীও সে আর কোনো দিন অন্য কারো জন্যে তৈরি করেনি। করে থাকলে মানুষের জন্যে নয়। মাধবের জন্যে।

বাস্তবিক গোরীর এ দানের প্রতিদান বাজারের নাগরা দিয়ে হয় না। দিলে দিতে হয় নিজের হাতের কাজ। নাগরা কিনে দেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করল রত্ন। স্বগতভাবে বলে উঠল, "আমার আপন হাতের কাজ কী আছে যে পাঠাব!"

"হাতের কাজ তো তুচ্ছ। করতে চাও তো বীরের মতো কিছু কর।" ললিত এর উত্তর দিল। "হাতের কাজ তো মেয়েলি। এমন কিছু কর যা পুরুষোচিত।"

রত্ন চমকে উঠে বলল, "যথা?"

"যথা? আমি হলে যা করতুম।"

"তুমি হলে কী করতে?" রত্ন উৎসুক হয়ে সুধাল।

"কেন? বলিনি?" ললিত রত্নকে কিছু ক্ষণ ঝুলিয়ে রেখে তার কানের কাছে মুখ এনে বিশ্বাস করে বলল, "ইলোপমেণ্ট।"

রত্নর মুখ এবার শাদা হয়ে গেল না। কিন্তু তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর হলো। বুকে বালিশ চেপে সে স্থির হয়ে পড়ে থাকল। নির্জীবের মতো। যখন ভাষা ফিরে পেলো তখন শুধু এই কথা ক'টি বলল। "কিন্তু ও যদি না চায়?"

"ও যদি না চায় তবে তুমি ওকে নাচাবে।" ললিত বলল 'পান' দিয়ে। বলে হো হো করে হেসে উঠল। আর রত্নকে ঠেলা দিল।

সে রাত্রে আর কথাবার্তা হলো না। স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। ললিতের ঘা খেয়ে রত্নর ঠুকঠাক স্তব্ধ।

পরের দিন সকাল সকাল উঠে চা খেয়ে ওরা দু'জনে যাদবপুর চলল জ্যোতিদাকে ধরতে। ও কলকাতা এসেছে, কিন্তু চরকার কাজ নিয়ে চর্কির মতো ঘুরছে। রত্নকে দেখতে ওরও খুব ইচ্ছা। কিন্তু যোগাযোগ হয়ে ওঠা শক্ত।

পথে যেতে যেতে রত্ন বলল ললিতকে, "কাল যে কথা হচ্ছিল। ওর সামনে একটি নয় দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপ মুক্তি। এটি ওকে নিতে হবে নিজের দায়িত্বে। একক ভাবে। সাত ভাই চম্পার সাত জনেই সহায়। কোনো একজন বিশেষ করে নয়।' আমার অংশ সাত ভাগের এক ভাগ। আমিও অংশ নেব।"

ললিত শুনতে চাইল, "দ্বিতীয় পদক্ষেপ?"

"দ্বিতীয় পদক্ষেপ সংযুক্তি। তার মানে বিশেষ কোনো একজনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। প্রণয়সূত্রে। প্রণয়মূলক পরিণয়সূত্রে। ও যদি স্বয়ংবরা হয়ে আমাকেই বরণ করে তবে অর্ধেক দায়িত্ব ওর, অর্ধেক দায়িত্ব আমার। তখন আর ও একক নয়। আমরা দু'জনে মিলে এক। তখন সাত ভাই চম্পার কোনো অংশ নেই। তাদের ছুটি।"

দ্বিতীয় ভাগ

রত্ন সারা রাত চিন্তা করেছিল। তার চিহ্ন তার চেহারায় আঁকা ছিল। ললিত তা লক্ষ করে সংযত হলো। বলল, "আচ্ছা।"

কিছু ক্ষণ বাদে রত্ন আবার বলল, "শুধু সাত ভাই চম্পার সহায়তা নয়। সুধাদির সহযোগিতা চাই। যশো-দার সহযোগিতা চাই।"

"যশোদার সহযোগিতা! যশোদা মেয়েটি কে!" ললিতের খটকা বাধল।

"যশোদা নয়। যশো দা। যশোমাধব দাদা।" রত্ন বিশদ করল।

"তুমি তো আশ্চর্য ছেলে হে ! যার স্ত্রী কুলত্যাগিনী হবে সে করবে সহযোগিতা! আর সুধার কথা তো কাল রাত্রে শুনলে। এর মধ্যেই ভুলে গেলে! সুধা যদি গৌরীকে যেতে দেয় নতুন বৌ এসে সুধাকেও তাড়াবে। সুধার স্বার্থ গৌরীকে ধরে রাখা। না। যশোবাবুর সহযোগিতা সুধার সহযোগিতা আশা করা যায় না। এমন কি সাত ভাই চম্পার সহায়তারও আশা নেই।"

রত্ন বিস্মিত হলো। "বল কী! সাত ভাই চম্পাও সহায় হবে না?"

ললিত গম্ভীর ভাবে বলল, "রত্ন, ভাই, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বিবাহিত। নবনীও তাই। হৈমও তাই। আমরা কেউ প্রেমে পড়ে বিয়ে করিনি। আমাদের স্ত্রীদের বিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের সঙ্গে, যেমন গৌরীর বিয়ে দেওয়া হয়েছে যশোবাবুর সঙ্গে। আমরা যদি গৌরীর পিছনে দাঁড়াই বা যশোবাবুর ঘর ভেঙে দিই তা হলে কেউ না কেউ আমাদের স্ত্রীদের পিছনে দাঁড়াবে ও আমাদের ঘর ভেঙে দেবে। দিলে আমাদের বলবার কিছু থাকবে না। আমরা বেকুব বনে যাব। কাজেই তোমার গণনা থেকে তুমি আমাদের তিন জনের নাম বাদ দাও। গিরীন বোধ হয় বাঁচবে না। ওর বসন্ত হয়েছে। খবর ভালো নয়।"

রত্নর গলা শুকিয়ে গেল। সে বিহ্বল স্বরে বলল, "ব স ন্ত হয়েছে!"

"হাঁ। বসন্ত। পথে পড়ে থাকা বসন্তরোগীর সেবা করতে গিয়ে এই বিপত্তি। গিরীনকে বাদ দিলে বাকী থাকে কানন ও প্রভাত। তোমাকে আমি ধরিনি। হ্যামলেট নাটকের অভিনয়ে ডেনমার্কের যুবরাজ তুমি। ওদের দুজনের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ ওরা ওদের পারুলবোনের জন্যে কত দূর কী করতে পারে।" এই বলে ললিত হাত ধুয়ে ফেলল।

সে যে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে গোরীর এ অনুযোগ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তা যদি হয় তবে সে কোন মুখে ইলোপ করতে পরামর্শ দেয়?

"ইলোপ করতে কোন মুখে বলি?" ললিত রত্নর প্রশ্নের উত্তরে স্মিত হেসে বলল, "এই মুখে। ইলোপ করা তো সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা নয়। কালাপাহাড়ের মতো প্রতিমাভঙ্গ নয়। কত ছেলে কত মেয়ে আদি কাল থেকে ইলোপ করে এসেছে। তাতে কি সমাজের ইমারতে ভাঙন ধরেছে? কিন্তু ঘটে যাওয়া বিবাহকে অঘটিত করে স্বয়ংবরের অধিকার আদায় করা হলো অন্য জিনিস। তাতে সমাজের ভিৎ পর্যন্ত নড়ে ওঠে। ভূমিকম্প হলে আমারও তো ভিটেমাটি ফাটবে। ফৌজদার বংশের হাওয়া বর্মণ বংশেরও গায়ে লাগবে।"

রত্নর হৃদয়ঙ্গম হলো যে ললিতের মতে ইলোপমেন্ট হলো নিয়মের ব্যতিক্রম। সমাজ নিন্দা করতেও পারে, ক্ষমা করতেও পারে, সাজা দিতেও পারে, সয়ে যেতেও পারে। কিন্তু বিয়ে বলপূর্বক দেওয়া হয়েছে বলে বিবাহকে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা ও বিবাহিতাকে কুমারী বলে স্বীকার করা হচ্ছে নিয়ম উলটিয়ে দেওয়া। স্থিতাবস্থার যারা রক্ষক তারা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেবে না। দিলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই তলে তলে ক্ষয়ে যায়।

"ইলোপমেন্ট যদি গোরীর স্বতঃপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত হতো তা হলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু অমন একটা সিদ্ধান্ত কি আমি ওর উপর চাপিয়ে দিতে পারি? জোর খাটানো যদি মন্দ হয়ে থাকে তবে সব ক্ষেত্রেই মন্দ। এ ক্ষেত্রেও।" রত্ন বিধান দিল।

"গোরী যদি মনঃস্থির করতে না পারে তবে তার হয়ে তোমাকে মনঃস্থির করতে হবে। আর তুমি যদি মনঃস্থির করতে না পার তবে তোমার হয়ে গোরীকে মনঃস্থির করতে হবে। প্রেম পরস্পরের উপর পরস্পরকে এই অধিকারটুকুও যদি না দেয় তবে তা প্রেম নয়। দু'পক্ষে প্রেমও থাকবে অথচ কেউ কারো দিকে এক পাও এগোবে না, দেখবেও না, দেখা দেবেও না, এই ধরি মাছ না ছুঁই পানি কি একপ্রকার স্নায়ুযুদ্ধ নয়? এই যুদ্ধটা ওই যুদ্ধটার চেয়ে কী এমন ভালো?"

"কোন যুদ্ধটার চেয়ে?" রত্ন মূঢ়ের মতো জিজ্ঞাসু হলো।

দ্বিতীয় ভাগ

"শোবার ঘরের দরজা খোলা রাখা। কেউ ঘরে ঢুকলে ঘুমের ভাণ করা। তার পর চোরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। চোরকে তাড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধে জেতা। যাক গে, ওসব কথা বলতেও লজ্জা, শুনতেও লজ্জা। এই যে আমরা এসে পড়েছি। থাক, তোমাকে দিতে হবে না। ট্যাক্‌সির ভাড়াটা আমিই দেব। তোমাকে এখানে রেখে আমি একটু ঘুরে আসি। কেমন? কাছেই একজন জাপানফের্তা অধ্যাপক থাকেন।" ললিত রত্নকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

রত্ন লক্ষ করল গেটে সাইনবোর্ড লাগানো : ডক্‌টর মোতিময় মুস্তফী।

বারো

কাঁনন তার বন্ধুকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। প্রাতরাশ চলছিল। "আমার বন্ধু রত্ন মল্লিক। আমার বৌদি ইঙ্গেবর্গ মুস্তফী। আমার দাদা ডক্‌টর মুস্তফী। আর—আমার অগ্রজ জ্যোতির্ময় মুস্তফী।"

ইঙ্গেবর্গ রত্নকে সমাদর করে তাঁর ডান পাশের আসনে বসালেন ও স্বহস্তে তার পরিবেশনের ভার নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "ক'চামচ চিনি?" মোতিময় জানতে চাইলেন ললিত কোথায়। কানন এক রাশ প্রশ্ন কবল। শুধু জ্যোতিদা নীরব।

কথাবার্তার স্রোত যখন রত্নকে ফেলে অন্যত্র সরে গেল তখন সে জ্যোতিদার দিকে ভালো করে তাকাল। এক মুখ দাড়ি গোঁপ। চুলও বহু দিন ছাঁটায়নি। নাপিতের সঙ্গে অসহযোগ বা নাপিতের ধর্মঘট। চোখ দুটো আঁধার রাতের জোনাকিব মতো জ্বলজ্বল কবছে। কৌতুকে উজ্জ্বল। উন্নত নাসা। প্রশস্ত ললাট। গায়ে জোর আছে বোঝা যায়। গড়নে সৌকুমার্য। রং ময়লা। বোধ হয় রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সব ঋতুতে খোলা জায়গায় শুয়ে। অনেকখানি ক্ষিতি আর অপ, তেজ আর মরুৎ আর ব্যোম লেগেছে ওকে বানাতে। বয়স পঁচিশের মতো হবে।

ওর দাদা মোতিময় দীর্ঘকাল পশ্চিমে থেকে ওর চেয়ে ঢের বেশী ফরসা হয়েছেন। বয়সেও অনেক বড়। পঁয়ত্রিশের কম নয়। তাঁর স্ত্রী তাঁব চেয়ে

মাথায় উঁচু, দোহারা, মার্বেল কেটে মূর্তির মতো ক্ষোদাই করা। চুলের রং ম্লান সোনালী। চোখের রং নীল। বয়স স্বামীর চেয়ে কম নয়। বাংলা শিখেছেন, কিন্তু উচ্চারণ বাঙালীর মতো নয় বলে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ইংরেজী দিয়ে চালান।

ললিতের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে যে যার কাজে গেলেন। তখন জ্যোতিদা এসে রত্নর হাতে হাত রাখল। রত্ন তাকে এত সহজ ভাবে নিল আর সেও রত্নকে যে কাননের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "তোমরা কি আগে একজন আরেক-জনকে দেখেছিলে?"

জ্যোতিদা বলল, "হাঁ। আধ ঘণ্টা আগে।"

তখন কানন বলল, "হারাধনের দুটি ছেলে অনেক দিন পরে যে যার হারানো ভাইকে খুঁজে পেয়ে কী রকম ব্যবহার করেছিল তার একটা আভাস চোখে পড়ল। নিশ্চয় চিঠি লেখালেখি হয়েছে বহু বার?"

রত্ন বলল, "একবারও না।"

"তা হলে তোমরা আমাকে অবাক করলে!" কানন হাল ছেড়ে দিল।

জ্যোতিদা ভীষণ কাজের লোক। দশ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারল না। রত্নকে নিমন্ত্রণ করল কাপালিপাড়ায়। তার আশ্রমে। রত্ন তাকে পালটা আমন্ত্রণ করল পদ্মার চরে। স্থির হলো জ্যোতি আসবে প্রথমে। দু'সপ্তাহ থাকবে। রত্ন যাবে তার পরে। এক মাস থাকবে। কথা জমে গেছে বিস্তর। রোজ একটু একটু করে হবে। বাকী সময়টা যে যার নিজের কাজ করবে। জ্যোতিদার কাজ সুতো কাটা।

রত্ন লক্ষ করল যে জ্যোতিদার পরনে কটিবস্ত্র। শুনল সেটা তার নিজের হাতে কাটা সুতো থেকে তৈরি। তার কাঁধের উড়নিটাও তাই। এ ছাড়া আর কোনো বহির্বাস ছিল না। পায়ে ঘাসের চটি। গান্ধীটুপির কথা জিজ্ঞাসা করায় সে হেসে বলল, "আমার তো টাক পড়েনি। কিংবা মা বাপ মারা যায়নি।"

রত্ন আশা করেছিল জ্যোতিদা গোরীর কথা তুলবে, কিন্তু সে ওর নামও করল না। রত্নও লজ্জায় ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে গোরী তাদের দু'জনেরই মন জুড়েছিল। দু'জনের সঙ্গে সেও

উপস্থিত ছিল অদৃশ্যে। তা বলে সে-ই দু'জনের সেতুবন্ধ নয়। সে না থাকলেও এরা দু'জনে দুই ভাই হতো। আত্মিক সম্বন্ধে। যাকে বলে হরি হর আত্মা। গৌরী শুধু নিমিত্তমাত্র।

জ্যোতিদা চলে গেলে ললিত এলো, কিন্তু বেশী ক্ষণ থাকল না। কাননকে বলে গেল রত্নকে পৌঁছে দিতে ও দুপুরে খেতে। সে নিজে যাবে জাপানযাত্রার ছাড়পত্রের তদ্বির করতে। দরখাস্ত ইতিমধ্যে করা হয়ে গেছে। এখন ইংরেজ রাজী হলে হয়। ওরাও ললিতকে বিশ্বাস করে না। তার এ কূল ও কূল দু' কূল গেছে।

কানন বলল, "কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে?"

রত্ন বলল, "না, ভাই। তোমার ঘরে নিয়ে চল। গল্প করি।"

কানন ওকে উপরে নিয়ে গেল। জ্যোতি আর কানন দু'জনের ঘরে। জ্যোতিদা তো নেই। তার খাটে আরাম করে শুয়ে পড়ল রত্ন। গত রাত্রের ক্লান্তি তার অঙ্গে।

কানন বলল, "তোমার জন্যেও একটা ছোট ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন বৌদি। তা তুমি তো এলে না। নিরাশ হলেন সকলে। বিশেষ করে জ্যোতিদা।"

রত্ন বলল, "কী করি, বল? আমি যে তোমাদের চেয়ে ললিতকে বেশী ভালোবাসি বলে তার পিসির বাড়ী উঠেছি তা নয়। তার সঙ্গে আমার গুরুতর কাজ ছিল। আমি চেয়েছিলুম তার মধ্যস্থতায় গোবীব মালিকের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে। তা আর হলো কোথায়! সে আমাকে উলটে পবামর্শ দিচ্ছে--"

"তোমার নিজের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে।"

"দূর! সে কী বলছে, শুনবে? ইলোপ করতে।" রত্ন বিশ্বাস করে বলল।

"আমিও তো সেই মন্ত্রণাই দিচ্ছি। তোমার অন্তঃপরিবর্তন বলতে আমি যা বুঝি তা শাদা বাংলায় ইলোপমেন্ট। পারুলদিকেও সেই মন্ত্রণা দিয়ে এলুম। তারও অন্তঃপরিবর্তন চাই। মাধব বলে ও বাড়ীতে একটা পুতুল আছে। সেই পুতুলেব মায়া ও কাটাতে পারছে না। বিশ একুশ বছর বয়স হলো। এত বয়সেও পুতুল খেলার সাধ মিটল না। আর কবে মিটবে! আমি বলি, দিদি, তোর কাছে মানুষ বড় না মানুষের হাতে গড়া পুতুল বড়? চণ্ডিদাস বলে

গেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। সেই মানুষকে আড়াল করবে পুতুল?"

রত্ন ভেবে বলল, "যার সঙ্গে যার চোখের দেখা পর্যন্ত হয়নি তার সঙ্গে তার ইলোপমেন্ট তো আঁধারে ঝাঁপ দেওয়া। ঝাঁপ দিয়ে তার পর যদি আমাকে ওর মনে না ধরে? বা আমার ওকে? ভাই কানন, এখন মনে না ধরলে মোহভঙ্গ হবে, কিন্তু তখন মনে না ধরলে মনোভঙ্গ। হৃদয়ভঙ্গ। জীবনভঙ্গ।"

কানন বলল, "তা হলে চল আমার সঙ্গে বেগমপুর।"

রত্ন আঁতকে উঠল। "যশোবাবুর বাড়ী! না, না, সে আমার দ্বারা হবে না। এক যদি তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন তা হলে যেতে পারি।"

কানন মাথায় হাত দিয়ে বলল। "তিনি আমন্ত্রণ করবেন তোমাকে! কেন? কোন সুবাদে? এমন পরামর্শ আমি কি তাঁকে দিতে পারি? সে হয় না।"

রত্ন বলল, "গোরী লিখেছিল আমি যদি জ্যোতিদার আশ্রমে যাই ও সেখানে অনায়াসে আসতে পারবে। কিন্তু তার জন্যে জ্যোতিদার অনুমোদন দরকার। সে কি ওটা পছন্দ করবে? আশ্রম তো প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্কেতস্থল নয়?"

"না, সেখানেও দেখা হওয়া শক্ত। দিদিকে আজকাল খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। যশোবাবুর আত্মীয়রা তাঁর জন্যে পাত্রী অন্বেষণ শুরু করেছেন। চমৎকার একটা অজুহাত পাবেন, যদি দিদি কাপালিপাড়ায় গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসে। সেটা সঙ্গত কখন? না যখন দিদি একেবারে মনঃস্থির করে ফেলেছে। কিন্তু এটাই বা কেমন করে সম্ভব, যত দিন না তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়? একেই বলে ভিসাস সার্কল। দেখা না হলে মনঃস্থিব হয় না। মনঃস্থির না হলে দেখা হয় না।" কানন ভাবনায় পড়ল।

রত্ন খুলে বলল, "আমার সারাক্ষণ ভয় আমার চেহারা দেখে ওর যদি মোহ-ভঙ্গ হয়! সেটা আগে ভাগে হয়ে গেলে সেও বাঁচে আমিও বাঁচি। মনে দুঃখ হবে, কিন্তু জীবনে ভুল হবে না। তবে এমনও হতে পারে যে ওর মোহভঙ্গ হবে না, হবে আমার। তখন কি ওকে বিপদেব মুখে ফেলে রেখে পাশ কাটিয়ে যেতে পারব? না, আমার আর ফেরার পথ নেই। তা হলে দেখা করার কথা ওঠে কেন? ওঠে ওরই মনঃস্থির করার জন্যে।"

দ্বিতীয় ভাগ

"আমার নিজের সে রকম কোনো আশঙ্কা নেই। যেখানে এত নিবিড় ভালোবাসা সেখানে চেহারাই সব কথা নয়। কিন্তু কে জানে! বলা তো যায় না। আঁধারে ঝাঁপ দেবার আগে কার সঙ্গে ঝাঁপ দিচ্ছি সেটা আমি হলে আমিও দেখতে চাইতুম।"

রত্ন মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "কিন্তু আমার বিবেচনায় প্রথম জিনিস প্রথমে। আগে মুক্তি। মুক্তির জন্যে মুক্তি। পরে প্রেম। প্রেমের জন্যে প্রেম। গৃহত্যাগ যদি করতে হয় মুক্তির জন্যেই করা হোক। মুক্তির জন্যে ও কত কাল ধরে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। প্রেম তো এলো সেদিন। দুটোকে একসঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলা কি ভালো?"

কানন মাথা নেড়ে বলল, "এটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। ইতিমধ্যে আমি বার দু'তিন বেগমপুর গেছি। দিদিকে এই কথাই বলেছি। ও কী উত্তর দিল শুনবে? মুক্ত হয়ে ও তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। কার পায়ে দাঁড়াবে? সুন্দর মুখের বিপদ সর্বত্র। খারাপ লোক পিছনে লাগবে। ওর বন্ধুরা ওকে কত কাল বাঁচাবে! ও শেষপর্যন্ত হবে রূপোপজীবিনী। আর একটি সোনালী।"

রত্নর মনে হলো সে ভির্মি খেয়ে পড়বে। এই কি তার ফ্রী উওম্যান? না, কখনো নয়। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আর কী উপায় আছে তার, যার লেখাপড়া এত কম, রূপ এত বেশী? কায়িক শ্রম তো সে করবে না। করলেও কি খারাপ লোকের সংসর্গ এড়াতে পারবে? মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমেরও প্রয়োজন। যে প্রেম বাঁচাবে। আত্মবিক্রয় থেকে। মন্দ থেকে। কিন্তু তেমন প্রেম কি চাইবামাত্র মেলে?

রত্ন তার মনীষা দিয়ে এর কোনো কূলকিনারা পেত না। মুক্তি আর প্রেম এমন ভাবে জট পাকিয়েছিল যে একটির থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হতো না। এই মেয়েটির মুক্তির আয়োজন করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আয়োজনও করতে হয়। আগে মুক্তি পরে প্রেম এটা অন্য কারো বেলা খাটতে পারে, কিন্তু এর বেলা খাটে না। তা বলে প্রথম দর্শনে যদি কেউ কাউকে

মনোনয়ন না করে তা হলেও কি ভালোবেসে যেতে হবে? তা হলে স্বাধীনতা কোনখানে? কার হাত থেকে?

না, মনীষা দিয়ে এর মীমাংসা হতো না। হলো আবেগ দিয়ে। হৃদয়াবেগ। সহসা কে যেন বলে উঠল রত্নর মুখ অবলম্বন করে, "আমি থাকতে গোরী সোনালী হবে? কদাপি নয়।"

ঐ ক'টি কথা বলতে তার সংঘাতিক উদ্যম লেগেছিল। সে শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশোষিত ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বেশ! ও যদি আমার সঙ্গে ইলোপ করতে চায় তবে তাই হবে। তার আগে আমাদের দেখা নাই বা হলো। পরে দেখা হলে পছন্দ হবে না? এই তো। তখন আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হব।"

কানন যেন অকূল সমুদ্রে ভূমির সন্ধান পেলো। চাঁদমামার মতো আহ্লাদে আটখানা হয়ে পরক্ষণে আত্মসংবরণ করল। চুপি চুপি বলল, "কেবল একটু সংযম চাই।"

"একটু?" রত্ন সংশোধন করে বলল, "অনেকখানি!"

এর পর কানন বলতে বসল বেগমপুরের গল্প। রাজশাহী থেকে সে একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা আবিষ্কার করেছে। পদ্মা পার হয়ে কাতলামারি। কাতলামারি থেকে পায়ে হেঁটে বেগমপুর। বড়দিনের পর সরস্বতী পূজার সময়, তার পর দোলের সময়, তার পর পরীক্ষার শেষে বেগমপুর গিয়ে সে পারুলদিকে দেখে এসেছে। তার চেয়েও বড় আকর্ষণ যশোবাবুর বিলিতী বেহালা। যেটার সেকেন্ডহ্যান্ড না থার্ডহ্যান্ড দাম হলো গিয়ে বারো হাজার টাকা। স্ট্রাডিভেরিয়াস বেহালা ভারতে বোধ হয় ওই একখানিই। সারা পৃথিবীতেও খুব বেশী নেই। যা বিকোয় তা আসলি নয়। নকলি। আসলের কপি। বেহালা আবার যত পুরোনো হয় তত দামী হয়।

পারুলদি ওকে যশোবাবুর ওখানে উঠতে দেয় না, যদিও তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন তাঁর অতিথি হতে। সে ওঠে জ্যোতিদার আশ্রমে। মাইল দুই দূরে। কাপালিপাড়ায়। কাপালি বলে একটি অনুন্নত বা অস্পৃশ্য জাত আছে তারাই আশ্রমের মালিক ও শ্রমিক। জ্যোতিদা কেবল ট্রাস্টী বা ন্যাসী। আর দশ জনের মতো সেও গতর খাটায়, খেটে খায়। আশ্রমের জমিতে প্রায় সব

কিছু জন্মায়। ধান থেকে আরম্ভ করে কাপাস। সুতো কাটা তো হয়ই, ধুতি লুঙ্গি গামছাও বোনা হয়। জ্যোতিদার ইচ্ছা ঠিক সেই রকম একটি আশ্রম স্থাপন করা হয় মেয়েদের জন্যে। স্থাপন করে পারুলদি। ট্রাস্টী হয়। গতর খাটায়। খেটে খায়। সেই পথেই তার মুক্তি। ওদের বিয়ে ভেঙে যায় স্ত্রী যদি স্বামীর ভাত না খায়। তখন সে আবার বিয়ে করে। সকলে যোগ দেয়। পারুলদিকে তা হলে আইন আদালত করতে হয় না। সোজা সড়ক থাকতে বাঁকা গলি খুঁজতে হয় না।

পারুলদি কী বলে? পারুলদি বলে, না। যে শ্রেণীতে তার জন্ম সে শ্রেণী থেকে সে বড় জোর এক ধাপ নিচে নামতে পারে। উচ্চ শ্রেণী থেকে মধ্য শ্রেণীতে। কিন্তু সব চেয়ে নিচু ধাপটাতে নয়। নিম্নতম শ্রেণীতে নয়। তার চেয়ে গণিকা হওয়া শ্রেয়। গণিকাদের মধ্যে উচ্চতম শ্রেণীর গণিকা। যেমন কাশীর বাঈজী। সে জানতে চায় গতর খাটানো যদি পুণ্য হয় তবে দেহ খাটানো বা রূপ খাটানো কেন পুণ্য হবে না? কেন পাপ হবে? জ্যোতিদা তার সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠতে পারে না। ইঙ্গে বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ইঙ্গে বৌদি কাপালিপাড়া ঘুরে এসেছেন। তিনি ইবসেনের মন্ত্রশিষ্যা। নীতির দিক থেকে তিনি আদপেই কনভেনশনাল নন। তিনিও চান পারুলদির মুক্তি। কিন্তু ও সাফ বলে দিয়েছে, গতর খাটিয়ে মুক্তি সে আমার নয়। ছোটলোক হয়ে সাঙ্গা সে আমার নয়।

গতর খাটাবে না, কিন্তু শরীরকে শুকিয়ে সলতে পাকাবে। মাছ মাংস খাবে না। স্বামীর ভাত শ্বশুরের ভাত খাবে না। মাধবের প্রসাদ পাবে। তার জন্যে মাধবের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দেবে। আগে দেখা যেত সকালবেলা তার কাছে প্রজারা এসে দরবার করত, সে তাদের হয়ে শ্বশুরকে বলত, ম্যানেজার মশায়কে বলত। আজকাল সে ফুল তোলে, মালা গাঁথে। এই সব করে সকালটা যায়। আগে দেখা যেত দুপুরে গড়ালে পাড়ার বৌঝিরা এসে তাকে ঘিরে বসত। শৌখীন সূচীশিল্প শিখত। শেখাত নক্সী কাঁথার কাজ। সেই সূত্রে সে তাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে ভজাত। বীরাঙ্গনা হতে হবে, বীরজায়া হতে হবে, বীরমাতা হতে হবে। স্বামী বা ছেলে যদি দেশের জন্যে প্রাণ দেয় তবে আনন্দ করতে

হবে। আনন্দের সঙ্গে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। আজকাল বৌরানীর বৈঠক বসে না। বৌরানীকে দেখা যায় মাধবের মন্দিরে। সেখানে শীতল সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুতুলের ভোগ।

সন্ধ্যাবেলা দেখা যেত সে জ্যোতিদার সঙ্গে বসে পড়াশুনা করছে। দাদা তাকে ভালো ভালো ইংরেজী বই মুখে মুখে তর্জমা করে শোনাত। কাব্য উপন্যাস থেকে দর্শন বিজ্ঞান। দু'জনে মিলে তর্ক বিতর্ক করত। আজকাল সে আরতি দেখবে বলে উঠে যায়। ফিরে আসে না। এ ছাড়া তার মণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে যখন তখন তার রাজনীতিচর্চা চলত। ওরা এখন কেউ জেলে কেউ আড়ালে আবডালে। সে একা একা এক হাতে কতটুকু রাজনীতির রণ করবে! ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো এক দিন হয় তো সাত দিন বন্ধ থাকে। তার পর বেবাক বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে হয় মাধবের রাজবেশ, রাখালবেশ। মাধবের সঙ্গে যে রাধা আছেন তাঁকেও রানী সাজানো হয়, গোপী সাজানো হয়। এই তো সেদিন দোললীলা হয়ে গেল।

ক্রমেই সে জ্যোতিদার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। জ্যোতিদা বলছে, রত্ন যদি নিতে চায় নিক এ দায়িত্ব। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এর চেয়ে ভারত উদ্ধার সহজ। ইঙ্গে বৌদি বলছেন, ওকে ডুবতে বা সাঁতার কাটতে দাও। ও তো কচি খুকী নয়। যতদিন নাবালিকা ছিল ততদিন তোমার দায়িত্ব ছিল। এখন ও পূর্ণ সাবালিকা।

কিন্তু জ্যোতিদার মুশকিল হয়েছে এই যে পারুলদি তার চোখে এখনো সেই ষোল বছরের বিষাদিনী অসুখিনী। ক্ষয়রোগ হয়েছে বলে সন্দেহ করে যাকে ভাগলপুরে মামার বাড়ী পাঠানো হয়েছিল। ও নাকি তখন ছিল জ্যোতিদার মেলিসান্দা। আর জ্যোতিদা নিজেকে কল্পনা করত পিলিয়াস। ও যদি রাজী হতো ওকে নিয়ে সে কোথাও পালিয়ে যেত। সেবা দিয়ে শুশ্রূষা দিয়ে সারিয়ে তুলত বাঁচিয়ে রাখত। ওর মন পেলে ওকে বিয়ে করত। তা হবার নয়। ও পড়ে গেল এক ডাক্তারের প্রেমে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। ডাক্তার যে ওকে চিকিৎসা দিয়ে সারিয়েছে। যত্ন দিয়ে বাঁচিয়েছে। তার পর ওকে ফিরিয়ে আনা হলো শ্বশুরবাড়ীতে। জ্যোতিদা-ই ওর ভগ্নহৃদয়ের ধন্বন্তরী হয়। ওকে জ্ঞান

দিয়ে নিরাময় করে। রাজনীতি দিয়ে ব্যাপৃত রাখে। অর চোখে ও মেলিসান্দা-ই রয়ে যায়। কিন্তু ওর চোখে সে পিলিয়াস হয় না। হবেও না। জ্যোতিদার মনে আফসোস। কিন্তু সে এখন অনেক বড় সাধনা নিয়ে মগ্ন। সে সাধারণ রাজনীতিক নয়। সে তার বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। তার জীবনটা তার পিতার জীবনের প্রতিবাদ।

জ্যোতিদার বাবা মুস্তফী মশায় সামান্য জমিদারি কর্মচারী থেকে উঠতে উঠতে এখন বেগমপুরের ষোল আনা শরিকের কমন ম্যানেজার। প্রজারা বাঘের মতো ভয় করে, অধীনস্থরা ভূতের মতো ডরায়, বাবুরাও সমীহ করেন। তাঁর হাত কিন্তু পরিষ্কার নয়। বিষয় সম্পত্তি বিস্তর করেছেন। প্রজা আর জমিদার উভয় পক্ষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছেন। ওদিকে তান্ত্রিক সাধক। প্রচ্ছন্ন কাপালিক। ছেলে তাই কাপালি হয়ে শোধ তুলছে। বাপ চলে ডালে ডালে তো ছেলে চলে পাতায় পাতায়। হিরণ্যকশিপু বনাম প্রহ্লাদ। এই যুদ্ধ জ্যোতিদাকে মাতিয়ে রেখেছে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ। ইংরেজ বনাম ভারতীয়। বোঝার উপর শাকের আঁটি পারুলদির মুক্তির সংগ্রাম। যশোমাধব বনাম শ্রীমতী। তিন তিনটে লড়াই যার কাঁধে সে একজন জাতসৈনিক। ঐ খাদি হচ্ছে ওর ইউনিফর্ম। আর ঐ আশ্রমটা ওর শিবির। ও কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ধার ধারে না। হিংসাপ্রতিহিংসায় মনের পরিচ্ছন্নতা লোপ পায়। অপরিচ্ছন্ন মন দিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় না। ভাবী ভারতের ভাবী সমাজের স্বপ্ন। তা ছাড়া জ্যোতিদার ধাতটা আন্তর্জাতিক। ইঙ্গে বৌদির প্রভাবে সে মানুষ হয়েছে। সাহেব খুন করার কথা সে ভাবতেই পারে না। শুনলে কষ্ট পায়।

অনেক লোক আছে যাদের সাজপোশাক পাশ্চাত্য, কিন্তু ভিতরটা প্রাচ্য। তেমনি কতক লোক আছে তাদের বেশভূষা আচারব্যবহার ভারতীয়, কিন্তু চারিত্র্য ও চিন্তাপ্রণালী ইউরোপীয়। এ রকম একজন ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। একজন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। একজন জ্যোতিদা। তাকে চিনতে সময় লাগে, সূক্ষ্মদৃষ্টি লাগে, বিশ্লেষণশক্তি লাগে। তার বন্ধু ও সহকর্মীদেরই কাছে সে অচেনা। পারুলদিও কি তাকে চেনে? এটাও তার অন্যতম আফসোস।

তা বলে তার লেশমাত্র ত্বরা নেই আপনাকে চেনাতে। আপনাকে সে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত। জাহির করতে নয়। সাধারণ রাজনীতিকদের সঙ্গে তার বনবে কেন? অন্যেরা যখন চক্রান্ত করছে সে তখন হাল ঠেলছে বা বীজ বুনছে। অন্যেরা যখন নাম কিনছে সে তখন কুয়ো খুঁড়ছে বা জল সেচ করছে। তবে গান্ধীজীর ডাক শুনে সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে জেলে যেতে লাঠি খেতে সে প্রতি দিন প্রস্তুত হচ্ছে। সে যা খায় তা জেলের খোরাক বা সেই জাতীয়।

রত্নকে সে গোড়ার দিকে সুনজরে দেখেনি। মনে করেছিল মধ্যশ্রেণীর আর একটি রোমান্টিক ইনটেলেকচুয়াল। ও রকম তো আরো দেখা গেছে। ধীরে ধীরে তার ধারণা বদলে গেছে। এখন শ্রদ্ধা ও স্নেহচক্ষে দেখে। বলে, রত্ন কোনোখানেই খাপ খাবার ছেলে নয়। কোনো দেশে, কোনো জাতিতে, কোনো ধর্মে, কোনো শ্রেণীতে, কোনো সঙ্ঘে, কোনো সমাজে। কেউ বলতে পারবে না যে রত্ন পুরোপুরি আমার দলে। এমন কি সাত ভাই চম্পাও তেমন দাবী করতে পারে না। কিন্তু এইখানেই ওর দুর্বলতা। জনগণের সঙ্গে খাপ খেতে না জানলে বিংশ শতাব্দীর জগতে কোনো বড় কাজ করা যায় না।

জ্যোতিদা ললিতকেও ভালোবাসে। কিন্তু তার রাজনীতিক কার্যকলাপ সমর্থন করে না। ওটা একপ্রকার য়্যাডভেঞ্চার। পাবুলদির রাজনীতি তো রীতিমতো রোমান্স। কিন্তু সে তার নিজের মতবাদ এদের কারো উপর চাপাতে চায় না। তার বিশ্বাস এরাও একদিন জনগণের কাছে যাবে ও তাদের উপর এদের রাজনীতি না চাপিয়ে তাদেরই স্বার্থে সংগ্রাম করতে শিখবে।

এর পর কানন ও রত্ন ললিতের পিসির বাড়ী গেল। সেখানে রত্ন যত ক্ষণ স্নান করতে থাকল কানন তত ক্ষণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রঙ্গ করতে থাকল। ক্ষেন্তির সঙ্গেও। কাননের কাছে ওর ঘোমটার বালাই নেই। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা। নাকে নাকছাবি।

ললিত বাড়ী ফিরল মুখে হাসি নিয়ে। হাতে একখানা গাঢ় নীল রঙের বই। কানন সেখানা কেড়ে নিয়ে সেখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রত্নর দিকে বাড়িয়ে দিল। রত্ন কিন্তু সহজে হাতছাড়া করল না। মুগ্ধের মতো

নিরীক্ষণ করল। পাশপোর্ট! এই নিয়ে বিদেশ যাত্রা করতে হয়! কবে তারও এমনি একখানি পাশপোর্ট হবে!

"তার পর জাহাজের খবর কী? প্যাসেজ বুক করা হয়েছে?" রত্ন কৌতূহলী হলো।

"পাশপোর্ট মিলবে কি না সন্দেহ ছিল বলে ওসব দিকে নজর দিতে পারিনি। চল কাল আমার সঙ্গে বেরোবে। টমাস কুকের ওখানে।" প্রস্তাব করল ললিত।

রত্ন খুশি হয়ে বলল, "বেশ তো।" সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল যে গোরীর চিঠিপত্র কুষ্টিয়ার ঠিকানায় যাচ্ছে। সেখানে কার হাতে পড়ছে কে জানে! তাকে কলকাতার ঠিকানা দেওয়া হয়নি। কোথায় ওঠা হবে তা অনিশ্চিত ছিল। রত্ন একই নিঃশ্বাসে বলল, "ওঃ তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। আজকেই আমি বাড়ী চললুম পাঁচটার ট্রেনে। বিশেষ কাজ আছে। বুঝলে? না আরো খুলে বলতে হবে?"

ললিত ও কানন দু'জনেই হেসে উঠল। বিশেষ কাজ আছে! কী কাজ তারা বুঝেছিল।

খাওয়াদাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিয়ে ললিত বলল, "চল না একটা স্টুডিওতে গিয়ে গ্রুপ ফোটো তোলানো যাক। জাপান চলে যাই তো তিনজনে আবার কবে একত্র হব!"

কানন বলল, "পারুলদি কিন্তু গ্রুপ ফোটো চায়নি। চেয়েছে একার ফোটো।"

রত্ন রক্তিম হলো। ললিত বিবর্ণ। দু'জনে দু'জনকে এক নজরে দেখে নিল। কানন টের পেলো না রহস্য। সে তো জানত না যে ললিতও পারুলদিকে ভালোবাসত। এখনো বাসে। সেই জন্যেই জাপান যাচ্ছে। যত দূরে পারে তত দূরে।

রত্ন গভীর শ্বাস ফেলে বলল, "থাক। আজ আমি ক্লান্ত। তোমাকে জাহাজে তুলে দিতে আমরা সকলেই আসব। সে সময় আরো বড় গ্রুপ ফোটো তোলানো যাবে।"

তেরো

"Home! Sweet home! There's no place like home!"

বাড়ীতে পা দেবার আগেই গুনগুনিয়ে উঠছিল রত্ন। মার্কিন গীতিকার বিখ্যাত কলি। মা নেই যদিও, ঠাকুমা নেই যদিও, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে যদিও, তবু বাড়ী হচ্ছে বাড়ী। তার মতো আর কিছু নয়।

রত্নর বাবা ছেলেমেয়েদের জীবনে হস্তক্ষেপ করতেন না। উপদেশ পর্যন্ত দিতেন না। একটিমাত্র আশীর্বচন ছিল তাঁর মুখে।—"কৃষ্ণে মতি হোক।" রত্ন বাড়ী পৌঁছে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—"কৃষ্ণে মতি হোক।" সঙ্গে সঙ্গে সেও তার নিজের ভাষায় তর্জমা করে নিল। মনে মনে। রাধায় মতি হোক। গোরীতে মতি হোক।

বড়মা'কে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গেলে তিনি তাকে কোলে টেনে নিয়ে অশ্রুমোচন করলেন। আহা! মা অভাগী বেঁচে থাকলে কত সুখী হতো। তিনি বার বার উচ্চারণ করতে থাকলেন, "আমার রতনমণি! আমার রতনমণি!"

ছোট ভাই রম্যকান্ত চাষগাঁয়ে থাকে। ছোট বোন টুকু দাদাকে টিপ করে একটা প্রণাম করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল। বাইরে থেকে শোনা গেল, "দেব না। দেব না। আমার জন্যে কী এনেছ আগে বল।"

রত্ন অনুমানে বুঝেছিল গোরীর চিঠি পড়েছে টুকুর হাতে। সর্বনাশ! যদি খুলে থাকে! বয়স বারো তেরো, কিন্তু দেখতে আরো বড় দেখায়। শ্যামা মেয়ে। সুশ্রী। তার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। দাদাদের ইচ্ছা নয়, কিন্তু বাবার ইচ্ছা যথাসত্বর কন্যাদায়মুক্ত হয়ে বৃন্দাবনযাত্রা করা ও ব্রজবাসী হওয়া।

তবু ভালো যে গোরীর চিঠি টুকুর হাতে পড়েছে। বাবার হাতে পড়েনি। নয়তো তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা বলতে হতো। ছিল তার সঙ্গে টুকুব জন্যে কেনা কেশতৈল তরল আলতা সুগন্ধ সাবান শৌখীন প্রসাধন পেটিকা। বার করে দিতে হলো তক্ষুনি।

চিঠিগুলো টুকু নিমেষের মধ্যে কোনখান থেকে এনে সুটকেসের ভিতরে

গুঁজে দিয়ে গেল। কেউ দেখতে পেলো না কার চিঠি। সে বোধ হয় আন্দাজ করেছিল যে চিঠিগুলো তার সম্ভবপর বৌদির। কিন্তু কাউকে জানতে দেয়নি।

সুটকেস সমেত রত্ন চলল তার কোটরে। দোতলায় একখানিমাত্র ঘর। সিঁড়িটা বাড়ীর বাইরে। ঘরখানি রত্নর বইপত্রে ভরা। তাই সে না থাকলে বন্ধ থাকে। ওখান থেকে নদী দেখা যায়। গোরাই নদী। উত্তরে। উত্তর দক্ষিণ খোলা।

যার জন্যে সে কলকাতার জামাই আদর ছেড়ে চলে এলো, এই সে চিঠি। প্রিয়ার চিঠি। তিন তিনখানা চিঠি। অহো ভাগ্যম্!

কোনখানা ফেলে কোনখানা আগে পড়বে? রত্ন একসঙ্গে তিনখানা খুলে সামনে রাখল। কোনোখানাই খুব ছোট নয়। এখানার একটু ওখানার একটু এমনি করে তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদ নিতে লাগল। গোরী যেন তার নির্জন ঘরে তার সঙ্গে বসে কথা বলছে। কেরোসিনের নরম আলোয়। ইচ্ছা করলে তাকে ছোঁয়া যায়। তবু সে ধরাছোঁয়ার অতীত।

রত্নর হৃদয়ে অব্যক্ত ব্যথা। অসহায় বিরহের। কথা বলাবলি কত কাল চলবে। কথা বলতে কথা শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু তাব চেয়েও ভালো লাগে কথা না বলতে কথা না শুনতে। চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকতে। নীরব সান্নিধ্য পেতে। শুধুমাত্র সান্নিধ্য। আর কিছু নয়। এমনি কেরোসিনের আলোয়। এমনি আলো-আঁধারিতে। একটুখানি দেখা। অনেকখানি না দেখা। ইচ্ছা করলে ছোঁয়া যায়। তবু না ছোঁয়া।

চিঠি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল গোরী যেন পাশে বসে কথা বলছে। জ্যোতির কথা। কাননের কথা। কাননের হাতে পাঠানো জুতোর কথা। এমনি কত কথা। সুধা নাকি তাকে বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে অমন করে সতীন ডেকে না আনতে। আপোস করতে। মেয়েমানুষের অত তেজ ভালো নয়। কাঁদতে জনম যাবে।

তার মন এখন অতিশয় অশান্ত। শান্ত অবশ্য কোনো দিন ছিল না, তা বলে এ রকম অশান্তও এর আগে ছিল না। কেন এই অপরূপ অশান্তি? নতুন

বৌ আসবে বলে কি? না। সে জন্যে নয়। আসে আসবে। গোরী তত দিন থাকলে তো! সে কাউকেই ভয় করে না। ভয় করে শুধু একজনকে। সেই একজনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে। সেই একজন যদি বলে, "এই গোরী! না, না। একে তো আমি চাইনি। একে তো আমি ভালোবাসিনি। না, না। এ নয়। এ নয়।" রাজা দুষ্যন্ত যেমন শকুন্তলাকে দেখে চিনতে পারলেন না। কিংবা চিনেও চিনলেন না। অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন। প্রেমবতীকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

গোরী তখন কী করবে? সে কি শকুন্তলার মতো পথে পথে ঘুরবে? কোনো এক মেনকা এসে তাকে মেনকালয়ে নিয়ে যাবে? একালের মেনকার মেনকালয় শহরের বুকে। সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সোনালীর মতো কত সোনার মেয়ে। গোরীও আশ্রয় পাবে। না, অত বড় অপমানের পর সে আর কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না। শ্বশুরবাড়ীর দ্বার তো চিরদিনের মতো রুদ্ধ। বাপের বাড়ীর দরজাও বন্ধ। বন্ধুরা নিশ্চয় সদয় হবে, সে কিন্তু দয়ার দান নেবে না। যেখানে তার জোর নেই সেখানে সে যাবে না। সেখানে সে থাকবে না। অগত্যা অগতির গতি মেনকালয়। সেখানে তার কিছুটা জোর খাটবে। রূপের জোর। তার থেকে রুপেয়া আসবে। সে কারো গলগ্রহ হবে না। রাখীবন্ধ ভাইয়েরও না। রূপ ছাড়া আর কীই বা আছে তার! তার কি বিদ্যা আছে না শিক্ষা আছে যে সে ব্রাহ্ম মেয়েদের মতো স্বাবলম্বী হবে? যার যা আছে সেই তার উপজীবিকা।

পড়তে পড়তে রত্ন থ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ মরীয়া না হলে কি কেউ এসব লেখে? সে চিঠি রেখে দিয়ে ভাবে। আবার পড়ে। আরো পড়ে।—

> ঘরে থাকা আমার হবে না। মাধবও আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। তুমিই জিতবে। তুমিই আমার প্রিয়তর। আমি যাবই। যাব একদিন তিমির রাত্রে শ্রীরাধার মতো। বাঁশির ডাক শুনে। বৃষ্টি পড়ছে, হাওয়া উঠছে, পথ দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি যাব। যাব বাঁশির সুর ধরে। কে জানে কোন দিকে বাঁশি। কে জানে পশ্চিমে না পূবে। তবু আমি যাব।

দ্বিতীয় ভাগ

কে জানে কত দূরে বাঁশি। এক রশি দূরে না এক ক্রোশ দূরে। তবু আমি যাব। তবু আমি পৌঁছব।

পৌঁছব তোমার কাছে। কিন্তু এমন অন্ধকার যে তোমার মুখ দেখতে পাব না। কে তুমি? কেমন দেখতে? জানতে পাব না। কেমন করে তা হলে তোমাকে চিনব? ওগো আমার অদেখা অচেনা বল্লভ! তুমি যে আমার চিরপরিচিত কান্ত। তোমাকে যদি ভালোবেসে থাকি, ভালোবাসা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে ভালোবাসার আলোয় আমি চিনব। যেখানে আলো আছে সেখানে আঁধার কোথায়? আর তুমিও তো আকাশের ধ্রুবতারার মতো দেখতে। শত অন্ধকারেও চেনা যায়। যার হাতে আলো নেই সেও চিনতে পারে কোন সুদূরের ধ্রুবতারাকে।

কিন্তু জানিনে, তুমি চিনবে কি না আমাকে। আমি তো ধ্রুবতারা নই। আর তোমার অন্তরে আলো আছে কি না কেমন করে বলব! ওগো তুমি রাগ করলে না তো? এখনো আমার সন্দেহ? তোমার কাছে আমার কিছুই লুকোনো নেই। তবু কোন নারী কোন পুরুষকে সব কিছু খুলে দেখায়! তুমি যদি অন্তর্যামী হয়ে থাক তবে আপনি জানবে। জানলে কি ভালোবাসতে পারবে? না। আমার প্রত্যয় হয় না। দোষ তোমার নয়। দোষ আমারও নয়। দোষ আমার পরিস্থিতির। আমার পরকীয়া অবস্থার। এর থেকে আমি পরিত্রাণ চেয়ে পাইনি। নয়তো আমি তোমার সম্মুখীন হতে লজ্জায় মরে যেতুম না।

দেখা না দেখায় কী আসে যায়? আমবা যে কেউ কাউকে দেখিনি সংকট এখানে নয়। হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের ছেলেমেয়েরা অদেখা অচেনার পাণিগ্রহণ করে এসেছে। শুভদৃষ্টি ঘটেছে বিবাহের পূর্বে নয়, পরে। তা বলে মোহভঙ্গ ঘটেছে ক'জনের! অনুতাপ করেছে ক'জন! অসুখী যারা হয় তারা অন্য কারণে হয়। যারা দেখে শুনে বিয়ে করেছে তারাও। এক কথায় বলতে গেলে—যে যার নয়, সে তার নয়। যে যার, সে তার। একবার যখন বোঝা গেল কে কার তখন কেন আমি চোখের দেখার জন্যে সবুর করতে যাব? আমি তোমার হাতে আমার হাতের রাখী

বেঁধেছি। তার মানে কী তাও তোমাকে বলেছি। ওই আমার মালাচন্দন। ওই আমার স্বয়ংবর।

ওগো তোমাকে চোখে দেখে যদি আমার পছন্দ না হয় তা হলেও তুমি আমার। দেখতে ভালো হলেও আমার, কালো হলেও আমার। খোঁড়া হলেও আমার। কানা হলেও আমার। আমার দিক থেকে চোখের দেখার তেমন গুরুত্ব নেই। যেমন তোমার দিক থেকে। তুমি তো, কই, আমাকে তোমার হাতের রাখী পাঠাওনি। তুমি স্বাধীন পুরুষ। প্রেমের জন্যে তোমার স্বাধীনতা খাটো করনি। করবেও না। আমাকে চোখে দেখে যদি তোমার অপছন্দ হয়, যদি তোমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার অন্তর ভেদ করে এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমার অরুচিকর, তা হলে আমি কোথায় দাঁড়াব! ওগো আমি যে তোমার মর্মভেদী দৃষ্টির বাণে বিদ্ধ হয়ে মরে যাব। না, না। আমি তোমার সম্মুখীন হতে পারব না। আমার সাহস হয় না। আমি কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতেই পারি। ওই পর্যন্ত আমার সাহসের দৌড়।

তবু যেতে হবে। পালে বাতাস লেগেছে। বেশ বুঝতে পারছি বন্দরের কাল হলো শেষ। এবার ভাসতে হবে। ভাসতে ভাসতে আমি তোমার ঘাটেই যাব। তুমি যদি ভিড়তে না দাও আবার ভাসব। ভাসতে ভাসতে অঘাটায় যাব। ভাসতে ভাসতে দরিয়ায় যাব।

রত্নর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। সে কোনো মতে বাকীটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিচে নেমে গিয়ে গল্প করতে বসল। আজ তার আসার কথা ছিল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে পেয়ে সবাই খুশি। কিন্তু রান্না যা হয়েছে তা খুশি হবার মতো নয়। আবার রাঁধতে হচ্ছে। তাই বসে বসে গল্প।

বাবা বলছিলেন, একবার খুব মজা হয়েছিল। নারদ গিয়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে বলেন, ঠাকুর, আমার চেয়ে বড় ভক্ত তোমার কেউ আছে? নারায়ণ একটু ভেবে বললেন, হাঁ। আছে বই-কি। মর্ত্যলোকে অমুক গ্রামে এক গৃহস্থ থাকে। সে-ই আমার সব চেয়ে বড় ভক্ত। নারদ গিয়ে দেখেন লোকটা

স্ত্রীপরিবার গোরুবাছুর অতিথি অভ্যাগত চাষবাস বিষয় আশয় নিয়ে আকণ্ঠ ডুবে আছে। সেবাপূজো করবে কখন! হরিনাম করতেও ফুরসৎ পায় না। যখন শুতে যায় তখন শুধু বলে, "হরি হে, দীনবন্ধু।" আর দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাত্রে উঠে আর একটি বার বলে, "হরি হে, পার কর।" ও যে ঘোর সংসারী লোক! ও-ই হলো তোমার সব চেয়ে বড় ভক্ত! আর আমি নারদ চব্বিশ ঘন্টা তোমার পায়ের কাছে আছি, সেবা করছি পূজো করছি নামগান করছি, আমি কিনা ওর চেয়ে ছোট! আমার না আছে স্ত্রী, না আছে পরিবার, আমি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী মায়ামুক্ত বাসনাকামনাহীন। তবু ছোট! এই তোমার বিচার!

নারায়ণ বললেন, আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাদের দুজনকে পরীক্ষা করব। ছদ্মবেশ ধরে তাঁরা সেই গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হলেন। গৃহস্থ করযোড়ে বললেন, কী আদেশ? নারায়ণ বললেন, দুটি কলস নিয়ে এস। তেল ভর কানায় কানায়। একটি তুলে নাও তোমার মাথায়। একটি তুলে দাও আমার শিষ্যের মাথায়। দুজনে আমাকে দশ হাত দূর থেকে প্রদক্ষিণ কর। আমি যখন বলব তখন থামবে।—তাই হলো। নারদ ভাবলেন এ আর কঠিন কথা কী? প্রদক্ষিণও চলবে, নামগানও চলবে। চললেন নেচে নেচে হরিগুণ গেয়ে। আর গৃহস্থ জানতেন একটু অসতর্ক হলে তেল গড়িয়ে পড়বে। তেল তো এখন তাঁর নয়। তাঁর অতিথির। তেল নষ্ট করলে অতিথির অসম্মান হবে। গৃহস্থ তাই পরম একাগ্র ভাবে কর্তব্য সম্পাদন করতে লাগলেন। হরিনাম করবেন কখন? করলে কি একাগ্রতা থাকবে?

ওদিকে নারদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তেল গড়াতে গড়াতে ভাঁড় খালি। ঠাকুর তখন থামতে বললেন। দুজনেই তাঁর কাছে এলেন। ঠাকুর হাসলেন। হেসে বললেন, খালি ভাঁড় মাথায় করে নাচতে তো বলা হয়নি। সে তো সকলে পারে। তেল এক ফোঁটা কম হবে না। অথচ আমাকে প্রদক্ষিণ করা হবে। তুমি তোমার মাথার বোঝা ফাঁকি দিয়ে হালকা করে নিয়েছ। গৃহস্থ তা করেনি। তার বোঝা সমান আছে। তা নিয়ে সে একমনে প্রদক্ষিণ করেছে। কোনটা কঠিন? আমি চাই কথা নয়, কাজ। নাম নয়, কাম। সেবা বল, পূজো বল, সমস্তই ফাঁকি,

যদি কাজে ফাঁকি দাও। সকলে যদি কাজে ফাঁকি দেয় এ সৃষ্টি একদিনেই অচল হবে। যাদের উপর সংসারের ভার দিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে বসে আছি তারা যদি যে যার কর্তব্য না করে তা হলে আমারও বৈকুণ্ঠবাস হবে না। এই গৃহস্থ আমাকে বৈকুণ্ঠে রেখেছে। অতএব এই আমার সব চেয়ে বড় ভক্ত।

গল্প সারা হলো। রত্ন বুঝতে পারল গল্পচ্ছলে বাবা তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। পরে বড়মা'র কাছে শুনল ওটা পরোক্ষে পুত্রকে উপদেশ। ও যেন নারদের মতো অসংসারী না হয়ে গৃহস্থের মতো সংসারী হয়। সংসারের বোঝা ঘাড়ে নেয়। বাপকে বৃন্দাবনে রাখে। বড়মা'কে রত্ন মুখ ফুটে বলতে পারল না যে সংসারী হওয়া তার কাম্য নয়, যদি হয় তবে গোরী বলে একটি মেয়েকে ঘর দেবার জন্যে হবে।

যে বোঝা সে মাথায় তুলে নিয়েছে সংসারভার তার তুলনায় ভারী নয়। একটি বন্দিনী নারীকে বন্ধনমুক্ত করা, একটি কায়িক প্রতিরোধকারিণীকে মনের জোর জোগানো, একটি প্রেমিক প্রাণকে তৃষ্ণার জল দিয়ে বাঁচানো, একটি সুন্দর সত্তাকে শতদলের মতো বিকশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া—এ ভার সে সাধ করে নেয়নি। নারায়ণই তাকে নিতে বলেছেন। এক মনে বহন করাই তার কর্তব্য। কিন্তু ও কথা সে বোঝায় কাকে! কে বুঝবে!

রত্ন সে রাত্রে ক্লান্তিতে কাতর বোধ করছিল। গোরীকে চিঠি লিখতে পারল না। পরের দিন ভোরে উঠে লিখতে বসল। লিখল প্রথমে কার্পেটের পাদুকার প্রসঙ্গ। কী বলে ধন্যবাদ দেবে? সম্বন্ধটাও ধন্যবাদ দেওয়ানেওয়ার নয়। তবু সে তার ধন্যতা না জানিয়ে থাকতে পারছিল না। তার পদযুগ ধন্য। প্রিয়ার পদপল্লবের অপ্রত্যক্ষ স্পর্শে পুলকিত। প্রিয়ার করাঙ্গুলিও অলক্ষিতে ছুঁয়ে গেছে তার চরণ। উল্লাসের আতিশয্যে তার পা পড়ে না মাটিতে। গোরী তাকে আসমানে তুলে দিয়েছে।

গোরী, তোমাকে আমি গোরী বলে ডাকি এতে তুমি খুশি নও। নিত্য নতুন নামে ডাকতে বলেছ। কিন্তু তোমার দেওয়া তালিকায় যতগুলি নাম আছে গোরী নামটির মতো সুন্দর একটিও নয়। আজ পর্যন্ত যত

নাম আমি পড়েছি বা শুনেছি গোরী নামটির মতো মধুর কোনোটি নয়। না জানি কতেক মধু গোরী নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে। গোরী, গোরী, গোরী, কত বার যে মনে মনে ডাকি, লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকি, তা যদি তুমি জানতে! কেন ডাকি? এমনি। ডেকে সুখ পাই। স্বাদ পাই। এ নাম যদি তোমার কানে সুধা বর্ষণ না করে তবে মনে রেখো নামের উপর কানের দাবীর চেয়ে মুখের দাবী আরো বড়। কান খুশি নয় বলে মুখ কেন তার দাবী ছাড়বে? তবে তোমার যদি সাড়া না পাই তবে ও নামে ডাকব না। তার বদলে ডাকব—প্রেম। তুমিও আমাকে এই নামে ডেকো। দু'জনের একই নাম হোক। প্রেম।

প্রেম, তুমি আমার কাছে আসবে এমন ভাগ্য কি আমার হবে! আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও। তুমি আমাকে যে ভাবে চাইবে সেই ভাবেই পাবে। যদি বল ভাই তা হলে ভাই। যদি বল কান্ত তা হলে কান্ত। যদি বল বর তা হলে বব। আমি তোমাকে "না" বলব না। তোমার হয়তো মোহভঙ্গ হবে। তখন তুমি অন্য ভাবে চাইতে পার। আর আমার যদি মোহভঙ্গ হয়? হবে না, জানি। তবু যদি হয় তবে আমি তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বদলে নেব। আমরা যে একই মাপে তৈরি। যুগল যদি না হই তবে যমজ।

তোমাকে উপহার পাঠাতে গিয়ে দেখলুম আমার হাতের কাজ তো নয়। বাজারের কেনা। কী তার মূল্য! ভাবছি কী দিই। রাখীর বিনিময়ে রাখী দিইনি বলে তুমি এত দিন পবে ভুল বুঝেছ। ওগো তুমি যেমন আমাকে বরণ করেছ আমিও তেমনি তোমাকে ববণ করেছি। বলিনি কি তোমাকে রাম না জন্মাতে রামায়ণ রচনার কাহিনী? কেমন করে কী যে হয়ে গেল তা উপন্যাসের চেয়েও আজব। গত মাঘী পূর্ণিমার আগের মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে প্রভাতের মুখে শুনি তোমাব রূপবর্ণনা। তোমার ভালো নাম। সেদিন কি আমি জানতুম তুমি কে? সেদিন কি আমি ভাবতে পেরেছি যে তুমি অগ্রণী হয়ে চিঠি লিখবে আমাকে মাস ছয়েক বাদে? সেদিন কি ধ্যানগম্য ছিল যে তুমি আমার, আমি তোমার? কেন তা হলে

আমার আতঙ্ক জাত হলো? তোমার প্রতি আতঙ্ক! সেই যে আতঙ্ক সেটা প্রেমেরই ছদ্মবেশ। আমার অচেতন মন সেই দিনই তোমাকে বরণ করে নিয়েছে। আমার সচেতন মন তা টের পায়নি। মাস ছয়েক পরে যখন তোমার চিঠি এলো তখন আমার অচেতন মন আবার তোমাকে চিনে নিল। সচেতন মন তা স্বীকার করল না। কেটে গেল আরো মাস ছয়। এবার যখন মাঘী পূর্ণিমার রাত এলো তখন এলো স্বীকৃতি।

এখন বল তুমি আমাকে চিনে নিলে না আমি তোমাকে চিনে নিলুম? কে কাকে বরণ করল? কে আগে? কে পরে? আমি যদি বলি, আমিই আগে! এই অসম্ভব রূপকথা কেই বা বিশ্বাস করবে! অবিশ্বাস্য বলে আমার সংশয়ী মনীষা আজো নিঃসংশয় হয়নি। সে বলে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে নেই। সে বলে প্রথম দর্শনের ক্ষণে মোহভঙ্গ হতে পারে। আমার নয়। তোমার। এত দিন আমি আশঙ্কা করে এসেছি মোহভঙ্গ হবে তোমারি। কিন্তু তুমি যা লিখেছ তা পড়ে মনে হয় আশঙ্কাটা তোমারও কম নয়। বরং তোমারি বেশী। তুমি ওকে সঙ্কট বলেছ। ওর কারণও ব্যক্ত করেছ ইঙ্গিতে। তুমি এত ভয় পেয়েছ যে আমাকে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না। আমার মর্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে আসতে পারবে না।

তাই যদি হয় তবে তুমি আমার কাছে আসবে এটা দুরাশা। আমিই বা তোমার কাছে গিয়ে কী করব! ওদিকে ললিত আর কানন দুজনেই আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছে—কী মন্ত্রণা দিয়েছে, শুনবে? তোমাকে নিয়ে ইলোপ করতে! শোন কথা! যারা কেউ কাউকে চক্ষে দেখেনি, কবে দেখবে তাও জানে না, দেখলে পেছিয়ে যাবে কি না ঠিক নেই, যাদের একজনের ভয় আরেক জনের চাউনিকে, যারা যুগল না যমজ এখনো অপরীক্ষিত—তারা করবে ইলোপ! এ কি সম্ভব! কিন্তু কানন যা বলল তা আমার যুক্তি-সেনাকে বিপর্যস্ত করল। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি থাকতে গোরী সোনালী হবে! কদাচ নয়! ও যদি আমার সঙ্গে ইলোপ করতে চায় তবে তাই হবে। তার আগে আমাদের দেখা নাই বা হলো। পরে দেখে

পছন্দ হবে না, এই তো? পছন্দ না হলে আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হব।

ইলোপ করার বিরুদ্ধে একাধিক যুক্তি আছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে ইলোপ কর সমাজকে তার পরে সমঝাতে পারবে না যে তুমি নির্দোষী, তোমার বিবাহ বলপূর্বক দেওয়া হয়েছিল বলে অসিদ্ধ হবার যোগ্য। সমাজ তোমাকেই দোষ দেবে। বিবাহ থেকে মুক্তি না পেলে তোমার মুক্তি অসমাপ্ত রয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার বিবাহ সমাজসম্মত হবে না। সমাজের চোখে তুমি হবে পরকীয়া। হয়তো তোমার আপন চোখেও। তোমার চিঠিতেও পরকীয়া এই শব্দটির উল্লেখ আছে। আমাকে ওটি এমন বেদনা দিল! সারাজীবন দেবে, যদি তুমি ওই ধারণা পোষণ কর। পরকীয়া প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। আমার প্রেমের ভিত্তি স্বকীয়া প্রেম। তুমি আমার স্বকীয়া। তুমি পরকীয়া নও, পরাধীনা। কিন্তু সমাজ তা মানবে না। তুমিও যদি না মানো তবে পরে অসুখী হবে, অসুখী করবে। এবং অসুখটার নিদান ঠাওরাবে যা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছ। যা তোমাকে আমার দৃষ্টিভীরু করেছে।

আজ তাই আমি তোমাকে খোলাখুলি বলতে চাই তুমি যে সঙ্কটের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়েছ সেটা অমূলক। কেন, বলছি শোন। যে মেয়ে সব কিছু ফেলে আমার কাছে আসবে সে তার অতীতকেও ফেলে আসবে পিছনে। আমি দেখতে চাইব না কী তার অতীত, কেমন তার অতীত। তার বর্তমানকে নিয়ে আমার ঘরসংসার। তার ভবিষ্যৎকে ঘিরে আমার স্বপ্ন। তার অতীতের সঙ্গে আমি চাইব পরিচ্ছন্ন ছেদ। কেউ যেন কোনো দিন আমাকে স্মরণ করিয়ে না দেয় তুমি কে ছিলে, কী ছিলে, কার ছিলে, কোনখানে ছিলে। আমি ভাবতে ভালোবাসব যে তুমি চিরকাল আমার সঙ্গেই ছিলে, আমারি ছিলে। ছিলে অদৃশ্য অগোচর রূপে। নিরাকার দেবতার মতো। এলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে। সাকার দেববিগ্রহের মতো। আমিও তখন প্রতিমাভঙ্গকারী না হয়ে প্রতিমাপূজক হব। বিকার বোধ করব না। অরুচি বোধ করব না।

প্রেম, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে কে! আমি! কখনো নয়। তোমাকে আমি সোনালী হতে দেব না।

চোদ্দ

কথাটা বাবার কানে তুলতে রত্নের প্রাণ আকুলিবিকুলি করছিল। কিন্তু এ কি মুখে আনবার মতো কথা যে, "গোরী বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে আমি ভালোবেসেছি, সংসারী যদি হতে হয় তো তারই জন্যে ও তারই সঙ্গে?"

এও তবু লেখনীর মুখে বলা যায়, কিন্তু "গোরী আর আমি ভাবছি কোথাও চলে যাব" এ কথা কি বাবার বুকে শেলের মতো বাজবে না! তিনি কী অপরাধ করেছেন যে তাঁকে তাঁর ছেলে প্রাণদন্ড দেবে!

অথচ গোরীর সঙ্গে রত্নর যে সম্বন্ধ সেটাও পিতাপুত্র সম্বন্ধের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। ভগবানকে পিতা রূপে উপাসনা করা যায়। একদা সে তা করেছে। ভগবানকে মাতা রূপে আরাধনা করা যায়। একদা তাও সে করেছে। এখন যদি তিনি তার কাছে কান্তা রূপে অর্চনা চান তবে এটাও তার করণীয়। একদিন হয়তো তিনি গোপাল রূপে পূজা নিতে আসবেন। তখন সেটাও তার কর্তব্য হবে।

কান্তাকে সে বঞ্চনা করবে না, প্রত্যাখ্যান করবে না। তা যদি করে তবে কে জানে হয়তো নারীবধের পাপের ভাগী হবে। গোবীর অপমৃত্যু সে কল্পনা করতে পারে না। তার চেয়েও ভয়াবহ গোরী যদি সোনালী হয়ে যায়। রত্ন থাকতে গোরী সোনালী হবে? সব কিছু সম্ভব, কিন্তু এ কখনো সম্ভব নয়।

"গোরীকে আমি সোনালী হতে দেব না।" রত্ন মনে মনে বলে। বার বাব বলে। নাম জপ করার মতো দুবেলা জপ করে। "গোরীকে আমি সোনালী হতে দেব না। তার চেয়ে ওকে নিয়ে কোথাও চলে যাব। ও যদি চায়। ও যদি হঠাৎ এসে হাজির হয়।" রত্ন আপন মনে বলে যায়।

তার গায়ে কাঁটা দেয় ও কথা মনে আনতে। ইলোপমেণ্ট! কী রোমাঞ্চকর! কে জানে কোন দিন! কে জানে কোনখানে! কে জানে কী হবে তার পরে!

বিধাতাই জানেন। বাবা হয়তো লোকলজ্জায় দেশান্তরী হবেন। হয়তো পুত্র-শোকে প্রাণ বিসর্জন করবেন। রাম সীতার বনবাস এর চেয়ে এমন কী শোকদায়ক ছিল! রত্নগোরীর বনবাসের চেয়ে! দশরথ তাও সইতে পারলেন না। রত্নর বাবা কেন পারবেন!

বাবার দিকে তাকালেই রত্নর অন্তর হায় হায় করে। বাবা! বাবা! তোমাকে কি আমরা হারাতে চাই! আমরা চাই যে তুমিও বাঁচ আমরাও বাঁচি। তুমি চল তোমার সার্থকতার পথে। আমরা চলি আমাদের সার্থকতার পথে। বিশ্বাস কর আমরা কেউ আত্মসুখের জন্যে অপরকে দুঃখ দিতে চাইনে। সুখ নয় সার্থকতা আমাদের কাম্য।

গোরীর প্রেম এসে রত্নর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। ইলোপমেণ্টের হাওয়া লেগে তার হৃদয় খুলে গেল। সবাইকে সে বুকে টেনে নিতে চায়। সকলের বুকে ঠাঁই পেতে চায়। কেউ পর নয়। সব মানুষ আপন। সব প্রাণী আপন। একটি তৃণাঙ্কুরকেও সে হেলায় মাড়িয়ে যাবে না। একটি পিঁপড়েকেও সে জলডুবি থেকে বাঁচাবে। এমন যার হৃদয় সে কি তার বাবাকে বাঁচাবে না? কিন্তু কেমন করে? রত্ন ভেবে আকুল হয়।

যাদের সে সভয়ে পাশ কাটিয়ে যেত, সন্তর্পণে এড়িয়ে চলত, তারা যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করছে। আমাদের ভালোবাসতে পার? পুলিশের লোক। জেল কয়েদী। পেশাদার গুণ্ডা ও দাঙ্গাবাজ। তারাও বলছে, আমাদের ভালোবাসতে পার? যাদের দিকে সে শরমে চাইতে পারত না তারা যেন তাকে মিনতি করছে। পতিপরিত্যক্তা। পতিতা। পাতিতা। তারাও যেন তাকে ডেকে বলছে, আমাদের কেউ কেন ভালোবাসে না? তুমি একটু ভালোবেসো।

✓ সত্যি। চতুর্দিকে প্রেমের এত অভাব! প্রেমের জন্যে এত ক্ষুধা! এত পিপাসা! একটি হৃদয় দিয়ে কটিকেই বা ভালোবাসা যায়! ভালো করে নিবিড় করে প্রাণভরে ভালোবাসা যায়! ওই একটি গোরীকেই সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসা যায় কি? ওর যে চ্যালেঞ্জ তার জবাব দেওয়া কি সোজা? ওর যে মিনতি তার মর্যাদা রাখা কি মুখের কথা? ওই একজনকে ঠিকমতো ভালোবাসতে জানলে

রত্ন ও শ্রীমতী

ভালোবাসতে পারলে সে ভালোবাসা সর্বজনের হৃদয়ে পেঁছবে। ভাণ্ডের ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড।

ছোট ভাই রম্যকান্ত অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে পড়াশুনা ছেড়ে চাষবাস দেখছে। চাষগাঁয় থাকে, মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসে। দাদা এসেছে শুনে বাড়ী এলো। বলল, "চল আমার সঙ্গে যাবে। তোমাকে আস্ত একটা কুঁড়ে ঘর দেব। খাবে দাবে বিশ্রাম করবে। তোমার শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।"

রত্ন ইতিমধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিল যে চরে চিঠিপত্র যায় না, চর থেকে চিঠিপত্র আসে না। সেখানে গেলে গৌরীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়। তাই তার উৎসাহ মন্দা হয়ে এসেছিল। তা ছাড়া এ গরমে গোরুও চরে না, দুধও মেলে না। এক বাটি পায়েস দিনান্তেও জুটবে না। বোধিদ্রুম বা কোনো রকম দ্রুমও নেই যে ছায়া দেবে।

"তোর সঙ্গে যাব যে, চিঠিপত্রের কী হবে?" রত্ন সুধায় রমুকে।

"একদিন অন্তর একদিন ডাক পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে যায় নিয়ে যায়। তা ছাড়া আমার সাইকেলে করে তুমি রোজ ডাকঘরে হাজিরা দিতে পারবে। সাত মাইল দূরত্ব।" রমু আশ্বাস দিল। পোড়াদহ থেকে পশ্চিমে সাত মাইল।

দুই ভাইয়ের আকৃতি এক রকম, কিন্তু আকারে ছোট ভাই বড়। আর প্রকৃতি অনেকটা বিভিন্ন। রমু ডানপিটে জবর জোয়ান। যেমন খেতে মজবুৎ তেমনি খাটতে মজবুৎ। তেমনি খেলতে ও শিকার করতে। ওর জনমজুরদের সঙ্গে ও খোল বাজিয়ে কীর্তনও করে, ওদের অসুখে বিসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করে, আবার ওদের গাফিলতি বা অবাধ্যতা দেখলে মারধরও করে। গালিগালাজও দেয়। দাদার মতো অহিংসক ভদ্রলোক নয় রমু।

রত্ন বলল, "আচ্ছা। আমি যাব তোর সঙ্গে। কিন্তু তার আগে ঠিকানা-বদলের কথা জানানো দরকার। নইলে চিঠিপত্র খোয়া যাবে। ভীষণ জরুরি সব চিঠি।"

রমু শাদাসিধে মানুষ। যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। তলিয়ে দেখতে চায় না কেন জরুরি। কার চিঠি। রত্নও বলি বলি করে। বলতে ভরসা পায় না। রমুর পেটে কথা থাকে না। সাত কান ঘুরে বাবার কানে পেঁছবে।

দ্বিতীয় ভাগ

এর পরে এলো গোরীর আরো একখানি চিঠি। জ্যোতিদা ও কাননের সঙ্গে ওর আবার দেখা হয়েছে। ওরা কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে গল্প করেছে। গোরী লিখেছিল—

জ্যোতির পছন্দ হয়েছে। সে তোমাকে দেখে এসে কী বলেছে, শুনবে? বলেছে, তুই জহুরী। রত্ন চিনিস। তা শুনে আমি তাকে কী বললুম, জান? বললুম, জহুরীর ওই একটিমাত্র জহরৎ। আর সব আমি বিলিয়ে দিয়েছি ও দেব। ওটিও যদি হারাই তবে আমি বাঁচব না। মুক্তি নিয়ে আমি কী করব? আমি চাই মুক্তো। তার মানে রত্ন।

জ্যোতি ভাবছে। ও বলে আমি নাকি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি পুড়ে যাচ্ছি। পাঁচ বছর আগে যেমন ক্ষয়ে যাচ্ছিলুম তেমনি। এবার তো কেউ আমাকে ভাগলপুর থেকে এসে নিয়ে যাবে না। আমিও গায়ে পড়ে যাব না। তবে কি এই চুলোতেই দগ্ধ হয়ে মরব? জ্যোতি বলে, না। আমি বলি, তা হলে কী? সে বলে, তা হলে তুই আমার সঙ্গে চল। আমি বলি, তা কেমন করে হবে? যে যার, সে তার। আমি কি তোর? না তুই আমার?

ও বলে, তা নয়। রত্নের মনঃস্থির করতে সময় লাগবে। তত দিন তোর মোমবাতি পুড়তে থাকবে। এটা তো তাকে দেখতে হচ্ছে না। আমাকেই দেখতে হচ্ছে। এ কি চক্ষে দেখা যায়! আমি বলি, তা হলে তুই তাকে চক্ষে দেখে যেতে ডেকে নিয়ে আয়। আমি ডাকতে পারিনে। আমি পরের ঘরে থাকি।

ওগো তুমি যদি আমাকে স্বচক্ষে না দেখে কিছু স্থির করতে না পার তবে জ্যোতির সঙ্গে তার আশ্রমে এস। আমি দেখা দেব। আমার সিদ্ধান্ত আমি মনে মনে নিয়ে ফেলেছি। তোমাকে চোখে দেখার আবশ্যক নেই। কিন্তু আমাকে চোখে দেখা হয়তো বা আবশ্যক। তোমার সামনে বেরোতে আমার লজ্জা করবে। কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে আমার ভয় ভেঙে গেছে। তুমি এত মহৎ! আমার অতীতের পঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করবে না। পঙ্ক থেকে তুমি পঙ্কজকে তুলে নেবে।

কানন কী বলে, জান? বলে, তোমার সঙ্গে যেতে। আমিও তাই ভাবি। সেইটেই শোভন ও স্বাভাবিক। কিন্তু জ্যোতি বলে, তা নয়—রোমাণ্টিক। আমার সঙ্গে গেলে চেঞ্জে যাবার মতো লাগবে। আর রত্নর সঙ্গে গেলে ইলোপমেণ্টের মতো লাগবে। রত্নর সঙ্গে রোমান্স। আমার সঙ্গে নীরস গদ্য।

তোমাকে বোধ হয় লিখিনি যে তোমার আমার রোমান্স আমার প্রোপ্রাইটরের অবিদিত নয়। সুধাকে আমি দিব্যি দিয়ে বলেছিলুম কাউকে যেন না জানায়। বড় ননদ লাবুও আমার কাছে দিব্যি করেছিল কাউকে বলবে না। সাবু আমার ছোট ননদ চাপা মেয়ে। সে কি কখনো ফাঁস করতে পারে? প্রাণ গেলেও না। তা হলে কেমন করে কার কাছে উনি শুনতে পেলেন? হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, ইংরেজীতে দুটি বচন আছে। একটি হলো, Distance lends enchantment to the view. আর একটি হচ্ছে, Familiarity breeds contempt. কোনটি কার প্রতি প্রযোজ্য? আমার ধাঁধা লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তার মানে? উনি রসিয়ে রসিয়ে বললেন, দূর থেকে ঘন ঘন চিঠি লিখলে আমিও হতে পারতুম পরম প্রেমিক সুপুরুষ। কাছে থেকে অত বেশী নজরে পড়লে তিনিও হতেন বিষম বিতৃষ্ণার পাত্র।

আমি সেদিন চুপ করে সহ্য করে গেলুম। ভেবেছিলুম সেই শেষ। কিন্তু উনি আমাকে আরেক দিন বললেন, কত ছেলে আসে যায়। আমি কি কোনো দিন নিষেধ করি? তুমি ওঁকে আসতে বল না কেন? আমার অমত নেই, জেনো। আমি ফোঁস করে উঠলুম, তোমার না হয় অমত নেই, তা বলে ওর কি আত্মসম্মান নেই? ও কেন তোমাদের এখানে আসবে? কোন সুবাদে আসবে? উনি বললেন, কানন আসে কোন সুবাদে? আমি কত খাতির করি। আমি বললুম, কানন আমার ভাই। সেই সুবাদে আসে। উনি বললেন, আহা! ওঁকেও তুমি ভাই বলে চালিয়ে দিতে পার। আমি কি ভাই ছাড়া আর কিছু বলে ইঙ্গিত করছি!

এসব কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। কিন্তু কথায় কথা বাড়ে।

তাই চুপ করে থাকি। তোমাকে নিয়ে প্রায়ই উনি আমাকে খোঁচান। তা বলে উনি যে এত দূর যাবেন তা আমি কল্পনাও করিনি। বোনদের বলেছেন আর একটি বৌদি হলে কেমন হয়? ওরা তো প্রথমটা ঠাওরাতে পারেনি কার বিয়ে। উনি তা শুনে বলেছেন, এই ধর আমার বিয়ে। কেন, আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি? বোনেরা গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা কী ঘেন্নার কথা! যার অমন সুন্দরী বৌ, অমন গুণবতী বৌ, সে কেন আবার বিয়ে করতে যাবে! উনি বলেন, আমার জন্যে তো নয়। আমার কী এমন গরজ! তোদেরি বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। শেষে দত্তক নিতে হবে। বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। বোনেরাও কেঁদে আমার ঘরে হানা দিল। আমি তো হতভম্ব।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে আর একটি নিরীহ স্ত্রীশিশুকে ছাগশিশুর মতো বিয়ের হাড়িকাঠে পুরে বলিদান করা হবে। এসব আইন করে বন্ধ করে দেয় না কেউ? ইংরেজ কি ঘুমচ্ছে? কই, বিপ্লবীদের বেলা তো তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখিনে। ওই যে সুধা ওরই সঙ্গে ওঁর জোর করে বিয়ে দেওয়া উচিত। তা হলে আমার আর কোনো আফসোস থাকে না। বেচারা সুধার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। নতুন বৌরানী এলে ওকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবে। আমি তো এক পা তুলে বসে আছি। আমার কী! আমার যেতে কত ক্ষণ লাগবে! জ্যোতি তৈরি। তবে আমি ওর সঙ্গে যেতে নারাজ। ওর সঙ্গে গেছি বলে তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তা হলে যে আমি শ্যাম ও কুল দুই হারাব। আমি বলি, যার ধন সে-ই বুঝে নিক। ও তো বলছে না যে নেবে না।

জ্যোতি ভাবছে। সে তোমার ওখানে যাচ্ছে সামনের সপ্তাহে। তুমি তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করবে ও সে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করবে তা জানতে পেলে আমিও আমার মন স্থির করব। সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোতির সঙ্গে চেঞ্জ না তোমার সঙ্গে ইলোপমেন্ট না একা একা মেনকালয় না নদীর জলে আত্মহত্যা চারটের একটা স্থির করা বাকী। সব নির্ভর করছে তোমার

উপর। কান্ত আমার, তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার! ওই যে জ্যোতি সেও একদিন পর হয়ে যাবে। যেদিন তার আপন জনের সাক্ষাৎ পাবে। আমি তো তাকে বরণমালা দিইনি ও দেব না। সে আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু আমি তো তাকে ভালোবাসিনে। আমরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। বন্ধুর অধিক। কিন্তু যুগল নই। কোনো দিন হব না। তা হলে কেন তার সঙ্গে যাই? অবশ্য তোমার অনুমতি পেলে তার সঙ্গেই যেতে হবে। পরে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে তো? কান্তার ভার নেবে তো? প্রেম, তুমি কি সাড়া দেবে?

চিঠি পড়তে পড়তে রত্নর মন চলে গেছল ছেলেবেলায়। শীতকাল। রাত দুপুর। রব উঠল—আগুন! আগুন! লেপ কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খালি গায়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে সে ও তার ভাইবোন পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মা বেঁচে আছেন, কিন্তু বাবাকে নিয়ে সমস্যা। তিনি আগে গোরুবাছুরকে বাঁচাবেন, তার পর আপনাকে বাঁচাবেন। গোয়াল-ঘরে ঢোকে কার সাধ্য! দাউ দাউ করে চাল জ্বলছে। খুঁটি জ্বলছে। বেড়া জ্বলছে। চার দিকে ধোঁয়া। কয়েকটি গোরুর বাঁধন তিনি কেটে দিলেন। কয়েকটির বাঁধন আপনি পুড়ে গেল। কয়েকটি উন্মত্ত হয়ে নিজেদের বাঁধন নিজেরাই ছিঁড়ল। কিন্তু কয়েকটিকে কোনো মতেই উদ্ধার করা গেল না। পরের দিন দেখা গেল মুক্ত আকাশের তলে দু'তিনটি ছায়ামূর্তি শুয়ে আছে। গোরুর মতো দেখতে, কিন্তু গোরু নয়, গোরুর ছাই। তাদের মধ্যে ছিল সোনা গাই। রত্নর প্রিয় গাই।

এই যে গোরী এও কি সেই সোনা গাইয়ের মতো পুড়ে যাবে? কোনো মতেই একে বাঁচানো যাবে না? রত্নর কতটুকুই বা সাধ্য! যদি কেউ পারে তো জ্যোতিদাই পারবে। কিন্তু সেও পারবে কি? না গোরী উন্মত্ত হয়ে নিজেই নিজের বাঁধন ছিঁড়ে পালাবে? তখন সে আর সোনা নয়। সোনালী। তখন সে তার কারাগারিকদের নাগালের বাইরে। তার মুক্তিদাতাদেরও নাগালের বাইরে। তার মুক্তিদাতাদেরও নাগালের অতীত। তখন তাকে সেই মেনকালয়

থেকে উদ্ধার করতে যত মহৎ প্রাণ ও যত প্রবল প্রেম লাগবে তত কি তাদের আছে? না। জ্যোতিরও নেই। রত্নরও নেই। এই তাদের শেষ সুযোগ। পরিস্থিতি এখনো তাদের আয়ত্তের মধ্যে। গোরীকে বাঁচাতে হলে এখন কিংবা কখনো নয়।

রত্নর মন আবার ফিরে গেল ছেলেবেলায়। তার মায়ের মরণাপন্ন অসুখ। বাড়ীতে এমন একজনও নেই যে তাঁকে ওষুধ খাওয়াবে, বেডপ্যান দেবে, শুইয়ে রাখবে। পারতেন শুধু বাবা। কিন্তু তাঁর আপিস পরিদর্শন করতে আসছেন স্বয়ং কমিশনার সাহেব। তিন বছর পরে শুভাগমন। পথে ঘাটে তোরণ রচনা হচ্ছে। বাবা ছুটি চেয়ে পেলেন না। অগত্যা ইস্তফা দিয়ে বসলেন। তাঁর আপিসের বাবুরা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, করেন কী, দাদা! বৌ মরে গেলে বৌ হবে, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে চাকরি! তিনি উত্তর দিলেন, বুঝি সব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কর্তব্য মানুষটাকে বাঁচানো। বৌ বলে নয়। কৃষ্ণের জীব বলে। অতগুলো লোকের সামনে তিনি বলতে পারলেন না যে কৃষ্ণের জীব নয়, কৃষ্ণপ্রেয়সী। মাকে বাঁচানো গেল না। বড় বেশী দেরি হয়ে গেছল। কর্তাদের কথায় পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা হলো। সেই ছুটি মঞ্জুর হলো। কিন্তু হারামণি ফিরে এলো না।

রত্ন ভাবছিল যেমন করে হোক বাবার কানে পেঁৗছে দিতে হবে যে তাঁর ছেলেও একটি মানুষকে বাঁচাতে চায়। কৃষ্ণের জীব নয়, কৃষ্ণপ্রেয়সী। সমাজের চোখে স্ত্রী নয় বলে কি কেউ নয়? মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি সমাজ সব সময় বোঝে? সমাজ তো বাবাকে বলেছিল বৌকে মরতে দিয়ে আপিসে পড়ে থাকতে। তিনি যেমন তাঁর মানবিক কর্তব্য করাই স্থির করলেন তাঁর ছেলেও কি তেমনি তার মানবিক কর্তব্য করা স্থির করতে পারে না? সমাজ সাজা দেবে। দেয় দেবে। কিন্তু বাবা কেন মারা যাবেন?

গোরীর চিঠিখানি বার বার পড়ে রত্নর মনে হলো ওর অর্থ আরো গভীর। গোরী চায় রত্নর কাছে বিশেষ একটি প্রতিশ্রুতি। সেইটি না পেলে সে রত্নর সঙ্গে যাবে না, জ্যোতির সঙ্গে যাবে না, কারো সঙ্গে যাবে না, গেলে একা যাবে মেনকালয়ে বা যমালয়ে। তাকে উদ্ধার করতে যাওয়া নিরর্থক। তার

আগে তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সে প্রতিশ্রুতি আর কেউ দিলে হবে না। দেবে রত্ন। যাকে সে বরণ করেছে। রত্ন কি দেবে তার মনের মতো প্রতিশ্রুতি? দিলে পারবে প্রতিশ্রুতি রাখতে? পরে যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তা হলে একটি কুলত্যাগিনী নারীর অপমৃত্যুর দায়িক হবে। অথবা তার নৈতিক অধঃপাতের। প্রতিশ্রুতি দিয়ে না রাখার চেয়ে না দেওয়াই ভালো। তা হলে যদি কিছু ঘটে রত্ন তার দায়িক নয়।

দায়িক নয়। তাই কি? রত্ন হৃদয় অন্বেষণ করে। যে ভালোবাসে তার দায়িত্বের কি সীমা আছে! যে বিয়ে করে তার দায়িত্ব বরং সসীম। প্রেমিক বলে যে পরিচয় দেয় আর স্বামী বলে যে পরিচিত তাদের একজনের দায়িত্ব কিছু দূর গিয়ে ফুরিয়ে যায়, আরেক জনের দায়িত্ব অফুরন্ত। তাই যদি না হবে তবে জ্যোতি কেন নিজের বাপমাকে অমান্য করে রাজনৈতিক জীবনে জলাঞ্জলি দিয়ে ফৌজদার পরিবারের ফৌজদারির ঝুঁকি মাথায় করে গোরীকে কোথাও নিয়ে যেতে চায়? জ্যোতির প্রেম তার দায়িত্ব নির্দেশ করছে। তেমনি রত্নর প্রেম করবে তারও দায়িত্ব নির্দেশ। জ্যোতির প্রেম প্রত্যাখ্যাত না হলে জ্যোতি গোরীকে বিয়ে করত, ঘর দিত। সেটা অবশ্য সাঙ্গা মতে। রত্নর প্রেম প্রত্যাখ্যাত নয়, প্রতিদত্ত। রত্ন কি গোরীকে বিয়ে করতে পারে না? ঘর দিতে পারে না? যে কোনো মতে? ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছা আছে কি?

"কি রে! চিঠি লিখতে বসে কী এত ভাবছিস?" হীরু সুধায় রত্নকে।

"কে? হীরু? আয়। ভাবছি কী লিখি। কী লিখলে পরে পিছু হটতে হবে না। জীবনমরণের প্রশ্ন। আমার মতো অসুখী কে।" রত্ন এলিয়ে পড়ে।

"জীবনমরণের প্রশ্ন! কার জীবনমরণের প্রশ্ন!" হীরুর কাছে ওটা একটা হেঁয়ালি।

"থাক। লিখব না। চল, আমরা নৌকায় করে বেড়িয়ে আসি। গোরাই ব্রিজ অবধি। কত কাল দেখিনি। চল, পিকনিক করা যাক। কে কে যাবে লিস্টি কর।"

বাল্যবন্ধুর সঙ্গে হৈ হৈ করে রত্ন ভুলে রইল গোরীর জন্যে তার উৎকণ্ঠা, বাবার জন্যে আশঙ্কা, নিজের স্বাধীনতার জন্যে ভাবনা। ভুলে রইল প্রথম

দ্বিতীয় ভাগ

দর্শনের প্রস্তুতি, প্রেমের ভাষা সৃষ্টি, প্রার্থনার ভাষা নির্ণয়, কাম্যাকাম্য বিনিশ্চয়। পরের দিন ভোরে উঠে তার হালকা বোধ হলো। গৌরীকে চিঠি লিখতে গিয়ে লিখল—

ওগো প্রেম, আমার মনঃস্থির করা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এই তো সেদিন স্থির করলুম তোমাকে আমি সোনালী হতে দেব না। এবার স্থির হলো তোমাকে আমি মরতে দেব না। এর জন্যে যদি ইলোপ করতে হয় তাও করব। কিন্তু তার চেয়ে ভালো হয় জ্যোতিদার কথা যদি তুমি শোন। তার সঙ্গে যাওয়া অবশ্য আমার সঙ্গে যাওয়ার মতো রোমান্টিক হবে না। কিন্তু রোমান্সের সহায়ক হবে। আমার সঙ্গে গেলে পরে তুমি কি আবেদন করতে পারবে যে যশোবাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হোক! জ্যোতিদার সঙ্গে গেলে তা পারবে। বিবাহ থেকে মুক্তি না পেলে বিবাহ পুনরায় হয় না। মেয়েদের বেলা এই কানুন। বিয়ে যদি আবার করতে চাও তবে জ্যোতিদার সঙ্গেই যাও।

আর বিয়ে যে আমাকেই করতে হবে এটা এখন থেকে ধরে নেওয়া কেন? বিপুলা এ পৃথ্বী। বিশাল কর্মক্ষেত্রে এসে কত ছেলেব সঙ্গে তোমার ভাব হবে। দেশ থেকে দেশান্তরে যাবে। কত অজানার সঙ্গে আলাপ হবে। কে যে তোমার পুরুষোত্তম তা কি তুমি ঘরে বসে জানতে পেরেছ না পারবে? বাইরে আসার পর জানবে। তখন আমাকে তোমার পুরুষোত্তমেব সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি তার সঙ্গে হারব। সে-ই তোমাকে জিতে নেবে। তা হলে কেন আমাকে বিয়ে করে নিজের হাত পা বেঁধে রাখবে, প্রেম? এখন তোমার মনে হচ্ছে আমার মতো আর কেউ হয় না। কিন্তু তখন তোমার মনে হবে আমি তামসী নিশির চন্দ্র, সে উজ্জ্বল দিনের সূর্য। আমি বন্দিনী নারীর ধ্যান। সে মুক্ত নারীর মানস।

তুমি জ্যোতিদার সঙ্গে গেলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব বই-কি। এ প্রতিশ্রুতি রইল। আর রইল অঙ্গীকাব। তুমি আমাকে

যে-ভাবে চাইবে সে-ভাবে পাবে। কান্তভাবে চাইলে কান্তভাবে। পতিভাবে চাইলে পতিভাবে। যত কাল চাইবে তত কাল পাবে। এক বছর চাইলে এক বছর। দশ বছর চাইলে দশ বছর। এক জীবন চাইলে এক জীবন। জন্ম জন্মান্তর চাইলে জন্ম জন্মান্তর। তুমি আমাকে ছেড়ে না দিলে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেব না। ললিত সেদিন বলছিল যে তুমি আমার ভাগ্যদেবী। সেদিন বুঝিনি। আজ বুঝেছি। তোমার সঙ্গে প্রেম আমার ভাগ্যদেবীর সঙ্গে নিযুক্তি। আমার appointment with Destiny.

পনেরো

জ্যোতি পোড়াদায় নেমে ট্রেন বদল করবে এমন সময় রত্ন গিয়ে তার হাতে হাত মিলিয়ে বলল, "এবার ট্রেন বদল নয়, দিক বদল করতে হবে। যেতে হবে পশ্চিমে। গোরুর গাড়ী করে। আমার ছোট ভাই রমুর চাষগাঁয়।"

গোরুর গাড়ী হাজির ছিল। রমুর পাঠানো। জ্যোতি কিন্তু গাড়ীতে চড়তে রাজী হলো না। বলল, "তুমি উঠে বস। আমি পায়ে হাঁটব।"

রত্ন বলল, "সাত মাইল আমাব কাছে কিছু নয়। আমিও হাঁটব।"

দু'জনেই তার পর মৌন। পাশাপাশি চলতে চলতে কত কথা বলতে ইচ্ছা করছিল রত্নর। কত কথা জানতে ইচ্ছা কবছিল। কিন্তু যাব সম্বন্ধে কথা তার নাম কিছুতেই মুখে আসছিল না। তার যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ সে গোবীর নাম করবে না, যদি না জ্যোতিদা অগ্রণী হয়। ওদিকে জ্যোতিবও লেশমাত্র উদ্যোগ নেই। সে যেন চেনেই না গোরী কে।

রত্ন জানত যে জ্যোতি জানত রত্ন গোরীকে ভালোবাসে। সেইজন্যে জ্যোতির দিকে মুখ তুলে তাকাতেও তার লজ্জা করছিল। সে শবমে নতমুখ। আব জ্যোতি জানত যে রত্ন জানত জ্যোতি গোরীকে এখনো ভালোবাসে। সেইজন্যে রত্নর চোখে চোখ রাখতেও তার সঙ্কোচ। সে সঙ্কোচে তির্যকদৃষ্টি।

জ্যোতি একসঙ্গে দুই কাজ করে না। যখন হাঁটে তখন কথা বলে না। যখন কথা বলে তখন হাঁটে না। একটু জিরিয়ে নেয়। গোরুর গাড়ী পিছনে

পড়ে আছে আর তাতেই আছে তার নতুন চরকা। য়েরাওদা চরকা। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত। ছোট একটা কাঠের সুটকেসের মতো বয়ে বেড়ানোর উপযোগী। তাই তার মন পড়ে আছে পিছনে।

"আপনি কি সুতো না কেটে জলস্পর্শ করেন না? আমার ফ্লাস্কে চা আছে। খাবেন?" রত্ন অফার করল তার অতিথিকে।

"চা-তে আমার না নেই। কিন্তু আপনি-তে আমার আপত্তি। আমি যাকে যা বলি সে আমাকে তাই বললে আমি খুশি হই। তুমি বলবে তুমি।"

"আচ্ছা, জ্যোতিদা।" রত্ন চা দিল।

"দা কেন? কাটবে নাকি? কই, ইংরেজ আমেরিকানরা তো বড় ভাইকে জন কিংবা জ্যাক বলে ডাকতে কুণ্ঠিত হয় না?" জ্যোতি চায়ে চুমুক দিল।

"ওইটি পারব না। বড় ভাইকে তুমি বলা চলে, কিন্তু শুধু নাম ধরে ডাকতে বাধে। আমরা তো ইংরেজ বা আমেরিকান নই।" রত্ন ফ্লাস্ক উপুড় করে মুখে ঢালতে গেল।

চরকার সূত্র ধরে জ্যোতিদার সঙ্গে বাক্যালাপ অনেক দূর গড়াল। কোনো এক সময় গোরুর গাড়ীর চাকাও গড়িয়ে গেল। ওদের হোঁশ ছিল না।

জ্যোতি বলল, "আমিও কি বুঝিনে যে দেশের লোকের বস্ত্রাভাব চরকা দিয়ে মেটবার নয়! ও দেশেও চরকা ছিল। তা দিয়ে বস্ত্রের অনটন ঘুচল না বলেই না স্পিনিং জিনী উদ্ভাবন করতে হলো। আমাদেরও তেমনি অনেক কিছু উদ্ভাবন করতে হবে। কিন্তু আমরা যে গান্ধীজীর সঙ্গে চরকা কাটতে বসে গেছি এর অন্য তাৎপর্য। রুশদেশের রাজনীতিকরা আশা করেছিলেন জারের হাত থেকে যখন ক্ষমতা চলে যাবে তখন তা মধ্যশ্রেণীর হাতে পড়বে। কিন্তু তা পড়ল গিয়ে শ্রমিক শ্রেণী কৃষক শ্রেণীর হাতে। ওদের নিশানে কাস্তে হাতুড়ি আঁকা। তেমনি ইংরেজের হাত থেকে যখন ক্ষমতা খসে পড়বে তখন তা আমাদের মধ্যশ্রেণীর বাবুভায়াদের হাতে পড়বে না। পড়বে চাষীমজুরের হাতে। তাদের নিশানে চরকা আঁকা। আমরা গান্ধীপন্থীরা তাদেরি লোক। তাদেরি স্বার্থ আমাদের লক্ষ্য। তাদের মধ্যে যারা দীনতম আর হীনতম আমরা তাদেরি স্বার্থ রক্ষা করি, পাহারা দিই। সেই সঙ্গে আমরা জাতীয় আন্দোলনের

পুরোভাগে থাকি। সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের। শ্রেণীদ্বন্দ্ব আমাদের সাজে না।”

ওরা সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আবার পায়ে হেঁটে চলল। আবার চুপচাপ। পীরপুরে পেঁাছলে পরে রমু ওদের দুজনকে দুটো আলাদা কুঁড়েঘর দিতে চেয়েছিল। ওরা একটাই নিল। রত্ন একটা তক্তাপোশে গা মেলে দিল। জ্যোতি তখনো অক্লান্ত। সে গেল রমুর সঙ্গে তার ক্ষেত খামার পুকুর বাগান পরিদর্শন করতে।

“রমুর আইডিয়া আছে।” জ্যোতিদা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, “কিন্তু চাষকে ও অর্থকরী করতে চায়। সেইজন্যে পাটচাষকে আখচাষের চেয়ে, আখ-চাষকে ধানচাষের চেয়ে মূল্যবান মনে করে। অর্থই যদি পরমার্থ হয় তবে চাষ করতে যাব কেন? ব্যবসা কেন করব না? বল, রমু, বল।”

রমু এ ধাঁধার জবাব চট করে খুঁজে পেল না। রত্নর দিকে তাকাল। রত্নও নিরুত্তর। তখন জ্যোতি নিজেই উত্তর দিল। “না, অর্থ এখানে মুখ্য নয়। আমরা ভালোবাসি মাটিকে, ভালোবাসি মাটির সঙ্গে যাদের দিনরাত কারবার সেই সব মানুষকে ও মানুষের সুখদুঃখের সাথী গোরুমোষকে। ভালো কথা, রমু, তোমার জমিতে গোরুমোষের জন্যে ফডার দেখলুম না। যাকে রাখ সে-ই রাখে।”

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা পরিপাটী হয়েছিল, কিন্তু জ্যোতি অত কিছু খায় না। ও খায় কাঁচা তরকারি, সিদ্ধ গম, চীনা বাদাম ও ফলমূল। আমিষের মধ্যে ডিম। কিন্তু সেটা ওর মতে আমিষ নয়।

রত্নর বড় আশা ছিল জ্যোতিদা আপনা হতে গোরীর কথা বলবে। কিন্তু সে রাত্রে তাকে যথেষ্ট বকবক করিয়েও তার মুখ দিয়ে গোরীর নাম বার করতে পারল না। তার সঙ্গে ছিল ফ্রয়েডের “স্বপ্নব্যাখ্যা” ও ফ্রেজারের “স্বর্ণশাখা।” চরকা কাটে বলে সে আধুনিক চিন্তার সঙ্গে সম্পর্ক কাটায়নি। যেখানেই যায় সঙ্গে থাকে হালফিল বিলিতী কেতাব। রত্নর আগ্রহ দেখে কথাবার্তার মোড় সেই দিকেই ঘুরিয়ে দিল।

পরের দিন সকালে রত্ন সাইকেলে করে ডাকঘর থেকে গোরীর চিঠি নিয়ে

এলো। তা দেখে জ্যোতি রহস্য করল। "তোমরা দেখছি চিঠি লিখে লিখেই জীবনটা ক্ষয় করে দেবে। কোনো দিন জলে নামবে না, সাঁতার কাটবে না, ডুবে মরবে না। শৌখীন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা!"

রত্ন রঙীন হয়ে বলল, "সিদ্ধান্তটা আমার হাতে নয়, ওর হাতে।"

জ্যোতি হাসিমুখে বলল, "সেও ঠিক এই কথাই বলে। সিদ্ধান্তটা আমার হাতে নয়, ওর হাতে। সিদ্ধান্তটা কী? নদীতে স্রোত আছে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই নদীর ধারে বসে থাকব অনন্তকাল। যতদিন না নদী শুকিয়ে যায়। কিংবা দয়া করে কেউ পার করে দেয়। কেমন, এই? না আর কিছু?"

রত্ন লজ্জায় নিরুত্তর রইল। তখন জ্যোতি গম্ভীর হয়ে বলল, "তোমরা যদি দু'জনেই হাত গুটিয়ে বসে থাক, কেউ কিছু না কর, তা হলে অগত্যা আমাকেই ইনিশিয়েটিভ নিতে হয়। নয়তো চোখের সামনে একটা ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে। আমি তো সাক্ষীগোপাল হতে পারিনে। সত্যাগ্রহীদের নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হওয়া শোভা পায় না।"

তখনকার মতো এইপর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা আবার ও প্রসঙ্গ উঠল। রত্ন জানতে চাইল ট্র্যাজেডী বলতে এ ক্ষেত্রে কী বোঝায়? ক্ষয়রোগে মৃত্যু? না সোনালীর অনুসরণ?

জ্যোতি বলল, "তার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী কি নেই? ভেবে দেখ।"

রত্ন ভেবে বলল, "আর কী হতে পারে? আত্মহত্যা?"

জ্যোতি বলবে কি বলবে করতে করতে বলে ফেলল, "আত্মসমর্পণ।"

রত্নর বুকের স্পন্দন স্থির হয়ে এলো। কী সর্বনাশ! আত্মসমর্পণ! না, না। অসম্ভব! পাঁচ বছরের উপর সংগ্রাম করে এসে সতীনের ভয়ে আত্মসমর্পণ! ছি, ছি! অসম্ভব!

জ্যোতি বলল, "ওর মতো অপূর্ব স্বাস্থ্য যার তার কেন ক্ষয়রোগ হয়? কারণটা প্রধানত মানসিক ও নৈতিক। যদিও কায়িককে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। ফ্রয়েড পড়েছ নিশ্চয়? গ্রডেক পড়েছ? পড়তে দেব। দেখবে এসব অসুখের মূল কত গভীরে ঢাকা থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে আবিষ্কার করতে হয়। অসুখ কথাটার অর্থ অ-সুখ। অ-সুখ থেকেই অসুখ।"

রত্ন ও শ্রীমতী

অ-সুখ থেকে অসুখ। কথাটা শুনতে যত সহজ বুঝতে তত নয়। রত্ন ভাবতে লাগল। জ্যোতি বলতে লাগল, "বাপুজীও জানেন। কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা। সাবলিমেশন। কার্যত ওটা রিপ্রেসন। অবদমনেরও একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে গেলে সাজা আছে। প্রকৃতি সাজা দেয়। আত্মসমর্পণেরও কি কম সাজা! দেখছি তো ঘরে ঘরে পরাজিত নারীদের। করুণ দৃশ্য! ওরই মাঝখানে একটি অপরাজিত আত্মা কার না মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে!"

জ্যোতি তার স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। গোরীর সঙ্গে ওর প্রথম দেখা সবরমতী থেকে ফিরে। মাস ছয়েক গান্ধীজীর কাছে শিক্ষানবীশীর পরে। তাতাদার বৌ। ওর গ্রামসম্পর্কে বৌদিদি। আলাপ জমতে বেশী দিন লাগল না। কিন্তু তাতে দুঃখ কেবল বাড়ল। মেয়েটি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল কুঁড়িতেই। কেউ বলবে না কেন। জ্যোতিরও সংসারজ্ঞান স্বল্প। গোরীর মামা এসে ওকে ভাগলপুর নিয়ে যান। তাতাদাও বিলেত যান। জ্যোতিও জেলে যায়। বছর খানেক পরে আবার গোরীর সঙ্গে দেখা। গোরী ফিরেছে। জ্যোতি ফিরেছে। তাতাদা ফেরেননি। কিন্তু এ কোন গোরী! সারা অঙ্গে রংমশাল জ্বলছে। মরা গাঙে বান এসেছে। ডাক্তারকে সে ভুলতেও পারছিল না, ক্ষমা করতেও পারছিল না। ভিতরে বাইরে জ্বলছিল।

তার পর ওর সাবলিমেশনের জন্যে ওকে গান্ধীজীর কাছে নিয়ে যায় জ্যোতি। বেশী দূরে নয়। সদরে। ভাবের আবেগে ও অলঙ্কার খুলে দেয়। চরকা কাটে। খদ্দর পরে। অহিংসায় দীক্ষা নেয়। জ্যোতি ওকে ইংরেজী বই পড়ে অর্থ করে শোনায়। জ্যোতির ইঙ্গ বৌদি ওকে দেশবিদেশের নারীপ্রগতির বার্তা বলেন। মধ্যযুগ থেকে ও আধুনিক যুগে উপনীত হয়। ওই ভাবে ওর উপনয়ন হয়। ও মুক্তির স্বপ্ন দেখে। মুক্তির জন্যে অধীর হয়। শ্বশুরকে জিতিয়ে দেবার জন্যে নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ দেয়। তাতে ওর অধীনতা কমে। ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদীদের একজন হয়। জ্যোতি তার নিজের আশ্রম নিয়ে ব্যাপৃত। গোরীর উপর তার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। তবু প্রায়ই দেখা হয়। গোরী তাকে বিশ্বাস করে দলের কথা না বললেও মনের কথা বলে। একদিন কাঁপতে কাঁপতে স্বীকার করে ও নাকি ওর পুরুষোত্তমের সন্ধান

পেয়েছে। সেই অর্জুনের চিত্রাঙ্গদা হবে। জ্যোতি ওকে বুঝিয়ে বলে ও যাঁকে অর্জুন মনে করেছে তিনি অর্জুন নন, তিনি ভীষ্ম। তখন সে প্রকৃতিস্থ হয়।

কিন্তু খবরটা তাতাদার কাছে বিলেতে পৌঁছয়। তিনি ব্যারিস্টারি পড়া অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে আসেন। এবার তিনি সরাসরি নিজের ইচ্ছা খাটাতে যান না। সন্ধির ছল খোঁজেন। ইংরেজ সরকার যেমন গরম নীতি ছেড়ে নরম নীতির দিকে ঝুঁকেছে। দেশের দিক থেকে নরম নীতির চেয়ে গরম নীতি ভালো। তাতে মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। তেমনি গোরীর দিক থেকেও। ওদের বিয়ে এমন ভাবে ভেঙে গেছল যে আর জোড়া লাগল না। বাইরে একটা ঠাট বজায় রইল। ভিতরে ভিতরে কেউ কারো স্বামী স্ত্রী নয়। গোরী স্বীকার করে না যে তাতাদা ওর স্বামী। তাতাদাও অস্বীকার করতে পারেন না যে সুধাদির কাছে তিনি অনার বাউন্ড। সুধাদি আপনা হতে ছেড়ে না গেলে তিনি ওঁকে ছাড়বেন না। সুধার কাছ থেকে স্বামী ভিক্ষা করতে গোরীরও আত্মসম্মানে বাধে। তা ছাড়া আরো কিছু ছিল, সেটা সুধাদি না থাকলেও থাকত, সুধাদি ছেড়ে গেলেও থাকবে। রিপালসন।

মিটমাটের জন্যে বহু লোক চেষ্টা করেছেন, জ্যোতিও মধ্যস্থ হয়েছে। দু'জনেই তার প্রিয়। তাতাদা লোক খারাপ নন। কিন্তু তাঁর সংস্কার হলো সামন্ত যুগের সংস্কার। আধুনিক যুগের নারীকে তিনি বল দিয়ে আয়ত্ত করবেন। না পারলে ছল দিয়ে আয়ত্ত করবেন। না পারলে কৌশল দিয়ে আয়ত্ত করবেন। কিন্তু আয়ত্ত তিনি করবেনই। তিনি যে প্রভু। প্রভুত্বের মোহ তাঁর গেল না। যদি বা যেত, তাঁর গুরুজন ও বয়স্যজন মিলে তাঁকে দু'বেলা ভজায়, তুমি কি পুরুষ না তুমি কাপুরুষ! যার লাঠি তার মাটি। যার বেত্র তার ক্ষেত্র। তাতাদার লক্ষ্য ঠিক থাকল। কিন্তু লক্ষ্যভেদের উপায় বদলাতে লাগল। বল থেকে ছল। ছল থেকে কৌশল। অপর পক্ষে গোবীরও লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। যে ওর স্বামী নয় তার সঙ্গে ও থাকবে না। ও চায় মুক্তি। মুক্তিলাভের উপায় নিয়ে এক এক বন্ধুর কাছে এক এক রকম পরামর্শ পায়। কিন্তু কোনোটাই ওর মনঃপূত হয় না। কারণ মনে মনে ও চায় প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তার জন্যে চাই একটি প্রেমিক। যার সঙ্গে ও ইলোপ করবে। ওর ধারণা ও কুমারী মেয়ে,

ওর বিয়েটা বিয়েই নয়, সুতরাং ইলোপমেন্টই যথেষ্ট। আইন কানুন ওর জন্যে নয়। ও নিজেই ওর আইন, ও নিজেই ওর কানুন।

সব দিক ভেবে জ্যোতিই প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটা সাঙ্গার। গৌরী যদি স্বামীর ভাত না খায়, যদি কাপালি মেয়েদের নিয়ে আশ্রম চালায়, খেটে খায়, তা হলে ধীরে ধীরে জ্যোতির মতো শ্রেণীচ্যুত হয়ে জ্যোতির সঙ্গে সাঙ্গা বসবে। প্রস্তাবটা ও মেয়ে এক কথায় নাকচ করে। এক মিনিটও ভাবে না। ওর চোখে জ্যোতি একটি এন্‌জেল। এন্‌জেলরা পুরুষ নয়। এমন মিষ্টি জুতো!

অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে জ্যোতি আবার মুখ খুলল। বলল, "গৌরীর সঙ্গে রোজ দেখা হয়, কিন্তু ও আমাব কাছেও গোপন করে ওব মণ্ডলীর কার্যকলাপ। ও নাকি মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছে। তাতাদার আশঙ্কা ওরা খুব শীগগির ধরা পড়বে ও জেলে যাবে। ফৌজদার বংশের বৌরানী হরিণবাড়ী জেলের জেনানা ফাটকে! দৃশ্যটা রোমহর্ষক! গৌবী তাঁকে চালমাৎ করেছে। তিনি বিমর্ষ। এমন সময় এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। রত্ন বলে একটি ছেলেকে চিঠি লিখে ও তার চিঠি পেয়ে গৌরীব সাধ গেল জেলের বাইরে থাকতে। রত্নকে দেখতে।"

রত্ন চমকে উঠে বলল, "তাই নাকি!"

জ্যোতি সকৌতুকে বলল, "হাঁ, ভাই। তুমি তো আসবে না। তখন তোমাকে আনার জন্যে ললিতকে জেল থেকে টানা হলো বিবাহবেদীতে। গৌবীর ধারণা ছিল কান টানলে যেমন মাথা আসে ললিতকে টানলে তেমনি বত্ন। তা তুমি তো বরযাত্রী হলে না। তাতে গৌবীর যা নৈবাশ্য! বেচারি জেলে যাবে বলে আমাকে ধরে বসল। ওর দলবল তখন ছত্রভঙ্গ। কেউ জেলে, কেউ মাটিব তলায়। একা একা তো জেলে যাওয়া যায় না। যেতে হলে সদলবলে যেতে হয়। এবার গান্ধীর চালনায়। কিন্তু বেলগাঁও কংগ্রেসে গণসত্যাগ্রহের কথা উঠল না। গান্ধীজী সবাইকে অবাক করে দিলেন। গৌবী তখন করে কী! বিষণ্ণ চিত্তে গৃহদেবতার শরণ নেয়। মাধবের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। বাস্তবিক, ধর্ম না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যেত। আমি ধর্ম মানিনে, কিন্তু ধর্মের প্রয়োজন মানি।"

দ্বিতীয় ভাগ

রত্নর কাছে এসব কথা নতুন নয়। তবু গল্পের নেশায় বলল, "তার পর?"

"তার পর আবার এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। রত্ন সাড়া দিল। গৌরীর মনে হলো রত্নর রূপ ধরে মাধব সাড়া দিলেন। প্রেমের উত্তরে প্রেম পেয়ে ওর পা পড়ে না ভূঁয়ে। ও সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করে। আকাশে ওড়ে। ও যেন একটি পরী। ওকে দেখে আমারও চোখে পলক পড়ে না। কোথায় গেল সেই রংমশাল! তার বদলে এলো রসনির্ঝর। ভাবাকুলা অনুরাগিণী। দিনে দশ বার করে ডেকে পাঠায় বা আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়। বলে, তোর কী মনে হয়? ও কি দেখে পছন্দ করবে? না ওর মোহ ছুটে যাবে? ক্ষণিক মোহ। আমি বলি, রূপজ মোহ তো নয়। মন জানাজানি। মন দেওয়ানেওয়া। পাকা রং। ও বলে, তোর কী মত? আমি বলি, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের আমি দেখতে পারিনে। ওদের চলন বাঁকা। ওদের গায়ে রক্ত নেই। রক্তস্রোতের বদলে বয় বরফের স্রোত। ওদের মাথাও কি ওদের আপনার! বড়লোকদের পায়ে বাঁধা। ওদের আবিষ্কার সত্য নয়। ওদের সৃষ্টি সুন্দর নয়। ওদের কর্ম কল্যাণকর নয়। রত্ন কি ব্যতিক্রম? বিশ্বাস তো হয় না।"

প্রসঙ্গটা ক্রমে তার নিজের দিকে এগিয়ে আসছিল, তাই রত্ন বিব্রত বোধ করছিল। জ্যোতি তা আন্দাজ করে বলল, "কিন্তু পরে বিশ্বাস হলো। তখন গৌরীকে ও তোমাকে আমি মন থেকে আশীর্বাদ করি। তোমাকেই বেশী, কেননা তুমি আমারি বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমাকে ছুটি দিচ্ছ। ও মেয়েকে ভালোবাসে আরো অনেকে, কিন্তু তাদের ভালোবাসা মধ্যবিত্তের ভালোবাসা। গৌরী বলে, প্রেম নয়, শেম। মধ্যবিত্তরা আবার ভালোবাসতে শিখল কবে! রত্ন, তোমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে আমি মনে মনে খুব আরাম পাচ্ছি, ভাই। কিন্তু শোন যা বলছিলুম।"

রত্ন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। জ্যোতি বলতে লাগল, "গৌরীটার যদি বুদ্ধিসুদ্ধি বলে কিছু থাকত! তোমার কথা ও চুপি চুপি কত মেয়েকেই যে বলেছে! চুপি চুপি বললে চাপা থাকে, এই ওর ধারণা। কিন্তু খবরটা ছাপা রইল না। তাতাদা প্যাঁচোয়া লোক। ধরে বসলেন, শ্রীমান্‌কে নিমন্ত্রণ কর।"

"শ্রীমান্ কে?" রত্ন কৌতূহলী হলো।

"বুঝতে পারলে না? শ্রীমতী থেকে শ্রীমান্। গোরী তো আহ্লাদে আটখানা। আহা! উনি এত ভালো! আমি বললুম, গোরী, সাবধান! প্যাঁচ আছে। তখন ও সাবধান হলো। আমার শুভবুদ্ধির উপর ওর অসাধারণ আস্থা। এর পর তাতাদা একটার পর একটা প্যাঁচ দেন আর আমি সে প্যাঁচ কাটাই। ঘোড়ায় চড়া। শিকার। সদরে গিয়ে ঘরকন্না। প্রত্যেক বারেই গোরী আনন্দে উদ্বাহু হয়। আমি বলি, সাবধান! তখন ও সাবধান হয়। নইলে এত দিনে আত্মসমর্পণ হয়ে যেত। কৌশলের কাছে পরাজয়।"

রত্ন মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, "এই শেষ?"

"না, এই শেষ নয়। তার পর তাতাদার হাতে একটিমাত্র চাল বাকী রইল। বলতে পার একটিমাত্র বাণ। তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র। তিনি আভাস দিলেন যে গোরীকে নিয়ে আর ঘর করা চলবে না। তিনি আবার বিয়ে করবেন। কেন যে এটা গোরীর মাথায় এত দিন আসেনি বোঝা কঠিন। ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। স্বামী বলে যাকে স্বীকার করিসনে সে যদি অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে তোর তাতে কী? সে কাকে বিয়ে করবে না করবে তুই বলবার কে? তোর কি তা হলে পিছুটান আছে? তুই থাকতে চাস? সন্ধি করতে চাস? বুঝতে কি পারিসনে এটাও একটা প্যাঁচ? উদ্দেশ্যটা আর একটি বিয়ে করা নয়। ভয় দেখিয়ে লক্ষ্যভেদ করা। বলি এসব কথা গোরীকে তবু ওর ভয় ভাঙে না। এটা যেন মনের ভয় নয়। অবচেতনের ভয়। কিংবা সংস্কারের ভয়। কিংবা ইনস্টিংক্‌টের ভয়। যুক্তি এখানে ব্যর্থ।"

রত্ন বিমূঢ় হয়ে বলল, "তা হলে কী উপায়!"

জ্যোতিও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কে জানে! ও মেয়ে এক এক দিন এক এক রকম কথা বলে। ইলোপমেন্ট। হাওয়া বদল। গঙ্গায় ঝাঁপ। মেনকালয়। তবে আর বিপ্লবের বুলি আওড়ায় না। ইংরেজকে ও ভুলে গেছে। ও নিজে বাঁচবে কি না জানিনে, কিন্তু ইংরেজ ওর হাত থেকে বাঁচবে।"

অতি দুঃখেও মানুষের হাসি পায়। রত্ন হাসল। কিন্তু কী বলবে ভেবে পেলো না। সেদিনকার মতো সেইখানেই সে প্রসঙ্গের ইতি।

পরের দিন আবার সন্ধ্যাবেলা সেইখান থেকে জের টানা হলো। জ্যোতি

বলল, "ওর উপর ছেড়ে দিলে ও হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই নেবে না। তিলে তিলে দগ্ধ হবে।"

রত্ন বলল কাতর স্বরে, "ও যদি তিলে তিলে দগ্ধ হয় আমি কি তা সইতে পারব! আমার কি লাগে না! কিন্তু কোথায় আমি সুযোগ পাচ্ছি যে আমার সত্যবানকে আমি সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব!"

জ্যোতি বলল, "সুযোগ যদি পেতে চাও, পাবে বই-কি। সুযোগকেও ছিনিয়ে নিতে হয়। লেনিন যা করেছিলেন। রত্ন, মনে রেখো, মরণের চেয়েও অসহন আত্মসমর্পণ। আত্মার পরাজয়। গোরী যদি আত্মসমর্পণ করে, আত্মায় পরাজিত হয়, তা হলে ওর সর্বনাশ হয়ে গেল। ও বেঁচে থাকলেও মহত্ত্ব হারাল। মহিমা হারাল। ও তখন অসাধারণ মেয়ে নয়। অতি সাধারণ মেয়ে। তেমন মেয়ের প্রতি আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকবে না। তোমারও কি থাকবে?"

রত্ন নিরুত্তর। জ্যোতি বলে চলল, "ওর মধ্যে আমি সহস্র সম্ভাবনা দেখি। ও-ই আমার ভারতবর্ষ। গোরা যেমন বলেছিল আনন্দময়ীকে আমিও তেমনি বলে থাকি গোরীকে—তুমিই আমার ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ করবে! আত্মায় পরাজিত হবে! তা যদি হয় তবে আমার জীবনটাও অর্থ হারাবে। আমি কি ওকে অমন করে পরাজিত হতে দিতে পারি! তুমি সিদ্ধান্ত না নিলে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

রত্ন অভিভূত হয়ে বলল, "কিন্তু আমি যদি বলি, ইলোপ কর, সেটা কি ওর উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না? তেমনি তুমি যদি বল, চেঞ্জে চল, সেটাও কি ওর উপর জোর খাটানো নয়? আমি চাই যে ও আপনা থেকে চায়।"

জ্যোতি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "এক দিকে তুমি আমি। অন্য দিকে সারা পরিবার, সারা সমাজ। ওরা সবাই ওকে সমস্বরে বলছে, তুই যদি যাস তোর মহাল খালি থাকবে না। এবার সুধা নয়, এবার নতুন বৌরানী। ফিরে আসার পথে কাঁটা। ফিরে আসতে কি হবে না লো? প্রেম ক'দিন থাকে। আর ও তোকে খাওয়াবে কী? মধুমধু? তা দিয়ে কি পেট ভরে?"

পঞ্চমীর চাঁদের আলোয় রত্নর মুখ আবছায়া দেখা যাচ্ছিল। সে মুখে

সুখের লেশ ছিল না। অপমানে অভিমানে লজ্জায় ভাবনায় তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তার অশ্রুর সরোবর শুকিয়ে গেছল।

জ্যোতি বলতে থাকল, "রত্ন, তোমার এখানে আমি বেড়াতে আসিনি। গল্প করতে আসিনি। এসেছি তোমাকে বাজিয়ে দেখতে। তা তোমার যদি বিবেকের বাধা থাকে, তুমি যদি জোর খাটানো পছন্দ না কর, তোমাকে আমি অপেক্ষা করতে দেব, কিন্তু নিজে অপেক্ষা করব না। অপেক্ষা করলে একটা না একটা ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে, যাকে আর অঘটিত করা সম্ভব নয়। তাতে কে সব চেয়ে বেদনা পাবে? যে সব চেয়ে বেদনা পাবে তারই সব চেয়ে অকর্তব্য হবে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো ঠায় বসে ট্র্যাজেডীর অভিনয় দেখা। বরং তারই সব চেয়ে কর্তব্য হবে হস্তক্ষেপ করে জোর খাটিয়ে ট্র্যাজেডীকে ঘটতে না দেওয়া। আমার উপর গৌরীর আস্থা আছে। তাই আমি ওর হয়ে ওরই ভালোর জন্যে সাহস করে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। ও মেনে নেবে।"

বাস্তবিক জ্যোতি এমন মানুষ যে তাকে দেখলে তার সান্নিধ্যে এলে তার উপর স্বতঃ আস্থা জন্মায়। জন্মেছিল রত্নরও। রমুরও। তাদের চাষগাঁয়ের লোকজনেরও।

"তা হলে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে চাও, জ্যোতিদা?" ধাঁধায় পড়ে রত্ন সুধাল।

এর উত্তরে জ্যোতি তাকে আরো কাছে সরে আসতে ইশারা করল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "প্রথমেই তোমাকে সাবধান করে দিই। শতং ভাবয়। মা বদ। মা লিখ। গৌরীকেও না। ললিতের জাহাজ ছাড়ছে মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে। ওকে তুলে দেবার জন্যে যারা ডেকে উঠবে তাদের মধ্যে গৌরী ও আমি থাকব। কিন্তু ডেক থেকে নেমে আসবে যারা তাদের মধ্যে গৌরী ও আমি থাকব না। আগে থেকেই আমরা প্যাসেজ কিনে রাখব। আমাদের মালপত্র আগে থেকে বেনামীতে পাঠিয়ে দেব। বর্মা যাত্রীদের ছাড়পত্র লাগে না। রেঙ্গুনে নেমে আমাকে বাসা খুঁজতে হবে। চাকরি জোটাতে হবে। সঙ্গে যা থাকবে তাতে তিন চার মাসের বেশী চলবে না। প্রথম সুযোগেই

গৌরীকে আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেব। যাতে ও শিক্ষিতা হতে পারে, স্বাবলম্বী হতে পারে। খেলাধুলো করতে পারে, দৌড়ঝাঁপ করতে পারে। পরিপূর্ণ রূপে নর্মাল হতে পারে। ভারতে জন্মেছে বলে ও কেন ওর বয়সের পাশ্চাত্য মেয়েদের মতো বালিকা হবে না? কেন ওর গার্লহুড থেকে বঞ্চিত হবে? ওকে অকালে নারী করা হয়েছে। এবার ওকে গার্ল হবার সুযোগ দিতে হবে। বিপ্লব কাকে বলে? বিপ্লব হচ্ছে ভুল অতীতকে স্রেফ মুছে ফেলে পরিষ্কার স্লেটে লেখা। পঁচিশে মে ওর জীবনে ফরাসী বিপ্লব। নতুন ইতিহাসের প্রথম দিবস।”

রত্ন থ হয়ে শুনছিল। কথাটি কইল না। ভাবছিল এর মধ্যে তার নিজের স্থান কোথায়? তাকে কি বাদ দেওয়া হবে? গৌরীরও কি ওই মত? সে অভিমানে ফুলছিল।

জ্যোতি আপন মনে বলে গেল, “কিন্তু তুমি তো জান আমি অন্য এক বিপ্লবের ঝাণ্ডা কাঁধে তুলে নিয়েছি। গান্ধীজীর আহ্বানে আমাকে ফিরে আসতে হবে। গণসত্যাগ্রহে অংশ নিতে হবে। গৌরীকে আমি ফেলে আসব কার কাছে? দিয়ে আসব কার হাতে? আমি চাইনে যে ও রাজনীতি করে। খুব কম সময়ের মধ্যে ওকে খুব বেশী শিখতে হবে। নইলে ও স্বাবলম্বী হবে না। ওর মনের বিকাশ দ্রুত হওয়া চাই। নইলে ও সাবালিকা হবে না। স্বাধীনতার দায়িত্ব বইবে কেমন করে? রত্ন, তোমার মনঃস্থির করে তুমি পরের কোনো জাহাজে আসবে। তুমিও একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেবে। যত দিন না তোমরা দুজনে বেশ গুছিয়ে নিতে পেরেছ তত দিন আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। ধর এক বছর। তার আগে বাপুজী গণসত্যাগ্রহ ঘোষণা করবেন বলে মনে হয় না। আমার আশ্রমটা উঠে যাবে, এই যা আফসোস। কে চালাবে!”

রত্নর হৃৎপিণ্ড বেতালা ভাবে তাল দিচ্ছিল। সে বলি বলি করে বলতে পারছিল না লজ্জায়—সম্বন্ধটা কি ভাইবোনের হবে? নয়তো বিয়ে কেমন করে সম্ভব?

জ্যোতি যেন অন্তর্যামী। বলল, “শরৎচন্দ্রের অভয়া আর রোহিণীদার কাহিনী মনে আছে নিশ্চয়? আমি তার গোড়ার দিকটা সেই রকম রেখে শেষের

দিকটা বদলে দিতে চাই। রোহিণীদার সঙ্গে অভয়ার মিলন ঘটবে না। ঘটবে শ্রীকান্তর সঙ্গে। আর বিয়ে যদি নাও ঘটে তা হলেই বা কী হয়েছে? মহা-ভারত অশুদ্ধ হবে? মহাভারতে অশুদ্ধি কি বড় কম আছে? মহা ভারতেও থাকবে। মাইকেলের কি হেনরিয়েটার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? বিয়ে বলে সকলে মেনে নিয়েছিল। সকলে যদি মেনে নেয় তবে ফর্মালিটি থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে। ওই যে মেনে নেওয়া ওইটেই বিয়ে। এক দিনে মেনে নেবে না, কিন্তু আখেরে নেবে। তোমরা কি তা বলে পেছিয়ে যাবে?"

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না রত্নর বুকের রক্ত তার মুখে রক্ত চন্দন মাখিয়ে দিয়েছে। তার মাথা নত হয়েছে শরমে শ্রদ্ধায় ও ধন্যতায়। কত বড় বান্ধব এই জ্যোতিদা!

অনেক ক্ষণ পরে রত্নর মুখে ভাষা ফুটল। কোনো মতে আবেগ দমন করে সে অস্ফুট স্বরে বলল, "আমরা তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, ভাই জ্যোতিদা। ও আমাকে যেদিন যেতে বলবে সেই দিনই আমি যাব। যদি বলে সেই জাহাজে তা হলে সেই জাহাজে।"

জ্যোতি উৎফুল্ল হয়ে বলল, "তা হলে এখন থেকেই পোঁটলাপুঁটলি বাঁধা শুরু কর। সময় মাত্র এক মাস। তোমার কাপালিপাড়া এসে কাজ নেই, রত্ন। তুমি বরং কলকাতা গিয়ে আমার দাদার ওখানে উঠো। ইঙ্গে বৌদি তোমাকে প্যাসেজ কিনে দেবেন। তিন জনের প্যাসেজ। সাবধান। আর কেউ টের না পায়। গৌরীও না।"

ষোল

আহা! সে কী রাত!

পঞ্চমীর চাঁদ কখন অস্ত গেছে। আকাশের চন্দ্রাতপ তারায় তারায় খচিত। তারা কি তারা? না চোখের তারা? কোটি কোটি চোখের তারা মেলে আকাশের দেবতারা দেখছেন পৃথিবীর সব চেয়ে সৌভাগ্যবান পুরুষকে।

চৈত্র গেছে। বৈশাখ এসেছে। তবু কোকিল কোকিলার কুহুরবের বিরতি

নেই। তারা আরো কাছাকাছি হয়েছে। তাই তাদের উচ্ছ্বাস ক্ষীণতর, কিন্তু আকুতি তীব্রতর। পাপিয়া পাগলের মতো পাড়া কাঁপিয়ে মাথার উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার চোখ গেল শুনতে শুনতে মানুষের কান গেল। রত্নকে এরা কেউ ঘুমোতে দেবে না।

ঘরের বাইরে বিছানা পাতা। রত্ন ও জ্যোতি ও রমু তিন জনের। মেহনতী মানুষ রমু। কুম্ভকর্ণের মতো তার ঘুম। আর জ্যোতিও তো দিনভর চরকা কাটে, ড্রেন কাটে, ট্রেঞ্চ কাটে। সেচ দিতে সার দিতে সেলেরি ও লেটাস লাগাতে স্যালাড বানাতে শেখায়। সেও সকাল সকাল শুতে যায় ও দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম আসে না কেবল রত্নর।

বিছানার পাশেই বেলফুলের ঝাড়। কাছেই এক গাছ কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। অদূরে পুষ্করিণী। ওর পঙ্কোদ্ধারকালে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। যত দূর বোঝা যায় বজ্রশ্রী দেবী। তার থেকে অনুমান হয় পুষ্করিণীটিও বৌদ্ধ যুগের। রত্নর কল্পনা পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে পাল রাজাদের রাজত্বে রওনা দেয়।

রত্ন যে জগতে বাস করে সে জগতে শতাব্দী সহস্রাব্দীও কিছু নয়। সে জগতে কালগণনা নেই। বিংশ শতকের ভারতে জন্মেছে বলে যে সে তার নিত্য-কালের জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তা সে একদিনের জন্যেও স্বীকার করেনি। সে যুগপৎ দেশেও রয়েছে জগতেও রয়েছে, শতকেও রয়েছে নিত্যকালেও রয়েছে। তার চেতনা আর দশজন ভারতীয় নাগরিকের মতো হয়েও চিরকালের বিশ্ব-নাগরিকের মতো। তাই তার চেতনায় নিত্য ঝুলন, নিত্য রাস, নিত্য দোল। সেখানে সে ও তার নিত্য গোরী।

এ ছেলেকে সমঝানো শক্ত যে সংসারে জরুরি বলে কিছু আছে। জরুরি বলে কোনো শব্দ তার অভিধানেই নেই। বহু দিন থেকে সে শুনে আসছে গোরীর মুক্তি না হলে নয়। হওয়া জরুরি। কিন্তু শুনলে কী হবে, হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম যে কয়েক মাস বা কয়েক বছর সবুর করলে এমন কিছু এসে যায়। হৃদয়ঙ্গম যদি বা করে তবে সেটা সত্তা দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে। এ ছেলেটি কোনো দিনই মনঃস্থির করত না। ক্রমাগত গড়িমসি করত। জ্যোতি এসে দিন

ধার্য করল পঁচিশে মে। স্থান ধার্য করল কলকাতা, চাঁদপাল ঘাট। রত্ন যদি না যায় তা হলেও জাহাজ ছাড়বে। জ্যোতি চলবে। গৌরী চলবে। রত্নর জন্যে কেউ বসে থাকবে না। পরে যদি সে যোগ দিতে চায় দেবে, না দিলেও কিছু এসে যাবে না। তাকে বাদ দিয়েই গৌরীর জীবনের নবপর্যায় শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে।

রত্নর মনে মনে অভিমান ছিল যে গৌরীর অতীত তার নয়, অপর পুরুষের। কিন্তু এই অনুপস্থিতির পর বর্তমানও কি তার থাকবে! ভবিষ্যৎও কি তার হবে! পঁচিশে মে একটা ছেদ ঘটবে, যদি না রত্ন সেদিন সহযাত্রী হয়। কিন্তু ওদিকে বাবার দশা কী হবে! আর তার নিজের প্রস্তুতি! পঁচিশে মে। একটা মাসও নয়। সময় কি আছে! ইচ্ছা করে যেখানে যত ঘড়ি আছে সব কাঁটাকে একসঙ্গে বন্ধ করে দিতে। সূর্যচন্দ্রকেও হনুমানের মতো বগলদাবা করতে। তা হলে পঁচিশে মে যথাকালে আসবে না। আসবে রত্ন যখন বলবে। এদিকে আবার সেই দিনটির উন্মাদনা সে এক মাস আগে থেকেই অনুভব করছিল। তার মনে হচ্ছিল তার বুক ফেটে যাবে উত্তেজনায়। রাত যখন একটা কি দেড়টা সে তখন শয্যা ছেড়ে উঠল। পুকুরপাড়ে পায়চারি করে ঘাটে গিয়ে চুপচাপ বসল। সরোবরজলে রাশি রাশি তারা ফুল ফুটেছিল। এক ফালি আকাশ নেমে এসেছিল ভূতলে। রত্ন একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

এ বিশ্বের বিশাল দেহের অন্তরালে কোথাও একটি প্রেমিক হৃদয় লুকিয়ে আছে। সেই অদৃশ্য উৎস হতে রত্নর হৃদয়ে আসছে প্রেমের ঝরণা ধারা। অলক্ষ্য প্রণালী দিয়ে। যেমন আসছে এই সরসীবক্ষে অফুরান ক্ষীরধারা কোন নিহিত নির্ঝর হতে। রত্নর হৃদয়ের প্রেম দৃশ্যত রত্নর প্রেম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রেম। সেই পরম প্রেমিকের। রত্ন তার আধার মাত্র। সেই পরম প্রেমের। ওই বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে সে তার একরত্তি হৃদয়ের সংযোগসূত্র অনবচ্ছিন্ন রাখবে, পরিষ্কৃত রাখবে। তা হলে কোনো দিন তার হৃদয়ে রসের অভাব হবে না, কমতি হবে না। গৌরী যত চাইবে তত পাবে। তার তৃষা মিটবে। অ-সুখ সারবে। সে বাঁচবে।

রত্ন প্রার্থনা করে। হে উৎস, তুমি যেন তোমার প্রাণদায়িনী ক্ষীরধারা হতে

আমাকে তথা আমার কান্তাকে বঞ্চিত না কর, বিচ্যুত না কর। সে ধারা যেন প্রণালীতে হারিয়ে না যায়, শুকিয়ে না যায়। ক্ষীণ না হয়, মলিন না হয়। হে উৎস, তোমার হৃদয়রস যেন নিঃশেষিত না হয়, বিকৃত না হয়।

রত্ন প্রণিপাত করে। ধন্যতা জানায়। সে ধন্য যে তাকে প্রেমের আধার রূপে মনোনয়ন করা হয়েছে। সে প্রেমদেবতার মনোনীত। ধ্যান করতে যায়। ধ্যানে দেবতাকে পায় না। পায় প্রিয়াকে। গোরী যেন তাঁর প্রতিমা। আর সে প্রতিমাপূজক। ধ্যান করতে করতে তার তন্দ্রা আসে। উত্তেজনা উপশমিত হয়। সে শয্যায় ফিরে যায়।

পরের দিন প্রভাতে তার হৃদয় ভরে যায় ভালোবাসার জোয়ারে। তার সাধ যায় যাকে দেখে তাকে আলিঙ্গন করতে। সব মানুষকে। সব প্রাণীকে। সব পদার্থকে। তার চোখে মন্দ বা অসুন্দর বলে কেউ নেই, কিছু নেই। থাকলেও তার প্রেমের রসায়ন লোহাকে সোনা করবে। মন্দকে ভালো করবে। অসুন্দরকে সুন্দর।

জ্যোতি কিন্তু বিশ্বাস করে যে এ জগতে মন্দ আছে, অসুন্দর আছে। তার সঙ্গে অনবরত দ্বন্দ্ব করলে তবে যদি তার সংশোধন বা পরিবর্তন হয়। দ্বন্দ্ব কেমন করে সপ্রেম হয় সেই শিক্ষাই দিতে এসেছেন গান্ধীজী। ইতিহাসে গান্ধীর অভ্যুদয় দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রেমকে আনতে। গান্ধীর অহিংসা দ্বান্দ্বিক অহিংসা। জ্যোতির অহিংসাও তাই। এর পশ্চাতে রয়েছে দ্বন্দ্বের আবশ্যকতা। মন্দের সঙ্গে অসুন্দরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। সুতরাং মন্দ বা অসুন্দর বলে কিছু আছে বই-কি। তবে সেটা মানুষের প্রকৃতিগত নয়। মানুষ সেটা ছেড়ে দিতেও পারে, ছাড়িয়ে উঠতেও পারে। সেইজন্যে কারো সম্বন্ধে হতাশ হওয়া উচিত নয়। মানবের অযুত সম্ভাবনার মধ্যে একটির নাম ঈশ্বর হতে পারে। সে রকম একটি সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করে মানব তার অভিমুখে যাত্রা করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন ও ডাকলে সাড়া দেন এটা মানবে না জ্যোতি।

সন্ধ্যার দিকে আবার যখন কথাবার্তার অবসর হলো রত্ন বলল, "জ্যোতিদা, কেমন করে এক ভালোবাসার সঙ্গে আর সব ভালোবাসাকে মেলাই, বল তো? গোরীকে ভালোবাসি বলে আমি দেশকে দেশের লোককে ভালোবাসতে ছাড়িনি।

আমাকে ভালোবাসে বলে সেও দেশকে দেশের লোককে ভালোবাসতে ছাড়েনি। তাদের ছেড়ে যাওয়া কি ভালোবাসার পরিচয় দেয়? ছেড়ে গেলে কি অভিমানে তারা আমাদের পর করে দেবে না?"

জ্যোতিও যে ওটা না ভেবেছে তা নয়। সে বলল, "গোরীর দুর্বলতা কোনখানে, জান? সে কুল ছাড়তে পারে, কিন্তু শ্রেণী ছাড়তে পারে না। মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না সে অভিজাত। মেনকা হলেও সে অভিজাতদের সঙ্গ পেতে পারে, কিন্তু শিক্ষয়িত্রী বা নার্স হলে তা পাবে না। কিন্তু আমাদের যা পরিকল্পনা তাতে তাকে শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বী হতে হবে। দেশে থাকলে সে তার পুরাতন সমাজে মিশতে চাইবে, মিশতে পারবে না, কষ্ট পাবে। চেনা লোকের সঙ্গে তার পদে পদে দেখা হয়ে যাবে, সে সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হবে। তার চেয়ে একটা পরিষ্কার ছেদ ঘটে যাওয়া ভালো। দেশান্তব। বলছি না যে চিরজীবনের জন্যে।"

রত্ন অন্য কথা ভাবছিল। সে সবাইকে ভালোবাসবে। যশোবাবুকে বাসবে না? সে বলল, "কিন্তু যশোমাধবদা আমাদের কী ক্ষতি করেছেন যে আমরা তাঁর এত বড় ক্ষতি করব?"

জ্যোতি চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলল, "ওই বজ্রশ্রী মূর্তি কার কী ক্ষতি করেছিল যে ওকে পঙ্কশয্যায় শুয়ে থাকতে হলো কে জানে ক'শতাব্দীকাল? রমু উদ্ধার না করলে পাঁকে ডুবে থাকতে হতো কে জানে আরো ক'শতাব্দী? আমাদের এখানে শক্ত হতে হবে। তাতাদাও মনে মনে জানেন যে গোরীকে তিনি সুধাদির মতো ভালোবাসেন না।"

রত্নর বুকে একটা ক্ষত ছিল। সেখানে না জেনে জ্যোতি আঙুল দিল। ব্যথা পেয়ে রত্ন বলে উঠল, "জ্যোতিদা, আমার চেতনাকে আমি সৌন্দর্য দিয়ে ভরে রাখতে চাই। কিন্তু কেন এমন হয় যে সৌন্দর্যের চার দিকে পঙ্ক ঘিরে থাকে?"

জ্যোতি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "এই কেন-র উত্তর কে দেবে? আমার চেতনার বাইরে এ জগতের অস্তিত্ব আছে কি না তাই জানিনে। চেতন হয়ে অবধি দেখছি সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দর, সত্যের সঙ্গে অসত্য, ভালোর সঙ্গে মন্দ,

দ্বিতীয় ভাগ

প্রেমের সঙ্গে অপ্রেম দ্বন্দ্বরত অবস্থায় রয়েছে। গান্ধীজী আমাকে অসহযোগ করতে শিখিয়েছেন, কিন্তু অসুন্দরের সঙ্গে অসহযোগ করতে গিয়ে যখন চোখ কান রুদ্ধ করি তখন সুন্দরও প্রবেশপথ পায় না। অসত্যের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলে সত্যও মুখ খোলে না। মন্দের দিকে পিঠ ফেরালে ভালোর দিকেও পিঠ ফেরানো হয়। অপ্রেমকে ঘরে ঠাঁই না দিলে প্রেমও বাইরে থেকে যায়। তা হলে চেতনার জানালা দরজা খুলে রাখাই সুযুক্তি। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের চেতনা কেমন মুক্ত হয়েছে, লক্ষ করনি? আপাতত মনে হতে পারে ওটা পঙ্কোদ্ধার। কিন্তু পঙ্কোদ্ধার হতে হতে হবে বজ্রশ্রী মূর্তি উদ্ধার। তেমনি তুমিও পঙ্কোদ্ধার কর, তা হলেই তোমার সৌন্দর্যপ্রতিমাকে পাবে।"

রত্নর মনে আর একটি কাঁটা ছিল। সে বলল, "কিন্তু সুন্দরী নিজেই যদি ফিরে যেতে চান তাঁর ফিরে যাবার পথ খোলা থাকবে না যে। এটা কি তোমার মাথায় আসেনি?"

জ্যোতি দৃঢ় হয়ে বলল, "সুন্দরী নিজেই যদি ফিরে যেতে চায় তা হলে তুমি তোমার প্রবল প্রেম দিয়ে তার পথ রোধ করবে। যদি আরো এগিয়ে যেতে চায় তা হলে কিন্তু পথ জুড়ে থাকবে না। পথ ছেড়ে দেবে।" ইতস্তত করে বলল, "এই যেমন আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

রত্ন এটা প্রত্যাশা করেনি। আঘাত পেয়ে বলল, "তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়, ভাই জ্যোতিদা। কিছুই তো তুমি পেলে না ও পাবে না। আমাদের জন্যে এত কিছু ছেড়েছ ও ছাড়বে। তোমার মতো মহৎ কে! তোমার জন্যে আমরা গর্বিত।"

জ্যোতি গদগদ করে বলল, "তুমি কেড়ে নিয়েছ বলেই আমি পাইনি। তুমি ছাড়িয়েছ বলেই আমি ছেড়েছি। তোমার সঙ্গে আমি পারব কেন? ওই দগ্ধ সাহারা মরুভূমিকে দুবেলা রস জোগানো কি আমার মতো নীরস পাষাণের সাধ্য? আমার ভিতরে রস থাকলে তো রসের জোগান দেব। ভালোই হলো যে তুমি এসে ওকেও বাঁচালে, আমাকেও বাঁচালে।"

রত্ন এইবার তার গোপন ভাবনাটি অনাবৃত করল। বলল, "কিন্তু ও যদি

আমাকে চোখে দেখে না-মঞ্জুর করে! চিঠিতে ধরা পড়িনি। চাউনিতে ধরা পড়ে যাব।"

জ্যোতি অভয় দিয়ে বলল, "তোমার চোখে এমন একটা মায়া আছে যা ওকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে। তুমি বরং তোমার ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স্ কাটিয়ে ওঠ। ও জানে তুমি সুপিরিয়র।"

ওদিকে চিঠি লেখালেখির বিরাম ছিল না। গোরী লিখেছিল, "খাসা ছেলে তো! আমি কি কোনো দিন বলেছি না আভাস দিয়েছি যে তুমি পুরুষোত্তম নও? তোমার সঙ্গে দেখা হলে পাছে সে রকম ভাবি তার জন্যে তুমি এখন থেকেই ভয়ার্ত। ওগো এই বিজিত মানসিকতা কি তোমার সাজে! তুমি হলে বিজেতা। এর মধ্যেই তুমি আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছ। একে একে সর্বস্ব জয় করে নেবে। সেই রাজপুত্রের মতো যে পাশাবতীর সঙ্গে পাশা খেলে এক এক করে সমস্ত জিতে নিল। তুমি যে আমার হৃদয় হরণ করেছ এ কি তুমি পারতে যদি পুরুষোত্তম না হতে! আমার হৃদয় কি আমি অধমকে দিতে পারি! মধ্যমকে দিতে পারি! আমার কান্ত, তুমিই আমার পুরুষোত্তম।"

রত্ন লিখেছিল, "এবার তো আমি সুলভ হতে যাচ্ছি। জ্যোতিদার আশ্রমে। কত বার আমাদের দেখা হবে। তা সত্ত্বেও যদি তোমার মোহভঙ্গ না হয় তবেই জানব যে আমি তোমার মন পেয়েছি। আর নয়তো জানব যে নিজেকে দুর্লভ করে এত দিন একটি সরলবিশ্বাসী মেয়ের সরলবিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছি। আমাদের প্রেমের ভিত্তি পরখ করে দেখতে চাই।"

এর উত্তরে গোরী—"কিন্তু আমার যে ওখানে যাওয়া বারণ। না, ঠিক বারণ নয়। আমার নিজেরি ভয় করে অনুমতি না নিয়ে যেতে। অনুমতি চাইতেও মুখ নেই। যদি শুনতে হয়, বেশ, তুমিও অনুমতি দাও, আমিও আবেক বার ছাঁদনাতলায় যাই। এসব লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে পদে পদে সতর্ক থাকতে হয়। তুমি যদি আমাকে চিরদিনের মতো পেতে চাও তবে কাপালি-পাড়ায় কেন? যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব। সাহস করে চাইলে—চাইতে জানলে—আমাকে তুমি চিরদিনের জন্যে পাবে।"

সাহস করে চাইতে যে শুধু সাহস লাগে তাই নয়, অনেক রকম প্রস্তুতি

লাগে। কায়িক মানসিক সাংসারিক। গোরীর প্রয়োজনের অনুপাতে রত্নর প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না। সে কোন মুখে চাইত! এই যখন পরিস্থিতি তখন জ্যোতি এসে তাকে উদ্ধার করল।

যাত্রার দিন ও দিশা প্রকাশ না করে রত্ন চিঠি লিখল গোরীকে—"ওগো তরুণী, এবার তুমি বালিকা হবে। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে ফিরে যাবে। ঠিক সেইখানটি থেকে আবার আরম্ভ করবে যেখান থেকে তোমাকে জোর করে অপসরণ করা হয়েছিল। ভাবতে কী যে মজা লাগছে তুমি হবে আমার বছর পাঁচেকের ছোট। তোমাকে তখন আমি আর কান্তা বলব না। অকালে পাকাব না। তুমি হবে আমার গার্ল। আমার গার্লকে আমি নিজের হাতে গড়ে নেব। মুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করব আমার আপন হাতের প্রতিমাকে। আর আমি প্রতিমাভঙ্গকারী নই। আমি প্রতিমানির্মাতা।"

গোরী এর মর্মভেদ না করতে পেরে অবাক হয়ে লিখল,--"ব্যাপার কী, বল তো! কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কবে যাওয়া হচ্ছে? না এখনো সব অনিশ্চিত? শুধু জল্পনাকল্পনা? জ্যোতি ফিরেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করেনি। একটা না একটা ছুতোয় এড়িয়ে থাকছে। শুনছি ওর আশ্রম উঠে যাচ্ছে। অজস্র দেনা। পুলিশেরও নেকনজর। তা হলে তুমি আসবে না? কান্না পাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ কী খেয়াল! বুড়ীকে তুমি বালিকা করবে! বাসি ফুলকে করবে কলিকা! আমি হব তোমার গার্ল! শুনে লজ্জায় মরি! আমি হব তোমার বছর পাঁচেকের ছোট! বুঝেছি। আবার সেই রাখীবন্ধ বহিন। আমাকে তুমি আর কান্তা বলবে না। আমার বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে যেতে। ওগো আমার মাথা খারাপ হতে বসেছে। জ্যোতি কেন আসছে না? মনও খারাপ। তুমি আসবে না। অশোকবনে সীতার মতো আর কত কাল আমি পড়ে থাকব! নিঃসঙ্গ! একাকী!"

জ্যোতি ফিরে গিয়ে অবধি চিঠি লেখেনি। রত্ন চিন্তিত হয়েছিল। তবে কি যাত্রার আয়োজনটা পাকা নয়? আগে থাকতে বাবাকে বলে কী হবে? বলা মানে তো যুধিষ্ঠিরের মতো আধা সত্য আধা মিথ্যা বলা। ললিতের জাহাজে রেঙ্গুন যাচ্ছি। ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে।

রত্ন ও শ্রীমতী

রত্ন ভাবছিল কুষ্টিয়ার বাড়ীর উপরতলার ঘরে বসে। এমন সময় তার চোখে পড়ল লম্বামতন কে একটি যুবক তাদের বাড়ীর গেটে ঢুকল। আরে! এ যে কানন! এ কি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম! রত্ন তর তর করে নেমে গিয়ে কাননকে জড়িয়ে ধরল।

কানন নিচু গলায় বলল, "জ্যোতিদার কাছ থেকে আসছি। পীরপুরে তোমাকে পাইনি। না, না, এমন কিছু জরুরি নয়। তুমি অমন ঘাবড়ে যেয়ো না। ঘাবড়ে যাবে বলেই তো টেলিগ্রাম করা হলো না। অন্য কোনো বার্তাবহ পাঠালে তোমার হয়তো সম্মানহানি হতো। আসলে এটা তাতাদার অনুরোধ। তিনি এখন তোমার কৃপানির্ভর। তুমি ইচ্ছা করলে বাঁচাতেও পার, মারতেও পার। তুমি কি কালকের মধ্যে তৈরি হতে পারবে?"

কানন মানুষটা দিলখোলা। তার পেটে কথা থাকে না। কিন্তু সেও খুলে বলল না কী হয়েছে। কী এমন জরুরি। রত্নর হাতেই বা মরণ বাঁচন কেন। কার মরণ বাঁচন। অদম্য উদ্বেগ সেই দিনই যাত্রার জন্যে তৈরি করে তুলল রত্নকে। সেই দিনই রাত বারোটার সময় বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে নামল দুই বন্ধু। তাদের মালুম ছিল না যে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নামলে আরো সংক্ষেপ হয়।

রাতভর পায়ে হেঁটে দুই দুই বার মাঝিদের জাগিয়ে সাধাসাধি করে দু'দুটো নদনদী পেরিয়ে কাপালিপাড়ার আশ্রমে পেঁছিতে সূর্যোদয়। আমবাগানের মাঝখানে খানকয়েক খড়ের ঘর। তার একটার থেকে বেরিয়ে এলো জ্যোতি। তার মুখে হাসি ধরে না, কিন্তু বদনে বিষাদের ছায়া। সেও কিছু ভাঙল না। লোক পাঠিয়ে দিল বেগমপুরে জানাতে। তার পর ওদিক থেকে জনা দুই বরকন্দাজ এসে আলাদা আলাদা করে চিঠি দিয়ে গেল জ্যোতিকে ও রত্নকে। তার পর আসতে থাকল ভারে ভারে ফলমূল চিঁড়ে দই সন্দেশ।

যশোবাবু মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ করেছিলেন জ্যোতিকে ও তার বন্ধুদ্বয়কে। ভোজটা রত্নর সম্মানে। আর গৌরী লিখেছিল রত্নকে—"ছি ছি। তুমি এমন! তোমাকে তু করে ডাকবেন আর তুমি পোষা কুকুরের মতো ছুটে আসবে! কী দরকার ছিল তোমার কাননের সঙ্গে অত কষ্ট করে আসার! ওরই বা কী দরকার পড়েছিল তোমাকে ডেকে আনার! জ্যোতিই বা কেন ওকে তোমার

কাছে পাঠায়! তোমাদের তিনজনের উপরেই আমি বিষম রাগ করেছি। তোমরা শত্রুপক্ষের চর। তোমাদের কথা আমি শুনব না, শুনব না, শুনব না। তোমরা কেউ আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না। উনি ভেবেছেন ওঁর নিজের কথায় যা হলো না তোমাদের কথায় তাই হবে। বিশেষ করে তোমার কথায়। ওগো তোমার সব কথাই আমি শুনব, কিন্তু ওই কথাটি নয়। তুমি কি চাও যে আমি পরাজিত হই? তার আগে আমি বিষ খেয়ে মরব। বেশ, আমার মরা মুখ দেখতে চাও তো সূর্যাস্তের পর এসো। আরতির আগে। কিন্তু আমার মান রেখো। এ বাড়ীতে জলগ্রহণ কোরো না।"

রত্ন নাচতে নাচতে আসছিল যে আজ শুভদৃষ্টি। সকালবেলাই লগ্ন। তা নয়, এ কী! এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। এ কিসের সূচনা করছে! জ্যোতিদাকে এ চিঠি দেখাতে সে আঁধার মুখে বলল, "থাক, ও বেলা যাওয়া যাবে। এ বেলা ঘুমিয়ে নাও।"

কানন এক ঘুমে দিন কাবার করে দিল। কিন্তু ঘুমের ঘোরে রত্নর চোখের পাতা জুড়ে গেলেও ঘুম কিছুতেই এলো না। সে কেবল ঘণ্টা গুনতে মিনিট গুনতে থাকল। আজ প্রথম দেখা হবে রত্নগোরীর সঙ্গে গোরীরত্নর। এ যেন আয়নায় মুখ দেখা। রত্নকেই রত্ন দেখবে, গোরী দেখবে গোরীকেই। প্রেমের ইতিহাসে আর কখনো কি এ রকমটি হয়েছে! অপূর্ব! অপূর্ব! আফসোস শুধু এই যে ভালো করে প্রস্তুত হতে সময় দিল না নিয়তি। টেনে নিয়ে এলো ধার্য তিথির সতেরো দিন আগে। রাত জেগে পায়ে হেঁটে কী ছিরি হয়েছে চেহারার! আর গোরীও তো কী এক অজ্ঞাত কারণে অপ্রসন্ন। কেউ খুলে বলবে না কী সে কারণ।

বিকেলের দিকে আরো একখানি চিঠি। গোরী লিখেছিল- "ওগো আমার বন্য সোনা। আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের কোণা। তুমি কত দূর থেকে কত কষ্ট করে এসেছ! কাকে দেখতে এসেছ তা কি আমি বুঝিনে! কেন তবে পাগলের মতো গোসা করি! এ বাড়ীর খাওয়া আমি অনেক দিন হলো ছেড়েছি। আমার জন্যে মাধবের প্রসাদ আসে। আমি মাধবের খাই, মাধবের ধারি। আর কারো খাইনে ও ধারিনে। সেই মাধবের প্রসাদও আজ আমি মুখে দিইনি। গোসা

করেছি বলে কি? হাঁ, কিন্তু আরো একটি কারণ আছে। কানে কানে বলি। আজ আমাদের শুভদৃষ্টি। তাই আমার উপবাস। ওগো তুমি কি অন্তর্যামী নও? জান না আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি লগ্নের অপেক্ষায়? কাননকে আগে পাঠিয়ে দিয়ো, ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।”

ভগ্নপ্রায় মঞ্জিলের দেউড়িতে দুটি পতনোন্মুখ সিংহের পদতলে দুই আসাসোঁটা বরদার প্রতীক্ষা করছিল। জ্যোতিকে ও রত্নকে তসলিম করে সদরের খাস বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন স্বয়ং যশোবাবু। সাহেবী কেতায় করমর্দন করে নবাবী কেতায় ওদের গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিলেন। তার পর বাঙালী কেতায় ওদের গলায় গোড়ের মালা পরিয়ে দিলেন। ওরা সে মালা খুলে রাখল সবিনয়ে। তার পর সোনার তবকে মোড়া পান এলো, সিগার এলো। আর এলো রকমারি পানীয়। জ্যোতি নিচ্ছে দেখে রত্নকেও নিতে হলো ভদ্রতার খাতিরে বরফ-ঠাণ্ডা নারঙ্গীর সরবৎ। বরফের বাক্সয় রেখে শীতল করা। তাতাদা একটি জিমলেট হাতে করে উভয়কে উইশ করলেন। খসখসের পর্দা ঘেরা ঘরের আলো-আঁধারিতে গল্প জমিয়ে কারো নজরে পড়ল না রত্ন কেমন করে না খেয়ে না খেয়ে তার গ্লাস আধ-খালি করল।

তাতাদা মানুষটি মধ্যবয়সী মোটাসোটা বেঁটেখাটো চিকণশ্যামল। পরিচ্ছন্ন মাজাঘষা চাঁচাছোলা চেহারা। নাকটি চাপা। ঠোঁট দুটি পুরু। পরনে মিহি মলমলের পিরান পায়জামা। পাড়গুলি কারুকার্যময়। সৌজন্যের অবতার। বিলেত যাত্রার পর থেকে তাঁর জীবনযাত্রায় বেশ একটা সাহেবী ছাপ পড়েছে। মেজাজটা জমিদারের, মর্জিটা ব্যারিস্টারের। জলি গুড ফেলো। রত্ন লক্ষ করল যে তিনি তাকে কথায় কথায় 'সার' বলে সম্বোধন করছিলেন। বাড়ীতে ডাক্তার এলে গৃহস্থের ভাবখানা যেমন হয় তাঁরও কতকটা তেমনি। কৃতার্থ, আশ্বস্ত, উদ্বিগ্ন, নার্ভাস। যেন রত্নর হাতেই মরণ বাঁচন।

অবশেষে আহ্বান এলো সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী যে ঘরটিতে গোরী তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের দর্শন দেয় সেই ঘরে। কানন সেখানে আগে থেকেই জুটেছিল। ঝালরঝোলানো সুজনিঢাকা গদি আঁটা দিওয়ানের উপর সে আর তার পারুলদি বসেছিল পাশাপাশি পা মুড়ে। জ্যোতিকে ও রত্নকে দোরগোড়ায়

পৌঁছে দিয়ে তাতাদা ফিরে গেলেন। হাল কামরায় তাঁর বয়স্য সমাগম হয়েছিল। সেখানে তিনি বেহালা বাজিয়ে শোনাবেন। আসলে তিনি ছিলেন উৎসবের মউজে মশগুল। বিজয়ানন্দে বিভোর। রত্ন সেটা লক্ষ করেনি।

ভাইবোনের কথাবার্তায় ক্ষণকালের জন্যে ছেদ পড়ল। পরক্ষণেই গোরী তার চাউনি ফিরিয়ে নিয়ে মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিল। জ্যোতি গিয়ে কাননের পাশে বসল। আর রত্ন? রত্ন আসন নিল ফরাসের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়ে। যেখান থেকে গোরীকে দু'নয়ন ভরে দেখা যায়, দু'নয়নে ভরে নেওয়া যায়, অথচ ধরা পড়ে যাওয়া সহজ নয়। রত্ন নিরীক্ষণ করতে চায় দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব। তাই দর্পণের অত কাছে যাবে না।

গোরী ভেবেছিল রত্ন জ্যোতির অনুসরণে দিওয়ানের উপর গিয়ে বসবে। তা যখন হলো না তখন গোরী অপ্রতিভ ও অস্থির হয়ে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে রত্নর দিকে আড় চোখে তাকাতে লাগল। তার পর সাহস করে মুখোমুখি চাইল। চাইতেই চার চোখ এক হলো। এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ। গোরী যেন ধরা পড়ে গেল। রত্নও। চোখ নামিয়ে গোরী ফিরে গেল কথাবার্তায়। আর রত্ন নিমগ্ন হলো ধ্যানে। ভাব-গোরীর সঙ্গে সে মিলিয়ে নিচ্ছিল বস্তু-গোরীকে। নিত্য গোরীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ গোরীকে। মোহভঙ্গ? না, তার মোহভঙ্গ হয়নি। মনে মনে সে তার ধন্যতা জানাল দেবতাকে। যাঁর দর্শন পেয়েছে নারীরূপে। গোরীরূপে।

তার পর এমন হলো যে রত্ন নয়ন মুদলেই গোরীর দৃষ্টি তার অঙ্গ ছুঁয়ে যায়। নয়ন মেললেই ও দুটি আঁখিপাখী উড়ে পালায়। গোরীও গোপনে গোপনে মিলিয়ে নিচ্ছিল তার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে। নিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষকে। মোহভঙ্গ? হয়তো তাই। হয়তো তা নয়। হয়তো মাঝামাঝি একটা অনুভব। রত্নর কানে আসছিল অশ্রুত কণ্ঠস্বর। শুনে অবাক লাগছিল। সে আস্বাদন করছিল ধ্বনিমাধুরী। কোমল, ললিত, অনুচ্চ, ত্বরিত, উত্তেজিত, বালিকাসুলভ। সে কিন্তু কথা বলছিল না। ওরা যেখানে দু'জন সেখানে যেমন কূজন করা যায় ওরা যেখানে চার জনের দু'জন সেখানে কি তেমন চলে!

গৌরীকে নিভৃতে না পেলে সে মুখ খুলবে না। সে তিন জনের একজন হবে না। কানন ও জ্যোতির সমান হবে না। সে হবে একজনের একজন।

ফরাস এসে দেয়ালগিরি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। রত্ন চেয়ে দেখল একজনের গালদুটি ডালিমফুলের মতো রাঙা। ঠোঁটদুটি আনারের মতো রক্তিম। চোখ-দুটিতেও গনগনে কয়লার আগুনের মতো আভা। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ মরীয়া ভাব। বাঘিনী যেন শিকারীর দ্বারা কোণঠাসা হয়েছে! পালাবার পথ নেই। ঝাঁপাতেও বল নেই। গুলি বিঁধেছে। রত্নর খেয়াল ছিল না, খেয়াল হলো যে গৌরীর মুখে হাসি নেই, চোখে হাসি নেই, কানন তাকে হাসির কথা বলে হাসাতে পারেনি। রত্ন আরো ভালো করে চেয়ে দেখল গৌরীর গায়ের রং কেয়াফুলের মতো। ঠিক শুভ্র নয়। দুধের উপর ঘন সর পড়লে দেখতে যেমন হয়। পরনে মিহি ঢাকাই শাড়ী। শাদা। জরি পাড়। দু'হাতে দু'গাছি সোনা বাঁধানো শাঁখা। একগাছি নোয়া। সিঁথিতে বা কপালে সিঁদুর ছিল না। কুমারী বলে ভ্রম হয়। কিশোরী বলেও। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ষোড়শী কি সপ্তদশী। সে ভুল ভেঙে যায় বুকের দিকে তাকালে। সেই যে বজ্রশ্রী মূর্তি তারই মতো ভরাট বুক। আঁটসাঁট ব্লাউস তাকে আরো প্রকট করেছে। বজ্রশ্রীর মতো ও মেয়ে বজ্র দিয়ে গড়া। তেমনি বলিষ্ঠ গড়ন। সুবলিত সুঠাম। কমনীয়। রমণীয়। আঁচল দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে বিপুল কৃষ্ণ কেশভার। বকুলফুলের হার দিয়ে জড়ানো এলো খোঁপা।

আরতির সময় হলো। এখনি গৌরী উঠবে। আর কবে দেখা হবে কে জানে! হয়তো এই প্রথম এই শেষ। রত্ন ক্রমে উতলা বোধ করছিল নিভৃত আলাপের জন্যে। উৎকণ্ঠিত বোধ করছিল কী হয়েছে জানতে। ক্ষয়ে যাবার মতো চেহারা তো নয়। চোখে দেখে তো মনে হয় না তেমন কোনো অসুখ। জ্যোতি ঠাহর করতে পেরেছিল রত্নর মনের অবস্থা। কাননকে পিছন থেকে জামা ধরে টানছিল। কাননও নড়বে না, গৌরীও তাকে নড়তে দেবে না। অফুরন্ত বাজে বকবে। রত্ন অবশেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। গৌরী ওকে না-মঞ্জুর করেছে।

এমন সময় ভেসে এলো বেহালার লীলায়িত নিঃস্বন। কানন অমনি লাফ দিয়ে উঠল। বলল, "আঃ! সেরেনেড!" সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার পিছু

পিছু জ্যোতিও। রত্নও উঠে দাঁড়াল। উদাস নেত্রে শেষ বারের মতো গোরীর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই ও তাকে চোখের ইশারায় ডাকল। কাছে যেতেই আঁখিঠারে পাশে বসতে বলল। তার বুকে তখন তাণ্ডব।

দেখতে দেখতে গোরীর মুখচ্ছবি বদলে গেল। সে মুখে অপরিসীম মাধুর্য। হিঙ্গুলবর্ণ সূর্য অস্ত গেলে যেমন রুপোর থালার মতো চাঁদ হাসে। কোথায় প্রভাতবর্ণিত প্যাশন! এ যে বড় কচি মেয়ে! বড় মিষ্টি মেয়ে! জ্যোৎস্নার মতো জ্যোৎস্না-গোরীর রূপ। রত্ন সে রূপ দুই নয়নে ভরে নিল। সে রূপ চেতনা ছাইল। চেতনায় আর কোনো নারী নেই। আছে শুধু গোরী। চির-নবীনা কিশোরী। চিরন্তনী পিয়ারী। এই নারীই সব নারী। সব নারীই এই নারী। এই একজনকে ভালোবাসতে জানলে সব নারীকে ভালোবাসা হয়। আর কাউকে ভালোবাসতে হয় না।

গোরী একটু একটু করে তার কাছে আরো কাছে সরে সরে আসছিল। ওর তনুসুগন্ধ কী নির্মল! কী সুঘ্রাণ! রত্নর নয়ন তৃপ্ত হয়েছিল, শ্রবণ তৃপ্ত হয়েছিল। নাসাও তৃপ্ত হলো। বাকী রইল স্পর্শ। সে সবিস্ময়ে ভাবছিল তাও কি সম্ভব! গোরী ওর কবরী থেকে বকুলফুলের হার খুলে নিয়ে রত্নর ডান হাতের মণিবন্ধে রাখীর মতো করে বাঁধল। রত্ন আর কোথায় পাবে! ওই ফুল-মালার আধখানা সে গোরীর বাঁ হাতের মণিবন্ধে বাঁধতে যেতেই গোরী ডান হাত বাড়িয়ে দিল। তখন ডান হাতে গ্রন্থি পড়ল। গোরী তার হাত ছেড়ে দিল না।

এর পর কথা। গোরীই প্রথমে বলল। মৃদু স্বরে। "তোর সঙ্গে আমার প্রণয় প্রতিযোগিতা। কে বেশী ভালোবাসে? তুই না আমি?"

রত্ন বলল অস্ফুট স্বরে, "তুই।" বলে লজ্জায় মিলিয়ে গেল।

গোরী বলল মুগ্ধের মতো, "না। তুই। ক্ষীরের পুতুলের মতো তুই ভালোবাসা দিয়ে গড়া। তোর সঙ্গে আমি পারি! তবে তোর কাছেই আমি শিখছি। আমি তোর শিষ্যা।"

রত্ন ধন্য হলো। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "আজ তোর সারাদিন খাওয়া হয়নি।"

গোরী সোল্লাসে বলল, "প্রসাদ আসবে। তুই আমার সঙ্গে খাবি?"

রত্ন সাগ্রহে বলল, "খাব। কিন্তু তোর আরতির কী হবে?"

গোরী তার চোখে চোখ রেখে মধুর হেসে বলল, "এই যে। আরতি করছি।"
এমনি করে প্রতিমাভঙ্গকারী প্রতিমায় পরিণত হলো।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

(১৯৫৬-৫৭)